প্রাচীন পীড়ার কারণ

ও

তাহার চিকিৎসা।

ডাঃ শ্রীনীলমণি ঘটক, বি, এ, প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক।

ডাঃ এন, ঘটক হোমিও চেম্বার।

৯৯বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৪॥০
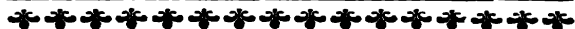
বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ডাঃ ঘটকের অমর লেখনী প্রসূত **"দর্শন গবেষণা"** নামক একখানি অতিমূল্যবান পুস্তক সত্বর প্রকাশ করিবার জন্য স্বর্গীয় ডাঃ ঘটকের সহকারী ও সুযোগ্য কনিষ্ঠ জামাতা **ডাঃ এম. ভট্টাচার্য্য, এম-এইচ-এস, পি-আর-এস-এম,** মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। এই পুস্তকখানিতে **ডাঃ ঘটকের শেষ জীবনের অপ্রকাশিত** শতাধিক নূতন নূতন দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ যথা—নূতন নূতন পীড়া এবং জটিলতার প্রকৃত কারণ; উন্মাদ পীড়ার চিকিৎসা; চাপা দেওয়া চিকিৎসা ও তাহার ফল; হোমিওপ্যাথির ব্যভিচার; জীবনী শক্তি; জীবনী শক্তি ও তাঁহার ক্রিয়াগতি; হোমিওপ্যাথিতে প্যাথলজীর স্থান; হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রাও শক্তি বিচার; আরোগ্যের মূল উৎস কোথায়; রোগের গতি এবং আরোগ্যের গতি; ব্যাধিদুঃখ নিবারণের উপায়; জন্মান্তরীণ ব্যাধি প্রবাহ ও তৎপথে প্রতিকার; পীড়ার গতি ও চিকিৎসার ধারা বাহিকতা; বিভূতি এবং প্রবণতা; রোগের সূচনা ও প্রবাহ—সর্ব্বশেষ উহার ফল; মনস্তরের মলিনতা সংশোধন—বাহ্যাভ্যন্তর ব্যায়াম; আরোগ্য কাহাকে কহে; রোগীর বায়ু পরিবর্ত্তন; প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা, প্রকৃতি ও গতি; স্তন্যপায়ী শিশুর আরোগ্য কল্পে স্তন্যদায়িণী জননীকে ঔষধ প্রয়োগ ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থকারের স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষার গুণে প্রাণস্পর্শী হইয়া অতি সুবোধ্য ও সুখপাট্য হইবে তৎবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত এই গ্রন্থখানি ডাঃ ঘটকের **"হোমিও দর্শন"** নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডের অভাব পূর্ণ করিবে।

প্রাপ্তিস্থান :—

আইডিয়েল হোমিও চেম্বার,
৭১নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা,
ডাঃ এন ঘটক হোমিও চেম্বার
১৫সি, সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা,
অথবা অন্যান্য হোমিও
ডাক্তারখানা।

সূচী-পত্র।

পূর্ব্বাভাষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম ভাগ।

উপসংহার।

অবতারণা।

"বাজারে রাশি রাশি হোমিওপ্যাথিক পুস্তক থাকিতে আবার আমার মত লোকের এই পুস্তকখানি লিখিবার ও ছাপাইবার প্রয়াস কেন?"—এই প্রশ্নটী অন্যের মনে উদয় না হইলেও আমার নিজের মনেই ইহা সর্ব্বপ্রথমেই উদয় হইয়াছিল। ফলতঃ নিজে এবং দুই চারি জন উপযুক্ত হোমিওপ্যাথ বন্ধুদিগের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলাম। তবে আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইলে যদিও আরও অনেক সুবিধা হইত, কিন্তু কেহই প্রস্তুত না হওয়ায় আমাকেই যথাজ্ঞান লিখিতে হইল। ভ্রম ও ত্রুটী অনেকই আছে, আমি নিজেই তাহা অনুভব করিতেছি, তবে মূলনীতির মধ্যে কোথাও কোনও ভ্রান্তি না থাকে, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না।

আমাদের দেশে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসাবিষয়ক বাঙ্গালা ভাষায় কোনও পুস্তক একেবারেই নাই বলিলেও চলে। ইংরাজীতেও এ বিষয়ে মাত্র ২।৩ খানি পুস্তক আছে। ইহাদের মূল্যও অধিক, এবং ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সেগুলি থাকা আর না থাকা, উভয়ই সমান। সরল বাঙ্গালা ভাষায় মৌলিক ভাবে লিখিত একখানি পুস্তকের প্রকৃতই বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। দুই একখানি ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা বিশেষ উপকার আশা করা যায় না। কেননা, সেগুলি অনুবাদ হওয়া প্রযুক্ত একটু বিরস ও দুর্ব্বোধ হইয়াছে; তাহা ছাড়া, অনুবাদে গ্রন্থকারের প্রকৃত মনোভাব পরিস্ফুট হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথীর মূল তত্ত্বগুলির সরল আলোচনা ও বিশ্লেষণ তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও

ঐ প্রকার বঙ্গানুবাদেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে,—তবুও তাহারা যে আমাদের প্রকৃত অভাব পরিপূরণে অসমর্থ, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গতানুগতিক ভাবে অথবা প্রচুর অর্থাগমের উদ্দেশ্য লইয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখি নাই। আমি নিজে যে অভাব অনুভব করিয়াছি, আমার সম-ব্যবসায়ী চিকিৎসকভ্রাতাদিগের সেই অভাব দূরীকরণার্থই লিখিয়াছি। হোমিওপ্যাথীতে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা করা অতীব দুরূহ, কষ্টসাধ্য এবং অনেক অধ্যবসায়সাপেক্ষ। তাহা ছাড়া, ইহাতে তরুণ পীড়ার চিকিৎসার ন্যায় অর্থাগমের আদৌ সুবিধা নাই। যিনি প্রকৃতই জন-কল্যাণ-কামনা লইয়া চিকিৎসায় ব্রতী হইবেন, তিনিই প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় অগ্রসর হইতে পারিবেন। এজন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশের অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ও অতি উপযুক্ত চিকিৎসকগণও প্রায়ই প্রাচীন পীড়ায় ততটা মনোযোগ দেন না। এমন কি, এমেরিকার ন্যায় স্থানেও প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসক, মাত্র দুই একজন বলিলেও হয়। বিগত শতাব্দীর মধ্যে একমাত্র প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার কেণ্টই এ বিষয়ে অগ্রণী ও উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত মহানুভব চিকিৎসকই প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় প্রভূত উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, ও এসম্বন্ধে দুই তিন খানি গ্রন্থ লিখিয়া জগতের যাবতীয় প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-দিগের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া চিরকালের জন্য অমর হইয়া গিয়াছেন। উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তির ঔষধের প্রয়োগ-তত্ত্ব এবং রোগী-শরীরে তাহাদের ফল পর্য্যবেক্ষণাদিতে, উদার-হৃদয় ডাক্তার কেণ্টই, বোধ হয় একমাত্র উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে তাঁহার ন্যায় উচ্চ-শিক্ষিত অনেক চিকিৎসক থাকিলেও এবং অন্যান্য দিকে তাঁহাদের মহৎ-প্রাণতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইলেও, ইংরাজী অনভিজ্ঞ চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের সৌকর্য্যার্থ হোমিওপ্যাথীর প্রাচীন পীড়ার

চিকিৎসার অতি গভীর তত্ত্ব-কথাগুলি সরল ও মৌলিক ভাবে লিখিয়া সাহায্য করিবার মত একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার প্রয়াস করিতে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। আমি সেই অভাব পূরণ করিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিবার ও প্রকাশ করিবার সাহসী হইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে লেখা, তাঁহারাই একমাত্র বিচারক। আমি যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি সুবোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং যদি কখনও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হয়, তবে আমার শ্রেণীর চিকিৎসক মহাশয়দিগের উপদেশানুসারে ইহার মধ্যে আরও অন্যান্য তত্ত্ব সন্নিবেশিত করিবার এবং প্রয়োজন হইলে কোনও কোনও বিষয় পরিবর্দ্ধন করিবার প্রয়াস পাইব।

এই গ্রন্থখানির প্রায় অর্দ্ধাংশ অনেকদিন হইতে সুবিখ্যাত "হ্যানিম্যান" পত্রিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছিল; মধ্যে আমার পারিবারিক কোনও একটী শোকাবহ দুর্ঘটনা জন্য কিছুকাল লেখা বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর "হ্যানিম্যান" পত্রিকার সুযোগ্য সত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র ভড় মহাশয়ের প্রোৎসাহে আরও কতক অংশ লিখিয়া উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করি, এবং অবশিষ্টাংশ বাড়ীতে লিখিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়াছি। আমি মুক্তকণ্ঠে ও সরল প্রাণে স্বীকার করিতেছি যে আমি শ্রীমান্ প্রফুল্ল বাবুর নিকট অতি গভীর ভাবে ঋণী। তিনি আমাকে অগ্রজ সহোদর জ্ঞানে এ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। প্রকৃত কথা কহিতে হইলে, আমি তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণে সক্ষম হইতাম কিনা, বিশেষ সন্দেহজনক। আমি এজন্য তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি। তিনি নিজের স্বাভাবিক সরলতা ও সাধুতার গুণে কলিকাতার ন্যায় সহরে একজন গণ্য ও মান্য ব্যক্তি হইয়াছেন ও নিত্য নিত্য উন্নতির পথে যাইতেছেন এবং যাইবেন। ইহার সহিত

অমোঘ ব্রাহ্মণাশীষ তাঁহাকে জগতের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তুলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমার এ গ্রন্থখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। সর্ব্ব প্রথম কয়েক পাতা পূর্ব্বাভাস লিখিয়া, ১ম ভাগে প্রাচীন পীড়া কাহাকে কহে, নূতন বা তরুণ পীড়ার সহিত ইহার বিভিন্নতা কি, এবং এই বিষয়ে অতি প্রয়োজনীয় ও জটীল-তত্ত্ব সমূহের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ২য় ভাগে, রোগী লিপি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও নির্ব্বাচন-তত্ত্ব বিশিষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম জন্য প্রয়াস পাইয়াছি। ৩য় ভাগে, প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা এবং ঔষধ প্রয়োগের পর পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী ও আরও অনেক প্রয়োজনীয় কথা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অতঃপর ৪র্থ ভাগে, সোরাঃ সাইকোসিস, সিফিলিস এবং টিউবারকিউলোসিসের রূপ ও প্রকৃতির পরিচয় এবং নিদর্শনাদি বর্ণনা করিয়া ৫ম ভাগে অনেকগুলি জটীল রোগী-তত্ত্ব আমার ডায়েরী হইতে তুলিয়া দিয়া গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছি। ফলতঃ প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় কথা কোনওটীই বাদ দেওয়া হয় নাই।

পরিশেষে, বিশাল-হৃদয় জগৎ-গুরু, মহামতি ডাক্তার কেণ্টের চরণে এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ও অতি অকিঞ্চিৎকর উপহারখানি আমার হৃদয়ের সুবাসিত ভক্তি-চন্দনের সহিত অর্পণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতার্থ হইলাম। তাঁহার ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে একান্ত অসমর্থ। অলমতিবিস্তারেণ।

২৩শে পৌষ, ১৩৩৪ সাল, ধানবাদ বাটী।

বিনীত :—
শ্রীনীলমণি ঘটক

দ্বিতীয় সংস্করণের অবতারণা।

ভগবৎ প্রেরণাবশে যে পুস্তকখানি "প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা" নাম দিয়া প্রণয়ন করিয়াছিলাম, তাহার প্রথম সংস্করণ যে এত শীঘ্র নিঃশেষিত হইল, ইহা আমার পক্ষে পরম আনন্দ এবং তৃপ্তির কথা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়দিগের ও সাধারণ হোমিওভক্তদিগের নিকট ইহা যে এতখানি আদরের সামগ্রী হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকার হিসাবে অবশ্যই উল্লাসের বিষয়, একথা স্বীকার করিতেই হইবে, পরন্তু আমার হৃদয় কেবলই সে প্রকার আনন্দে উৎফুল্ল হয় নাই,—আমার বিশেষ পরিতৃপ্তির কারণ এই যে, গ্রন্থখানির মধ্যে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ইহার মর্ম্মবাণী স্বরূপ যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, সেই সত্য তত্ত্ব ও চিরন্তনী নীতিগুলি যে সুধীসমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে এবং হোমিওপ্যাথির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা সমধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা ভাবিয়া আমি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এই নির্ম্মল আনন্দই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়া একমাত্র হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়াছি এবং যথেষ্ট অর্থাগমযুক্ত আইন ব্যবসায় বহুদিন লিপ্ত থাকিয়াও তাহার মমতা ত্যাগ করিয়া এই সত্যপথ অবলম্বন করিয়াছি। এ অবস্থায়, গ্রন্থখানি সকলের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করার জন্যই আমার আনন্দ এবং ইহা একটা স্বতন্ত্র বর্গের আনন্দ। হোমিওপ্যাথি আমার প্রাণের জিনিষ, সুতরাং আমার ন্যায় নিতান্ত অনুপযুক্ত ভক্তের দ্বারা যদি ইহার প্রচার বিষয়ে যৎসামান্য সাহায্যও হইতে পারে, তবে আমার পক্ষে তাহা নিরতিশয় আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, আবশ্যকতাও অনুভব করি নাই। হোমিওপ্যাথির সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

এবং ইহা যে সাধারণ ব্যাধিচিকিৎসার একমাত্র সত্য পথ এবং তৎ-ব্যতীত মনুষ্যের চরম লক্ষ্য প্রাপ্তিরও অনুকূল পথ, তদ্বিষয়ের আলোচনা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে হওয়াই অভিপ্রেত অনুভব করিয়া, "হোমিও দর্শন" নাম দিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইতেছে এবং কতক অংশ ছাপাও হইয়াছে, সম্পূর্ণ আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। হোমিওপ্যাথির এক একটা তত্ত্ব লইয়া এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে,—ইহার তত্ত্ব এতই গভীর এবং এতই বিস্তৃত! আরও যোগ্যতর ব্যক্তির এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

গ্রন্থখানির গুণে মুগ্ধ হইয়া বিহার বিভাগীয় জনৈক পোষ্ট্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,-এ মহাশয় ইহাকে ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া আমার অনুমতি চাহিলে, আমি তাঁহাকে অকপটে ও নিঃস্বার্থভাবে অনুমতি প্রদান করিয়াছি, তিনিও সে কথা ঐ অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকাতে অতিশয় কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। পাটনা সহরের কোনও খ্যাতনামা চিকিৎসক হিন্দী ভাষায় গ্রন্থখানি অনুবাদ করিবার অনুমতি চাহিলে তাঁহাকেও ঐ ভাবে অনুমতি দান করিয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বাবুর দ্বারা অনূদিত গ্রন্থখানি অনেক দিন হইতে বিক্রয় হইতেছে এবং সাধারণের মধ্যে সমাদর লাভও করিয়াছে। যে কোনও প্রকারে সত্য তত্ত্বগুলির প্রচার ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথির বিস্তার হওয়াই আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আমার ভ্রাতৃ-প্রতিম ও হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ভড় মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণেরও প্রকাশক। আমি হৃদয়ের সহিত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি এবং ভগবানের নিকট তাঁহার বিজয়শ্রীর জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করি। মুদ্রাঙ্কন ব্যাপার বড়ই পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং আমার ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তেই কার্য্যবিব্রত

ব্যক্তি দ্বারা প্রুফ সংশোধন একেবারেই অসম্ভব। আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা ডাঃ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বাবাজী এক্ষণে একজন কৃতকর্ম্মা চিকিৎসক এবং তিনি কলিকাতা বহুবাজারে স্বতন্ত্র ডিস্‌পেনসারি করিয়া চিকিৎসাকার্য্য করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার সাহায্য করিবার সুযোগ বড় ঘটে না, তবে সুখের বিষয় এই যে, ভগবানের অপার করুণাবশে আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রতন চন্দ্র বাবাজীবন গতবৎসর আর, সি, নাগ রেগুলার কলেজ হইতে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এবং সুবর্ণ পদক মণ্ডিত উপাধিসহ উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে আমার চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। তিনি ব্যতীত চট্টগ্রামের অধীন শাকপুরা নিবাসী আমার পুত্রপ্রতীম সরল ও পবিত্রহৃদয় ডাঃ শ্রীমান্ শচীন্দ্র বিজয় চৌধুরী বাবাজীবন আমার এ বিষয়ে অশেষ সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঐ দুই জনের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্য হওয়া সুকঠিন, এমন কি, অসম্ভব হইত। অলমতিবিস্তারেণেতি।

১২৪।১।১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।

বিনীত :—

গ্রন্থকার।

তৃতীয় সংস্করণের অবতারণা ।

"প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা" নামক পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ অতি অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে পুস্তকখানি প্রাচীন পীড়াব চিকিৎসায় একটী বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং সুধী পাঠকবর্গ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকবৃন্দ দ্বারা পুস্তকখানি সমাদৃত হইয়াছে। পাঠকগণ সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে আমাদের একমাত্র প্রিয়তম পুত্র ডাক্তার রতন চন্দ্র ঘটক পূর্ব্বেই আমাদিগকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছে ও তাহার উপর গত ১৯৪০ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে আমার স্বামী, এই পুস্তকের গ্রন্থকার, পরলোকগমন করায় ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার আমার উপর বর্ত্তে। আমি পুস্তকটীর পুনঃমুদ্রণ বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়ি ও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মঙ্গলময়ের কৃপায় বর্ত্তমানে এ গুরুভার হইতে কোন প্রকারে নিস্কৃতি লাভ করিলাম।

এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করা হইল না এবং তাহার কোন আবশ্যকতাও নাই। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য কাগজের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুস্তকখানির মূল্য ।॰ চারি আনা বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি সেজন্য সুধী পাঠকবর্গ কিছু মনে করিবেন না।

এই পুস্তকটীর প্রুফ সংশোধন কার্য্যে আমার স্বর্গগত স্বামীর সহকারী চিকিৎসকদ্বয় ডাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, এইচ এম-বি, এম-এইচ. এস (আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা) ও ডাঃ হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এম-এইচ-এস

এবং আমার কনিষ্ঠ জামাতা ডাঃ মহিম মোহন ভট্টাচার্য্য, এম-এইচ-এস, পি-আর-এস- এম্ ও তাঁহার ছাত্রদ্বয় শ্রীমান্ মন্মথ নাথ প্রামাণিক, বি-এ, এম-এইচ.এস ও শ্রীমান্ অনিল কুমার গোস্বামী, এম-এইচ.এস বাবাজীগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের সহযোগীতা ব্যতীত এ কার্য্য সুদূরপরাহত হইত। তাহারা আমার পুত্রস্থানীয় আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি এবং ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি যেন তাহারা সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় সুখে ও শান্তিতে থাকিয়া ক্রমেই উন্নতি লাভ করে।

৯৯বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১১ই চৈত্র, ১৩৪৮ সাল।

বিনীতা—
গ্রন্থকারস্য পত্নী।

ডাক্তার নীলমণি ঘটক, বি. এ.

জন্ম—১৮৭২ মৃত্যু—১৯৪০

প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা।

:*:-

পূর্ব্বাভাস।

১ম পরিচ্ছেদ।

পীড়ার প্রকৃত নিদান। (১)

অনেকেই পীড়া বিশেষের নিদান লইয়া নানা মতামত ও আলোচনা বিষয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে আসল কাজে বড় একটা সময় পান না। কিন্তু প্রকৃত হোমিওপ্যাথির পন্থানুলম্বিদের পক্ষে এরূপ করা কতকটা বৃথা পরিশ্রম এবং কতকটা আসলতত্ত্ব হারাইয়া অলীকপথের অনুসরণ মাত্র, বলা যাইতে পারে। অনেকে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি বিষয়ে নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন--দূষিত জলে ম্যালেরিয়ার বীজ জন্মে, এবং এক প্রকার মশককুল এই বীজ বহন করিয়া মনুষ্যদেহে সঞ্চারিত করে। কেহ বা অনেক গবেষণা দ্বারা আরও অন্য প্রকার কারণ আবিষ্কার করেন। এই নিদান বাহির করিবার জন্য সরকার বাহাদুর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খরচ করিয়াছেন ও করিতেছেন; সরকার বাহাদুর এলোপ্যাথির পক্ষপাতী, হোমিওপ্যাথির সত্য স্বীকার করেন না। এলোপ্যাথি মতে নিদানের বিপরীত চিকিৎসাই অনুমোদিত, কাজেই এলোপ্যাথের পক্ষে এইরূপ নিদান অনুসন্ধান কর্ত্তব্য হইতে পারে।

কিন্তু যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথিতত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন—তিনি জানেন যে, পীড়ার নিদান বাহিরে নহে, বাহিরের কারণ কেবলমাত্র উত্তেজক কারণ। আগন্তুক ব্যাধি (যথা—বৃক্ষ হইতে পতনজনিত আঘাত বা অস্ত্রাঘাত বা অগ্নিদাহ ইত্যাদির কথা স্বতন্ত্র) প্রকৃত পীড়াপদবাচ্য নহে। প্রকৃত পীড়ার নিদান,—বাহিরে নহে, ভিতরে। ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানে এরূপ বহুলোক আছেন যাঁহারা আদৌ ম্যালেরিয়াক্রান্ত হন না—ইহার কারণ কি, তথ্য করা উচিত। যিনি প্রকৃত হোমিওপ্যাথ তিনি জানেন যে, কোনও ব্যক্তির জ্বরের বিশেষ লক্ষণের সহিত জেল্‌সিমিয়ামের বিশেষ লক্ষণের মিল থাকিলে সে জ্বর জেল্‌সিমিয়ামের দ্বারা সারিবে,—সে জ্বর ম্যালেরিয়া জনিতই হউক, অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক। এলোপ্যাথের জানা আবশ্যক যে, এই জ্বর ম্যালেরিয়া জ্বর, তাহা হইলেই তিনি জীবাণুনাশক কুইনাইন দিবেন। আপনি হোমিওপ্যাথ আপনার জানিয়া লাভ কি,—ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, কি বসন্তজ্বর, কি দুর্ভিক্ষজ্বর, যেহেতু আপনি জেল্‌-সিমিয়াম ব্যতীত অন্য ঔষধ দিতে পারিবেন না। আর সেই ম্যালেরিয়া-বীজ মশকেই আনুক বা অন্য কোনও উপায়েই আসুক, আপনার কার্য্যে এ সকল বিষয় কিছুই সহায়তা করিতে পারিবে না। আপনার আবশ্যক ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে প্রত্যেক ঔষধটীর লক্ষণগুলি মনে রাখা, এবং যে ঔষধের বিশেষ লক্ষণ আপনার রোগীর বিশেষ লক্ষণের সহিত মিল হইবে, তাহা প্রয়োগ করা। এই জ্বর ম্যালেরিয়া জনিত কি না, বা এই ম্যালেরিয়ার কারণ কি, এ সকল চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? আপনার চিকিৎসা নিদান অনুসারে নহে, আপনার কোনও "বীজাণু" নাই, বা তাহার বিনাশকল্পে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা, আপনার নহে। অবশ্যই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পীড়ার বাহিরের কারণ অর্থাৎ উত্তেজক কারণ বিষয়েও জ্ঞান আবশ্যক—কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে ততটা

নহে, গৃহস্থের পক্ষে বটে, যেহেতু উক্ত উত্তেজক কারণসমূহ ত্যাগ করিয়া চলিতে পারিলে পীড়ার হাত হইতে অনেকটা অব্যাহতিলাভ হইতে পারে। চিকিৎসকের বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের এ সকল কারণতত্ত্ব অনাবশ্যক।

ভিতরের কারণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বাহিরের কারণ লইয়া ব্যস্ত হইলে আরও বিপদ্ আছে। যদি জেল্‌সিমিয়ামের লক্ষণযুক্ত রোগী জেল্‌সিমিয়ামে না সারিল, বা কিছুদিন ভাল থাকিয়া পুনরাক্রমণ হইল, তখনই মনে হইবে যে জ্বরচিকিৎসায় কুইনাইন ব্যতীত কোনও ঔষধ নাই—হোমিওপ্যাথিতে জ্বরের প্রতিকার নাই,—ইত্যাদি। যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তবে রোগীর লক্ষণের মধ্যে সোরা বিষ বা প্রমেহ বিষ বা উপদংশ বিষ বা ইহাদের মধ্যে ২টী বা ৩টার লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যাইবে, এবং বুঝা যাইবে যে, সেই গুপ্ত শত্রু শরীরে থাকিয়া ঔষধের কার্য্য স্থায়ী হইতে দিতেছে না—তখন তাহার প্রতিবিধানকল্পে সোরা বিষনাশক বা সাইকোসিস্ বিষনাশক বা উপদংশ বিষনাশক যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। ফলতঃ যদি অন্তর্দৃষ্টি না থাকে, তবে কিরূপে এ প্রণিধান আসিবে ?

কারণানুযায়ী ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে—যথা সন্তরণ জনিত সর্দ্দি বা অঙ্গ বেদনা, রাত্রি জাগরণ জনিত উদরাময়, ইত্যাদি হঠাৎ পীড়া উপস্থিত হইলে, ঐ ঐ কারণসমূহ পীড়ার লক্ষণাবলীর মধ্যে একটী লক্ষণ হইবে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও লক্ষণসমষ্টিই ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে, কারণমাত্র লইয়া ঔষধ দেওয়া চলিবে না।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথি পথে ৩টী প্রধান সহায়—১। "সমঃ সমং শময়তি",—এই সূত্র। ২। স্বল্পতম বা সূক্ষ্মতম মাত্রা। ৩। একই সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ। আরও আছে, কিন্তু এই তিনটী একেবারে মৌলিক।

২য় পরিচ্ছেদ।

পীড়ার প্রকৃত নিদান। (২)

একক্ষণে, "পীড়ার **প্রকৃত নিদান** কি ?" এই প্রশ্নের উত্তর একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। মহাত্মা হ্যানিম্যান বহুবার বলিয়াছেন যে "সোরা"ই সর্ব্ববিধ পীড়ার প্রকৃত কারণ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "তরুণ পীড়ামাত্রই সুপ্ত সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র।"

'সোরা দোষ' বলিলে, ইহার প্রকৃত অর্থ অনেক সময় আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। অনেকেই সোরা অর্থে খোস প্যাঁচড়া বা কোনও প্রকার চর্ম্মরোগ মনে করেন,—কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। খোস পাঁচড়া বা কোনরূপ চর্ম্মরোগ সোরা নহে, তবে, সোরারূপ কারণের কার্য্য বা ফলমাত্র, সোরা অর্থে চর্ম্মরোগ নয়। সোরা দোষের একটী বিকাশ—খোস পাঁচড়া বটে। সোরা দোষ,—হেতু, এবং খোস পাঁচড়া,—তাহার ফল মাত্র,—খোস পাঁচড়া শরীরে সোরা দোষের অবস্থিতি জ্ঞাপন করে। অর্থাৎ কাহারও অঙ্গে খোস পাঁচড়া হইয়াছে দেখিলে জানিতে হইবে যে, তাহার শরীর সোরাদোষযুক্ত। যাহার শরীরে সোরা দোষ নাই, তাহার খোস পাঁচড়া হওয়া অসম্ভব। চর্ম্মরোগ বা খোস পাঁচড়ার পূর্ব্বাবস্থাই সোরা,—আগে সোরা, পরে খোস পাঁচড়া। কাজেই সোরা অর্থে খোস পাঁচড়া বা কোনও চর্ম্মরোগ বলিলে ভুল হইবে।

একক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে **সোরা** কি ?—সোরা মানব-শরীরের **একটী অবস্থা** মাত্র। মানব যতদিন বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মাবলী প্রতিপালন করিয়া জীবন যাপন করিতেছিল, ততদিন সোরা দোষ ছিল না। যতদিন মানবের চিন্তা, অনুভূতি, মনন ও কার্য্যসমূহের শৃঙ্খলা ছিল—ততদিন কোনও গোলযোগ ছিল না। যখন হইতে মানব

পরস্পরের প্রতি হিংসাপরবশ হইয়া ও সত্য বা প্রকৃত পথ হইতে স্খলিত হইয়া কুচিন্তা, কুইচ্ছা ও কুমনন আরম্ভ করিল, তখন হইতে মানবের শরীরযন্ত্রের মধ্যে একটী বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। ঐই বিশৃঙ্খলা সোরার **পূর্ব্বরূপ** বলা যাইতে পারে। এই বিশৃঙ্খলা হইতে সোরা দোষ, ও সোরা দোষ হইতেই আমরা বাহ্য প্রকৃতির দাস হইয়াছি ও আমাদের শরীর নানা পীড়ার আকরভূমি হইয়াছে। যতদিন মানব ন্যায় ও সত্যসঙ্গতভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, ততদিন তাহার রোগ-প্রবণতা আদৌ ছিল না, কেননা মানবের সত্যপথে থাকিবার জন্যই সৃজন। যখন স্রষ্টার নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘণ করিয়া মানব পরস্পরের প্রতি মিথ্যা বা অলীক ব্যবহার—অর্থাৎ অ-সত্যসঙ্গত অ-ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার আরম্ভ করিল, তখন হইতে তাহার নিয়ন্তার সৃষ্ট ও অভিপ্রেত —নির্ম্মল, স্বচ্ছ, সত্য ও সুশৃঙ্খল অবস্থার পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ঐ বিশৃঙ্খলা বা বিপর্য্যয়যুক্ত অবস্থা হইতেই সোরার সৃষ্টি। যে বিশৃঙ্খলা বা বিপর্য্যয়ের কথা উক্ত হইল, তাহা তখনও **মানসিক** অবস্থা মাত্র—তখনও কার্য্যবিপর্য্যয় ঘটে নাই, অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে মাত্র। এই অবস্থা বিপর্য্যয় না ঘটিলে সোরার আবির্ভাব অসম্ভব হইত। **মানসিক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে কার্য্য বিশৃঙ্খলা ঘটিবার কারণ মাত্র** সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও ঘটে নাই। অগ্রেই মনোদুষ্টি—পরে কার্য্যদুষ্টিও আসিবে, তবে এখনও আসে নাই। **কারণের সৃষ্টি হইল—কার্য্য** আসিবে।

অতএব দেখা গেল যে, প্রথমে অসৎ চিন্তা ও অসৎ মনন। একটু সামান্য প্রণিধান করিয়া বুঝিলে বেশ জানিতে পারা যাইবে যে, মনের এই প্রকার অবস্থা যাহাতে অন্যের প্রতি অ-সত্যচিন্তা এবং অ-সত্যমনন সম্ভব হয়, তাহা একপ্রকার মানসিক বা আভ্যন্তরিক "কণ্ডুয়ণ" মাত্র। এই "কণ্ডুয়ণ" অবস্থা হইতে মানবের রোগপ্রবণতার প্রথম সোপান

স্থাপিত হইল। আগে অসত্য চিন্তা ও তৎসঙ্গেই অসত্যমনন—পরে ঐ চিন্তা ও মনন হইতে তাহাদের অনুরূপ পরিবর্ত্তন বাহিরে সংঘটিত হইল। যেরূপ চিন্তা ও মনন, ভিতরে—ঠিক তদনুরূপ পরিবর্ত্তন, বাহিরে। ভিতরের কণ্ডুয়ণ অনুসারে বাহিরেও তদনুরূপ কণ্ডুয়ণ আরম্ভ হইল—কেননা বাহ্য কেবল মাত্র অভ্যন্তরেরই প্রতিচ্ছায়া। ভিতরের অবস্থা বাহিরে বিকসিত হইল। এক্ষণে উক্ত আভ্যন্তরিক অবস্থাবিপর্য্যয়ের অনুরূপ দৈহিক পরিবর্ত্তনের নাম সোরা, এই দৈহিক পরিবর্ত্তনই সোরার বাহ্য বিকসিত রূপ। সোরার এই অবস্থাতে মনুষ্য রোগ-প্রবণ হইয়া উঠিল—অর্থাৎ তাহার দেহের একরূপ একটী অবস্থা আসিল, যাহাতে সে বাহ্য প্রকৃতির অধীন হইয়া রোগশক্তির দাস হইয়া উঠিল। রোগশক্তিকে বাধা দিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অসত্য চিন্তা ও অসত্য মনন একপ্রকার আভ্যন্তরিক কণ্ডুয়ণ—ও এই আভ্যন্তরিক কণ্ডুয়ণের প্রতিরূপ বাহ্যিক কণ্ডুয়ণই সোরার আদি ও বিকসিত মূর্ত্তি। বাস্তবিক সোরার প্রথম আবির্ভাবে ইহা মানবদেহের কোনও অংশে কণ্ডুয়ণরূপে দেখা দেয় ও তৎসঙ্গে কণ্ডুয়ণের ফল-স্বরূপ রসপূর্ণ উদ্ভেদ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্যই সোরা অর্থে অনেকে "খোস চুলকানি" মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা নয়—ইহা সোরার ফলমাত্র বা কার্য্যমাত্র—ইহা সোরা নহে। সোরা না থাকিলে খোস চুলকানি হইতে পারে না। এমন কি, কণ্ডুয়ণই সোরা দোষের বর্ত্তমানতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—কণ্ডুয়ণ থাকিলে সোরা দোষ নিশ্চয়ই আছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—পারদ বিষ হেতু উদ্ভেদে কণ্ডুয়ণ থাকে না।

যাহা হউক, সোরা বলিলে কি বুঝিতে হইবে, তাহা বলা হইল—সোরা শরীরযন্ত্রের একপ্রকার দোষ বা দুষ্ট ধাতু, যাহা মানবের সকল প্রকার রোগের আদি ও মূলীভূত কারণ—যাহা থাকিলে মানবের

রোগ-প্রবণতা থাকে। আবার এই সোরা দোষ বংশানুক্রমিক চলিয়া আসিতেছে এবং ক্রমেই ইহার প্রভাব বৃদ্ধিই হইতেছে।

শরীরের আরও দুইটী দোষ আছে, তাহাদের নাম মেহ ও উপদংশ দোষ, এ গুলির বিষদ ব্যাখ্যা পরে প্রদত্ত হইবে। তবে এই পর্য্যন্ত এখানে বলা উচিত যে, ইহারাও, সোরা বর্ত্তমান না থাকিলে, মনুষ্যদেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। যাহার সোরা দোষ নাই, তাহাদের মেহ ও উপদংশ দোষ আসিতে পারে না। আর এক কথা, ইহা মনুষ্যের দুষ্কৃতি বা পাপকার্য্য হইতে আসে, অর্থাৎ ইহারা পাপ কার্য্যের ফল। যেহেতু অগ্রেই পাপচিন্তা ও কুমনন, পরে সেই চিন্তা ও মনন অনুসারে কার্য্য, সুতরাং সেই কুকার্য্যরূপ হেতুটী আসিবার পূর্ব্বে সোরা দোষ অবশ্যই থাকা চাই,—নতুবা ইহাদের আক্রমণ অসম্ভব। মোটকথা—সোরা অসৎ চিন্তা ও অসৎ মননের ফল—আর মেহ এবং উপদংশ অসৎ কার্য্যের ফল।

মানবের এই সোরা দোষ নিজেই নানা পীড়ার কারণ, আবার ইহা নানাভাবে মিশ্রণ বা মিলন দোষে বহুবিধ করালমূর্ত্তিতে ধ্বংস কার্য্যের সহায়তা করিতেছে—সে গুলি একে একে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতে মানবের এই সোরা দোষকে আরোগ্য না করিয়া কেবল তেজস্কর ভেষজ-শক্তির দ্বারা ক্রমাগত চাপা দিয়া আসিতেছে। আশু উপকার দর্শাইবার উদ্দেশ্যে বহিস্থ উদ্ভেদাদির উপর উগ্রবীর্য্য-প্রলেপাদি প্রয়োগ দ্বারা সোরাকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া মানব দেহস্থ যন্ত্র সকলকে পীড়াগ্রস্ত করিতেছে। কোনও বালকের খোস চুলকানি হইয়াছে, তাহার উপর বাহ্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া খোস চুলকানি সত্বর বিলুপ্ত বা দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আরোগ্য ত হয়ই না, উপরন্তু উক্ত প্রলেপের গুণে খোস চুলকানিগুলি (যাহা সোরার বহির্ব্বিকাশ মাত্র) দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া ঐ বালকটীর

আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলকে ভয়ানক ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। বালকের হয়ত স্নায়ুমণ্ডলীর বিকৃতি উৎপাদন করিয়া ভয়ানক শিরঃপীড়া আনিল। তখন এল্যোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয় বলিবেন—"সে রোগ সারিয়াছে—এটী একটী নূতন রোগ"। তিনি এই "নূতন" রোগের "চিকিৎসা" আরম্ভ করিয়া সেই চাপা দিবার পথেই চলিলেন—উগ্রবীর্য্য ভেষজ যথা অহিফেন ইত্যাদির দ্বারা যাহাতে রোগীর শিরঃপীড়ার যাতনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা না থাকে, তিনি তাহাই করিলেন—ক্রমে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইল। এইরূপে একের পর বা একের সঙ্গে সঙ্গেই আরও এক এক করিয়া নানা বিভ্রাট ঘটিতে লাগিল। কাজেই দেখা যায় যে, এক সোরা দোষকে না সারাইয়া চাপা দিবার ফলে কতকগুলি নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি করা হয়। আমি যে কত রোগীর ঐ প্রকার চর্ম্ম রোগের ইতিহাস পাইয়া, লক্ষণবিশেষে সালফার, সোরিনাম্, মেজেরিয়াম্, নেট্রাম্ মিউর, সিপিয়া ইত্যাদির মধ্যে যাহার সহিত লক্ষণসমষ্টির মিল হইয়াছে, সেই ঔষধ দ্বারা কত দুরারোগ্য পুরাতন রোগ আরাম করিয়াছি, তাহা গণনার অতীত। মহামতি অ্যালেন, কেণ্ট, ফ্যারিংটন্ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের ঐরূপ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং মহাত্মা হ্যানিম্যানের প্রদর্শিত প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক পন্থাবলী সকল চিকিৎসকই তাঁহাদের নিজ নিজ চিকিৎসাতে ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। নিদানে যে সকল রোগ নানা নামে পৃথক পৃথক ভাবে অভিহিত আছে, সকলই এক সোরা বৃক্ষের ফল মাত্র। এই প্রকার চিকিৎসা প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা নহে—কেবল চাপা দিবার বিধানমাত্র এবং চাপা দিতে গিয়া এলোপ্যাথি ভেষজের ক্রিয়ার গুণে ও মিলনে সুখসাধ্য পীড়া দুরারোগ্য ও অসাধ্য হয় মাত্র।

২। সোরা দোষ আবার মেহ ও উপদংশের সহিত মিলিত হইয়া যে কত সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে—তাহা বর্ণনার অতীত। যখন মানব-

দেহ কুকার্য্যের ফলে প্রথম মেহ বা উপদংশ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন প্রকৃতভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইলে, উহারা প্রথমেই আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা না হইয়া এলোপ্যাথিক ইঞ্জেক্সন্ ইত্যাদির দ্বারা রোগশক্তিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া তুলে ও সোরা দোষের সহিত মিলিত করিয়া দেহটীকে নানা পীড়ার আধার করিয়া ফেলে। বাত, ক্ষয়কাশ ইত্যাদি দুরারোগ্য বা অসাধ্য রোগ সকল এই মিলনের ফল।

৩। আমাদের দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ হইলেই যে তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইবে, বা হোমিওপ্যাথির বাক্স হইতে ঔষধ দিলেই যে তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইবে, তাহা নহে,—কিন্তু সাধারণের ধারণা তাহাই। হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র অনুসারে প্রদত্ত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা না হইলে, তাহাকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বলা ভুল ও অন্যায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূলমন্ত্র ৩টী,—যথা (১) সদৃশ লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন। (২) এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ প্রয়োগ। (৩) সূক্ষ্মতম মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ। আমি যদি এই ৩টী মূলসূত্র লঙ্ঘন করিয়া আমার নিজের খেয়াল মত নির্ব্বাচিত ঔষধ, যথা—মাথা ধরিলেই বেলেডোনা, জ্বর হইলেই একোনাইট, সর্দ্দি হইলেই আর্সেনিক্ প্রয়োগ করি, অথবা ২টী বা ৩টী ঔষধ এককালে প্রয়োগ করি, বা অযথাভাবে নিম্নতম শক্তির ঔষধ দিই, তবে আমার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইল না বা তাহার দ্বারা রোগীর কোনও লক্ষণের বা ২।৩টী লক্ষণ-সমষ্টির, কিছুকালের জন্য অন্তর্দ্ধান হইলেও, তাহাকে "আরোগ্য" বলা যাইতে পারে না। একোনাইট দিলে হয়ত সঙ্গে সঙ্গে গাত্রতাপ কমিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে "আরাম" বলা যাইতে পারে না, কেননা একোনাইট ঐরূপ প্রয়োগে কেবল মাত্র হৃৎপিণ্ডের উপর একটী অযথা শক্তি প্রয়োগ দ্বারা উক্ত যন্ত্রের অবসাদ ঘটাইয়া তাপ কমাইল, কিন্তু

প্রতিক্রিয়াতে সর্ব্বনাশ ঘটে। নিউমোনিয়াতে ভিরেট্রাম্ ভিরিডি অসমলক্ষণে প্রয়োগ করিয়া এক সময়ে যে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহা বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। অনেক হোমিওপ্যাথিক নামধারী চিকিৎসক পর্য্যায়ক্রমে ২।৩টী ঔষধ প্রয়োগ করেন, কেহ বা ঔষধের কেবল ১×, ২×, ৩× শক্তি ব্যবহার করেন। এই ভাবের চিকিৎসাতেও রোগ আরোগ্য না হইয়া চাপা পড়ে ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা কোনও প্রকারেই ভাল ফল আশা করা যায় না। যে চিকিৎসক প্লীহা বৃদ্ধি শুনিলেই সিয়ানোথাস্ মাদার টিং বা ১× ২।৩ বার করিয়া ২।১ মাস ব্যবহার করাইয়া প্লীহা কমাইবার আশা করেন, হাঁপানি হইয়াছে জানিলেই ব্লাটা ওরিএন্টেলিস্ হাঁপের অবস্থায় দিয়া থাকেন, তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথ নাম দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এই প্রকার চিকিৎসাতেও সোরা দোষ আরও বৃদ্ধি পাইয়া ও রোগ-শক্তিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া রোগটীকে দুরারোগ্য করে ও নানা নামের নানা রোগ সৃষ্টি করে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন বা আপত্তি করেন যে, সোরাই বিবিধ রোগের কারণ ও এলোপ্যাথিক বা উপরোক্ত প্রকার অদ্ভূদ্ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার ফলে যে অন্য রোগের সৃষ্টি হয় বলিয়া বলা হইল,—এ কথার প্রমাণ কি? কিরূপে বৈজ্ঞানিক ভাবে জানা যাইতে পারে যে উক্ত কথা প্রামাণিক? হইতে পারে—একথা চিকিৎসক বিশেষের প্রলাপোক্তি। অতএব ইহার প্রমাণস্বরূপ কথিত নিম্নলিখিত পংক্তি-গুলি প্রণিধান করিলেই বিষয়টী জটিল হইলেও বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে, আশা করি।

প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক নিয়ম অনুসারে যদি চিকিৎসা করা যায়, তবে এই সত্যগুলি প্রতিভাত হইবে, যথা—

(ক) কোনও রোগীর রোগলক্ষণ ও ইতিহাস রীতিমত রেজষ্ট্রী করিয়া

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন ও দেখিলেন যে, রোগী বর্ত্তমান সময় যে রোগলক্ষণসমষ্টি ভোগ করিতেছে, তাহা ২।১ বৎসর মাত্র হইয়াছে, যথা রোগী হয়ত এখন বৈকালে সামান্য জ্বর, কাশী ও গাত্রদাহ, সময়ে সময়ে শীতবোধ, অক্ষুধা, অরুচি, উদরাময় ইত্যাদিতে ভুগিতেছে ; ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সবিরাম জ্বর হইত, কুইনাইন ও টনিক খাইয়া তাহা সারে ; আরও ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহার পায়ের উপর এক প্রকার চর্ম্মরোগ হয়, তাহাতে বড় কষ্ট পায় এবং কোনও ডাক্তার কোনও মলম দিয়া সারান, ঐ চর্ম্মরোগে অত্যন্ত পুঁজ ও রস নির্গত হইত ও দুর্গন্ধ বাহির হইত ; আরও কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার সর্ব্বাঙ্গেই এক প্রকার চুলকানি হইয়াছিল, তাহাতে রাত্রে শয়নের পর তাহাকে অস্থির হইতে হইত, এবং যদিও তাহাতে সামান্য রস বা রক্ত ব্যতীত অপর কিছু স্রাব হইত না বটে, কিন্তু চুলকানির জন্য বড় কষ্ট হইত, ইত্যাদি। ঐ রোগীর ধাতুগত লক্ষণাদি উত্তম করিয়া লইয়া জানিলেন যে, সে ব্যক্তি গরমে থাকিতেই ভালবাসে, ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহার কষ্ট বাড়ে ও সর্দ্দি হয়, শিরঃপীড়া হয়, দুগ্ধ তাহার আদৌ সহ্য হয় না, মেজাজ বড় খিট্‌খিটে, ইত্যাদি। উপরোক্ত রোগ-লক্ষণসমষ্টি এবং ধাতুগত লক্ষণগুলি একত্র করিয়া স্থির করিলেন যে, আর্সেনিক্ এল্‌বাম্ তাহার ঔষধ হইবে, এবং আর্সেনিক্ উচ্চ শক্তি আপনি দিলেন। এক মাত্রা প্রয়োগ করিবার ২।৩ মাসের মধ্যে আপনি দেখিবেন, তাহার বর্ত্তমান রোগের লক্ষণশমষ্টি অন্তর্হিত হইয়াছে— কিন্তু রোগী আসিয়া বলিবে, "মহাশয় আমার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে যে সবিরাম জ্বর হইত, তাহা আবার দেখা দিয়াছে"। আপনি আপনার রেজষ্ট্রি দেখিয়া জানিলেন যে, প্রকৃতই ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে তাহার সবিরাম জ্বর হইয়াছিল লেখা আছে। আপনি বুঝিলেন যে উত্তমই হইয়াছে। এই রূপে আপনি যদি উত্তমভাবে লক্ষ্য করেন এবং আপনার প্রদত্ত ঔষধের কার্য্যকে কোনও প্রকার বাধা না দেন, তবে দেখিবেন যে, ক্রমেই পূর্ব্ব

পূর্ব্ব অবস্থাগুলি একে একে আসিবে, অর্থাৎ যে গুলি অচিকিৎসায় নিরাময় না হইয়া কেবল চাপা পড়িয়াছিল, সেগুলি একে একে আসিবে ও আরোগ্য হইবে এবং সর্ব্বশেষে সোরার আদি বিকাশ স্বরূপ শুষ্ক চুলকণা উদয় হইয়া অন্তর্হিত হইবে এবং আপনার রোগী নির্ম্মলভাবে ও প্রকৃত প্রস্তাবে আরোগ্য হইবে। এই প্রকার **পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণের ক্রমিক আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া সোরার আদি মূর্ত্তিতে পৌঁছিলে,** আপনার মনে আদৌ সন্দেহ থাকিবে না যে, সোরার "চাপা দেওয়া" হেতু এত বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। এলোপ্যাথিক ডাক্তার মহাশয় ঐ আদি খোসচুলকানার নাম কহিয়াছিলেন—চুলকানা, তাহার পরের চর্ম্মরোগকে কাউর, তাহার পর জ্বর হইলে তাহাকে সবিরাম জ্বর, তাহার পর রোগীর বর্ত্তমান অবস্থাকে ক্ষয়রোগ, ইত্যাদি,—নানা নাম দিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে **এক সোরা ভিন্ন কেহ কিছুই নয়।**

(খ) অনেক সময় রোগীর রোগলক্ষণসমষ্টি, আপনার চিকিৎসায় উপস্থিত কিছুদিনের জন্য অন্তর্হিত হইলেও আপনি দেখিবেন যে, সেগুলি বার বার আসিতেছে, একেবারে নিরাময় হইতেছে না—সে অবস্থায় আপনি সোরাদোষঘ্ন ঔষধ অর্থাৎ সোরাদোষের বিরোধী ঔষধ সকলের মধ্য হইতে লক্ষণানুসারে নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রায়োগ না করিলে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে না—ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে,—সোরাই আরোগ্যের পথে বাধা দিতেছিল।

পূর্ব্বাভাস।

৩য় পরিচ্ছেদ।

"রোগ ও রোগী।"

হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্যান্য সকল মতের চিকিৎসানুসারে "রোগ" চিকিৎসা করিবারই ব্যবস্থা আছে, "রোগী" যেমনই হউক না কেন। যদি তাহার নিউমোনিয়া হইয়াছে, তবে অপর একটী রোগীর নিউ-মোনিয়াতে যে প্রকার চিকিৎসা হইয়াছে, ইহার নিউমোনিয়াতেও তাহাই কর্ত্তব্য। কেবল, রোগীর বয়সভেদে ঔষধের মাত্রার একটু তারতম্য হইবে, এই পর্য্যন্ত। "রোগের" নাম যদি পাওয়া গেল, তবে আর চিন্তার কোন কারণ নাই,—বাঁধা নিয়মবদ্ধ চিকিৎসার প্রণালী আছে, তদনুসারে "চিকিৎসা" করা অর্থাৎ ঔষধ দিলেই হইল। দুইটী নিউমোনিয়া রোগীর মধ্যে যদি একজন তাহার বুকে পুলটীস চাপাইবা মাত্র চিৎকার করিতে থাকে, কেননা সে তাহার দেহে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব করিতেছে, এজন্য সে কোনও প্রকার তাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না, এবং আর একজন গরম গরম পুলটীস দিলে আরাম বোধ করে, কেননা সে সর্ব্বদা শীত অনুভব করিতেছে—এবং এই দুইজন রোগীই যদি একই চিকিৎসকের হাতে থাকে, তাহা হইলেও তিনি উভয়কেই গরম পুলটীসেরই ব্যবস্থা করিবেন,—কেননা তিনি বলিবেন, "পুলটীস না দিলে ভিতরের কফ নরম হইবে কেন?" রোগী দুইটীর মধ্যে একজনের **তাপাভিলাষ** ও আর একজনের **শৈত্যা-ভিলাষ**,—এই যে **ব্যক্তিগত বিভিন্নতা**, তাহাতে চিকিৎসকের চিকিৎসা-প্রণালীর তারতম্য হইবে না,—যেহেতু তিনি "রোগ" আরোগ্য করিতে চান। বরং তিনি কহিবেন যে, "রোগী" যদি পুলটীস লইতে

না চায়, তাহা হইলেও যেন জোর করিয়া দেওয়া হয়। মনে করুন, তিনটী লোকের সবিরাম জ্বর হইতেছে, তাহার মধ্যে একজনের জ্বরটী প্রাতঃকালে ৯।১০টার সময় কম্প দিয়া আসে, যতক্ষণ জ্বর থাকে, দারুণ পিপাসা থাকে, এবং ভয়ানক শিরঃপীড়া; আর একজনের জ্বর বৈকাল ৩।৪টার সময় আসে, ভয়ানক হাত পা জ্বালা, কিন্তু পিপাসা আদৌ নাই; এবং তৃতীয় ব্যক্তির জ্বর সন্ধ্যায় আসে, সমস্ত রাত্রি থাকে, অত্যন্ত পিপাসা অথচ একটু একটু জল খায়, এবং অতিশয় অস্থিরতা। ফলতঃ এই তিন জন রোগীর জ্বর হইয়াছে, জানিতে পারিলেই হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য মতের চিকিৎসকের চিকিৎসা চলিবে, এবং জ্বর যখন মগ্ন হইতেছে, তখন তিন জনকেই এলোপ্যাথিক মতের চিকিৎসায় কুইনাইন দেওয়া হইবে। কেননা, তিন জনেরই ত জ্বর, কাজেই "জ্বরের" প্রতিকার কুইনাইনের দ্বারা হইবে। উক্ত তিন জন রোগীর ব্যক্তিগত লক্ষণের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা "জ্বরই" চিকিৎসার বিষয়। আরও উদাহরণ দ্বারা বেশ বুঝাইতে পারা যায় যে, **রোগের** প্রতিকারই চিকিৎসকের একমাত্র লক্ষ্য, **রোগীর** প্রতি আদৌই লক্ষ্য নাই। এই মতের চিকিৎসক যদি না জানিতে পারিলেন যে, রোগীর কি **রোগ** হইয়াছে, তবেই সর্ব্ব-নাশ, তিনি বলিবেন "রোগের" ডায়গনসিস্ চাই, তাহা না হইলে চিকিৎসাই চলিতে পারে না। যদি কোন চিকিৎসক আসিয়া রোগটী ডায়গনসিস্ করিতে না পারিলেন বা কিছু সন্দেহবান হইলেন, তখনই অন্য ডাক্তার দুই এক জনকে আনাইয়া "রোগটী" কি, আগে নিরাকরণ করিবার বিশেষ ভাবে চেষ্টা হইবে, কেননা "রোগ" ঠিক করিতে না পারিলে চিকিৎসাই অসম্ভব। আবার যদি ৩।৪ জন চিকিৎসকের মধ্যে নানা মত হইল, তবে ত আরও বিপদ, ভয়ানক বিভ্রাট, কি রোগ তাহা ঠিক হইতেছে না—সকলেই মাথা কুটাকুটী করিতেছেন,

অথচ রোগী হয়ত ক্রমেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা এই চিকিৎসক মহাশয়দের গভীর গবেষণাবাহুল্য হেতু লক্ষ্য করিবার অবসর নাই। আমার বেশ মনে আছে, ১১১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে, মানভূম জেলার বরাবাজার নামক স্থানে শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মোদক মহাশয়ের একটী মোকদ্দমার সালিশী করিতে গিয়াছিলাম, গিয়া দেখি যে তাঁহার গৃহস্থ বিব্রত, কেননা ৮ বৎসর বয়স্ক তাঁহার একটী পুত্রের প্রবল জ্বর ও ৫০।৬০ বার করিয়া দুর্গন্ধ বাহ্য, পিপাসা, অস্থিরতা ইত্যাদি হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছে। চণ্ডীবাবু বেশ ধনাঢ্য ব্যক্তি, নানা চিকিৎসক আনাইয়াছেন, তবে তাঁহারা ঠিক করিতে পারিতেছেন না যে, কোনটী "স্বাধীন" রোগ—অতিসারটী জ্বরের কারণ, কি জ্বরটী অতিসারের কারণ, এই সমস্যার সামাধান না হওয়া পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ হইতেছে না, এদিকে রোগী ত "যায় যায়" হইয়া উঠিয়াছে। আমার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ খ্যাতনামা উকিল ছিলেন, তিনি চণ্ডীবাবুকে কহিলেন—"তোমার চিকিৎসকগণ ত এই অবস্থায় ঔষধ দিতে পারিতেছেন না—আমি বলি, ইতিমধ্যে আমাদের নীলমণিবাবু ২।১ ডোজ ঔষধ দিন—তাহা হইলেই আর ঐ প্রশ্নের সমাধানের তত প্রয়োজন হইবে না।" তিনি ও তাঁহার মক্কেল চণ্ডীবাবু আমাকে অনুরোধ করায় আমি আর্সেনিক ৩০—২।৩ মাত্রাতেই সেই রোগীকে আরাম করি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী সারিল—এদিকে ঐ গভীর প্রশ্নের সমাধান হইল কিনা আমি সংবাদ লই নাই, কেননা রোগী একটু সারিতে আরম্ভ করিবামাত্র আমরা সালিশী কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছিলাম। যাহা হউক, মোট কথা, আমরা (অর্থাৎ হোমিওপ্যাথ) ব্যতীত সকলেই রোগের ডায়গনসিস্ করিতে ব্যস্ত, কেননা, রোগ স্থির না হইলে, তাহার চিকিৎসাই হইতে পারে না।

আমাদের তাহা নয়—আমাদের রোগীই সর্ব্বস্ব, "রোগ" কি, তাহা

আমাদের জানা অসম্ভব, কেননা মনুষ্যজ্ঞান ততদূর পৌঁছিতে পারে না। "রোগীর" শারীরিক ও মানসিক লক্ষণগুলির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, মানুষটী সুস্থ নয়, সে অসুস্থ, এবং আমরা সেই "রোগী"টীকে আরাম করিবার প্রয়াস পাই—তাহা হইলে তাহার রোগ লক্ষণ আপনিই সারিয়া যায়। একথা বলা যত সহজ, বোঝা তত সহজ নয়, কাজেই একটু বিস্তৃতভাবে লেখা আবশ্যক। তাহা ছাড়া, এ সকল বিষয় বড়ই দুর্ব্বোধ, কাজেই উদাহরণাদির দ্বারা প্রথমে একটু পরিষ্কার করিয়া পরে মূলতত্ত্ব সকল বর্ণনা করিলে বোধ হয় ভাল হইবে।

অন্য এক ব্যক্তি আপনার নিকট আসিয়া কহিল,—"মহাশয়, আমি কোষ্ঠবদ্ধের জন্য বড় কষ্ট পাইতেছি।" আরও কহিল,—"আমার এই কোষ্ঠবদ্ধ ৮।৯ বৎসর হইয়াছে, আমি অনেক চিকিৎসককে দেখাইয়াছি, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে জোলাপ লইতে বলেন, ও বলেন, "তোমার লিভারের রোগ হইয়াছে", কিন্তু অনেকেই আমার লিভার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ও কহিয়াছেন যে বিশেষ কিছু রোগ বলিয়া মনে হয় না—তবে মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওয়া ছাড়া আর বিশেষ চিকিৎসা কেহই উপদেশ দেন নাই।" এক্ষণে দেখা গেল যে, ঐ সকল চিকিৎসকদিগের মতে তাহার এখনও কোন রোগ হয় নাই, যদি কিছুদিন পরে তাহার লিভারটী বড় ও শক্ত দেখা যায়, তবে তাঁহারা কহিবেন যে "হাঁ, রোগ হইয়াছে বটে, ইহাকে যকৃৎবিবৃদ্ধি বলে।" যতক্ষণ রোগী কেবলমাত্র অসুবিধা ও কষ্ট বা "অসুস্থতা" মাত্র অনুভব করিতে থাকে, ততক্ষণ তাহার কোনও অসুখ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না—যখন একটা এমন কিছু হইয়া উঠে, যে হাতে ঠেকে, স্পর্শ করিয়া দেখিবার মত হয়, তখন বলেন অমুক "রোগ" হইয়াছে। কোনও স্ত্রীলোকের হয়ত ৬।৮ মাস ধরিয়া তলপেটে মধ্যে মধ্যে যাতনা হইতেছিল—তাঁহারা বলিবেন "ও কিছুই নয়।" অথবা যাহাতে দুই এক বার বাহ্যে হয়, এমন কোনও জোলাপ দিয়া

থাকেন—পরে হয় ত একটী স্থানে যখন অর্ব্বুদ আকারে স্পর্শযোগ্য কিছু হইয়া উঠিল, তখন বলিলেন "টিউমার" হইয়াছে, অস্ত্র করিতে হইবে। কোনও ব্যক্তির অনেকদিন হইতেই এরূপ হইয়াছে যে, সে সামান্য ঠাণ্ডাও সহ্য করিতে পারে না, একটু ঠাণ্ডা লাগুক বা না লাগুক, মধ্যে মধ্যে সর্দ্দি হইতেছিল—সে অবস্থায় চিকিৎসকেরা কহিবেন—"ও কিছুই নয়", অথবা, "একটু সাবধানে থাকিবে, যেন ঠাণ্ডা না লাগে।" অন্য এক ব্যক্তির তাহার অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা লাগাইলেও কেন সর্দ্দি হয় না, আর উহারই বা হয় কেন—তাহার বিষয় তাঁহারা কিছু অনুসন্ধান বা নিরাকরণ করিবেন না, বা কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে করিবেন না, পরে যখন ৩০।৩২ বৎসর বয়সে তাহার দারুণ অবস্থা আসিয়া পৌঁছিল, তখন বলিলেন, "থাইসিস হইয়াছে, ইহার আর কি করিব, এ রোগের নাম যক্ষ্মা রোগ, ঠাণ্ডা লাগাইও না, আর কড্‌লিভার অয়েল খাও, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা অনুভব করিবার যোগ্য হইলে, তবে একটা "রোগ" বিশেষের নামকরণ করিয়া অমুক ডাক্তার এই "রোগে" এই প্রকার চিকিৎসা করিয়াছেন, অতএব তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা বলেন।

আপনি হোমিওপ্যাথ, যদি প্রকৃত প্রস্তাবে হোমিওপ্যাথ হন, তবে আপনি জানিবেন যে, যে যক্ষ্মারোগে আজ একজন মানবলীলা সংবরণ করিতেছে, সে অনেক দিন হইতে "রোগী", **যখন হইতে** তাহার সামান্য ঠাণ্ডাও অসহ্য বোধ হইতে আরম্ভ করে ও সামান্য ঠাণ্ডাতেই সর্দ্দিকাশী হইতে থাকে, **তখন হইতে, এমন কি, তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতেই সে "রোগী"**। তখন সে রোগীকে চিকিৎসা করিলে, তাহার এখন এ দশা আদৌ ঘটিত না। আজ যাহার "টিউমার" হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ হইতেছে, তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে চিকিৎসা কর্ত্তব্য ছিল। "রোগীর" চিকিৎসা হইলে জীবনীশক্তি সূক্ষ্ম ভাবে স্বাভাবিক গঠন

২

কার্য্য, ক্ষতিপূরণকার্য্য অবাধে চালাইতে পারিত, তাহা না হওয়ায়, যেখানে ক্ষতিপূরণ বা সুগঠন করা হইত, সেখানে তাহা না করিতে পারিয়া কু-গঠন বা অ-গঠন করিয়া অর্ব্বুদাদির নির্ম্মাণ, অর্থাৎ অপনির্ম্মাণ বা কুনির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছেণ কাজেই অন্য যাহাকে "রোগ" বলিয়া অন্যান্য চিকিৎসকগণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা "রোগ" নহে, "রোগের" ফল মাত্র। শরীরস্থ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই ধাতুদিগের যখন এমন একটা পরিবর্ত্তন ঘটে, যে তাহা চিকিৎসকদিগের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, তখনই কেবল তাঁহারা "রোগ' হইয়াছে বলেন, কিন্তু ঐ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্ব, বহুপূর্ব্ব হইতে—তাহার "রোগ" হওয়ায়, তাহারই ফলস্বরূপে ঐ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত বা চিন্তার অযোগ্য, কাজেই চিকিৎসার অবিষয়ীভূত। ব্যক্তিবিশেষের, কেন বা কি হেতু ঐ সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, অন্য লোকেরই বা তাহা ঘটে না কেন,—এ সকল চিন্তা তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। আপনি যদি প্রকৃত হোমিওপ্যাথ হন, তবে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, একটী পীড়া বলিলে মনুষ্যটি পীড়িত বলিতে হইবে, তাহার দেহ বা দেহস্থ কোনও যন্ত্রবিশেষ পীড়িত, একথা সম্পূর্ণ ভুল। "মনুষ্যটী" পীড়িত হওয়ায় তাহার ফলস্বরূপ তাহার যকৃতে, তাহার হৃদযন্ত্রে বা তাহার অন্ত্রে, রোগটীর "বিকাশ" হইয়াছে মাত্র, ফলতঃ ঐরূপ বিকাশ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই মনুষ্যটী পীড়িত, এবং তদবস্থায় তাহাকে আরোগ্য করিলে, আর "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য" হইয়া পীড়াটী "বিকশিত" বা "পরিণত" হইতে পারিত না। সর্ব্বদা আপনার হৃদয়ে এ কথাটী বদ্ধমূল থাকা চাই যে, মনুষ্যটী পীড়িত, তাহার শরীরস্থ যন্ত্র বা ধাতু পীড়িত নহে, পীড়াযুক্ত যন্ত্রটী পীড়ার বিকাশভূমিমাত্র, এবং এই যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বেই "পীড়িত" ব্যক্তি প্রকৃতভাবে চিকিৎসিত হইলে, আরোগ্য হইতে পারিত, এবং তাহা

হইলে **ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্ত্তন** ঘটিত না। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে পীড়া বলিয়া অন্যান্য চিকিৎসকগণ কহিতেছেন—সেই পীড়াটী জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, বহুপূর্ব্ব হইতেই "মনুষ্যটী" পীড়িত। যতদিন ঐ সকল চিকিৎসক "ডায়েগনসিস্" না হইলে চিকিৎসার উপায় নাই, বলিয়া কালক্ষয় করিয়াছেন, তখন হইতে **প্রকৃত** পীড়ার অচিকিৎসার **ফলস্বরূপে** যন্ত্রাদিতে বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে অতিরিক্ত কঠিন আকার ধারণ না করা পর্য্যন্ত, এ সকল চিকিৎসার বিষয় নহে, ইহাই এলোপ্যাথের ধারণা। কেননা, যখন **কেবল মনুষ্যটী** পীড়িত, **এখনও ফলস্বরূপ** তাহার দেহস্থ যন্ত্রাদি বা ধাতুবিশেষে ইন্দ্রিয়গোচর ভাবে কিছু বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, তখন "ডায়াগনসিস্" হইতে পারে না—অতএব তাহার প্রতিকারও অসম্ভব।

আমরা বেশ বুঝিলাম যে, "রোগীই" চিকিৎসার বিষয়, যাহাকে লোকে "রোগ" বলে, তাহা "রোগ" নহে, "রোগে"র ফলমাত্র, এবং এই ফলস্বরূপ যে রোগ, তাহা চিকিৎসার বিষয় নহে। **প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসার বিষয়, পীড়িত দেহ বা যন্ত্রবিশেষ নহে—প্রকৃত চিকিৎসার বিষয়,—"রোগী"।** এই রোগীকে তাহার বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে সুশৃঙ্খল অবস্থায় আনাই চিকিৎসা, এবং আনিতে পারিলে উক্ত ফলস্বরূপ "রোগ", যাহাকে লোকে চিকিৎসার প্রকৃত বিষয় বলে, তাহা আপনিই সারিবে, পূর্ব্বকার সুশৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া জীবনীশক্তি প্রকৃত গঠন, সুগঠন ও ক্ষতিপূরণ কার্য্য নিয়মিতভাবে করিতে থাকিবে এবং রোগীও সুস্থ হইবে।

এক্ষণে "রোগী" কে? এ বিষয় একটু পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা কহিয়াছি যে, "মনুষ্য" নিজে রোগী, তাহার দেহ

বা যন্ত্রাদি কেহ পীড়িত নয়। মনুষ্যের কোন্ অংশকে তবে রোগী বলা হইতেছে? যদি তাহার দেহ ও যন্ত্রাদিকে পীড়িত বলিতে না পারা যায়, তবে তাহার কোন্ অংশ রোগী? "মনুষ্য" বলিলে আমরা কি বুঝিব? মনুষ্য বলিলে, আমরা তাঁহার দেহাদি বা ভিতরের যন্ত্রাদিকে বুঝি না—তাহার দেহ কেবলমাত্র তাহার আবাসস্থল বলিতে হইবে। দেহ যন্ত্রাদি তাহার অধিকারের জিনিষ,—আমরা বলিয়া থাকি, "আমার দেহ, আমার যকৃৎ, আমার হৃৎপিণ্ড," ইত্যাদি, অর্থাৎ আমি স্বতন্ত্র, এবং দেহাদি বা দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি আমার অধিকারস্থ দ্রব্য। আমরা যেমন "আমার বাড়ী, আমার বাগান", ইত্যাদি কহিয়া থাকি, সেইরূপ "আমার দেহ, আমার উদর, আমার প্লীহা", ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ করিয়া থাকি—অতএব এ সকল দ্রব্য হইতে "আমি" স্বতন্ত্র। আমি যখন কহি যে "আমি পীড়িত", তখন জানিতে হইবে যে, "আমি" নামক যে পদার্থ দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র, সেই পীড়িত। সেই "আমি"কেই আমরা "মনুষ্য" বলিয়া বুঝি। এমন অনেক সময় অনেক "পীড়িত" ব্যক্তি আপনার কাছে আসিয়া থাকে, যাহাকে আপনি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও তাহার দেহস্থ কোনও যন্ত্র বা ধাতু (রস, রক্ত ইত্যাদি) বা তাহার দেহের কোনও অংশে কোন পীড়া আছে বলিয়া আপনার মনে হইবে না, **অথচ সে ব্যক্তি পীড়িত**। এ কথার অর্থ কি? এ কথার অর্থ এই যে, তাহার পীড়া এখনও **বিকশিত অবস্থায়** আসে নাই, কোনও যন্ত্র বা দেহের কোনও অংশে এখনও **আশ্রয়স্থির** করে নাই, যদিএই অবস্থায় তাহাকে আরোগ্য করা না হয় তবে কিছুদিন পরে ঐ রোগের ফল বাহিরে বিকশিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহার কোনও সন্দেহ নাই যে, **এখনই সে ব্যক্তি পীড়িত**। তাহা না হইলে তাহার নিদ্রা হয় না কেন? আহারে বেশ ইচ্ছা নাই কেন? সমাজে সকলে সঙ্গে মিশিয়া বেশ আনন্দে দিনযাপন করিতে তাহার

হয় না কেন? সর্ব্বদাই তাহার মন "উড়ু উড়ু" করে কেন? সর্ব্বদাই তাহার মরিতে ইচ্ছা হয় কেন? আত্মীয় স্বজনের উপর তাহার মমতা বা স্বাভাবিক প্রীতি নাই কেন? লোকে কেহ তাহাকে ত বলে নাই যে, "তুমি পীড়িত হইয়াছ", তবে সে কেন আপনার নিকটে আসিয়া চিকিৎসা অন্বেষণ করে? এ সকল কথা উত্তমরূপে প্রণিধান করিলে জানা যায় যে, সেই ব্যক্তির **কেন্দ্রস্থলে** পীড়া আরম্ভ হইয়াছে, তবে এখনও তাহা জড়দেহে **বিকাশ** প্রাপ্ত হয় নাই। কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ তাহার ইচ্ছাশক্তি, বোধশক্তি, মনন, কল্পনা ইত্যাদিতে পীড়া আরম্ভ হইয়াছে, তবে এখনও সূক্ষ্মভাবেই আছে, **কেন্দ্রস্থই** আছে, এখনও পরিধিতে আসে নাই, এখনও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলদেহে বা স্থূলযন্ত্রাদি পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। রোগটী কেন্দ্র হইতে পরিধিতে আসিবে—**মন হইতে দেহে আসিবে, কেননা দেহ কেবলমাত্র অভ্যন্তরস্থিত সূক্ষ্ম মনের জড় প্রতিবিম্ব মাত্র।** মনে যাহা থাকে, তাহাই **জড় আকার** ধারণ করিয়া **দেহ বলিয়া বিকশিত** হয় মাত্র। আমাদের স্থূল ও জড়দেহ সূক্ষ্মভাবে প্রথমে মনেই থাকে, পরে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেহ, দেহস্থ যন্ত্র বা রসরক্তাদি ধাতুতে পরিণত হয়।

আমাদের মনের অবস্থা জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেহে পরিণত হয় বলিয়াই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি পরম প্রেমিক মহাত্মাদের দেহ এত সুন্দর ও কমনীয়, এবং যাহারা মনুষ্যবধ, ডাকাতি ইত্যাদি জঘন্য বৃত্তি সকল মনোমধ্যে পোষণ করে, তাহাদের দেহ বীভৎস ও কদর্য্য হইয়া থাকে। **যেহেতু, দেহ কেবলমাত্র মনের জড় প্রতিকৃতি মাত্র। রোগ ও প্রথমে কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ মনুষ্যের মনে, ইচ্ছায় আরম্ভ হইয়া বাহিরে অর্থাৎ দেহে বিকাশ পায়,** রোগ কখনই বাহির

হইতে ভিতরে যায় না, ভিতর হইতে বাহিরে আসে, এবং এইটিই তাহার স্বভাব। অতএব আরোগ্যও ভিতর হইতে বাহিরে, অর্থাৎ আরোগ্য ভিতরে আরম্ভ হইয়া বাহিরের দিকে আসিবে, ইহাই আরোগ্যের স্বভাব। চিকিৎকের কর্ত্তব্য,—এ সকল বিষয় প্রণিধানের সহিত হৃদয়ঙ্গম করা,—কেবল হৃদয়ঙ্গম করিলে হইবে না—তদনুসারে কার্য করিতে হইবে। আরোগ্য যখন ভিতর হইতে বাহিরে, (কেননা রোগ ভিতর হইতে বাহিরে) তখন "রোগী"কে অর্থাৎ মনুষ্যের কেন্দ্রস্থলকে অর্থাৎ মনুষ্যের মন ও ইচ্ছাকে আরোগ্য করাই একমাত্র কর্ত্তব্য, সেই আরোগ্যের স্রোত কেন্দ্রস্থল হইতে পরিধিতে প্রবাহিত হইয়া দেহকে ও দেহের যন্ত্র সকলকে আরাম করিবে। রোগের ফল নষ্ট করিলে রোগ সারিবে না, কার্য্য নষ্ট কারণের ধ্বংশ হয় না। যক্ষ্মারোগী আপনার কাছে আসিলে আপনি নানা অণুবীক্ষনাদি যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি কীটাণুকেই তাহার পীড়ার কারণ বলিয়া নিজেকে বড়ই পণ্ডিত বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু আপনার জানা উচিত যে, কীটাণুগুলি রোগের কারণ নয়, রোগের ফলে সেগুলি আসিয়াছে, তাহারা নিরপরাধি। সেই কীটাণুগুলি মঙ্গলময়ের দূত বা অনুচর। তাহারা কোন্ সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, সে বিষয়ে আপনার চিন্তা ও প্রণিধান আবশ্যক। একটী ফল যখন পচে, তখনই তাহাতে কীটাণু আদি আসিয়া সেই পচা অংশ খাইয়া ফেলে, কীটাণুগুলি আসে বলিয়া ফলটী পচে না, ফলটী পচিলে তবে তাহারা আসে। তাহা ছাড়া, তাহারা আসিয়া দূষিত দুর্গন্ধ অংশ ভক্ষণ করে, তেমনি যক্ষ্মার কীটাণুগুলি আমাদের শত্রু নয়, মঙ্গলময়ের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ফুসফুসের পচা দুর্গন্ধ অংশগুলি খাইয়া পরিষ্কার করে। যক্ষ্মার কারণ আরও দূরে, পশ্চাতে—বহু পশ্চাতে, অবস্থিত। আপনার অজ্ঞতা জন্য পশ্চাতে যাইবার শক্তি নাই, যাহাকে সম্মুখে

দেখেন, তাহাকেই কারণ ভাবেন ও তাহাকেই শত্রু মনে করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। যক্ষ্মা বা যে কোনও রোগের কারণ এত স্থূল নয় ও এত সহজপ্রাপ্য নয়—সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রণিধান এবং সাধনা আবশ্যক।

অতএব জানিতে হইবে যে, "রোগ" সর্ব্বাগ্রে মনকে দূষিত বা পীড়িত করে, পরে ক্রমে মন হইতে দেহ ও দেহযন্ত্রে আসে। আরোগ্যও অগ্রে মনে আরম্ভ হয়, পরে ভিতর হইতে বাহিরে গিয়া থাকে। এই কারণে মহাত্মা হ্যানিম্যান অনেকবার উপদেশ দিয়াছেন যে, রোগীর লক্ষণসমষ্টি দেখিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন কালে মনোলক্ষণগুলির উপর অধিক মনোযোগ দিতে হয়। আমরা "আমি" শব্দে এখন কেবল "মন"কেই নির্দ্দেশ করিলাম, কিন্তু "আমি" আরও ভিতরে, আরও সূক্ষ্ম এবং পূর্ণ, চৈতন্য—তবে বর্ত্তমান বিষয়ের জন্য ততদূর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মন ও মনোলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলেই হইবে।

এক্ষণে "রোগ" বা "রোগের" "ডায়াগনসিস্" সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আপনি হোমিওপ্যাথ—আপনার "রোগ," বা "রোগের নাম" কোনও কাজে আসিবেনা। আপনার কাজে আসিবে,—কেবলমাত্র "রোগী"। আপনার হাতে চারিটী রোগী অদ্য আসিল—একটী রক্তামাশয়, একটীর সামান্য জ্বর ও দাঁতের গোড়ায় যাতনা, একটীর অতিসার ও চতুর্থ টীর টাইফয়েড্ ফিভার বলিয়া ডাক্তারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি প্রত্যের মানসিক উদ্বেগ, অস্থিরতা, দারুণ পিপাসা কিন্তু সামান্য সামান্য জলপান করা, এবং প্রত্যেকেরই তাপে ইচ্ছা থাকে, তবে আর্সেনিক প্রত্যেকেরই ঔষধ হইবে। আবার মনে করুণ—চারিটী রোগীরই কলেরা হইয়াছে,—লক্ষণবিশেষে হয়ত একজনকে আর্সেনিক, দ্বিতীয়কে ভিরেট্রাম্, তৃতীয়কে ক্যাম্ফার, চতুর্থকে হয়ত একোনাইট লাগিবে। অতএব "রোগ" অনুসারে আপনার চিকিৎসা

নয়—"**রোগী" অনুসারেই চিকিৎসা।** "রোগীর" **ব্যক্তিগত লক্ষণের তারতম্যের উপর** আপনার ঔষধনির্ব্বাচন নির্ভর করিবে। "রোগের" নাম যাহাই হউক না কেন?—আপনার আবশ্যক নাই,—কেবল যে আবশ্যক নাই, তাহা নয়,—রোগের নাম অনেক সময় ক্ষতি করে, কেননা প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনে বাধা দিয়া থাকে, কাজেই রোগের নাম না জানাই ভাল। আপনার "**রোগীই**" সর্ব্বস্ব, তাহার ব্যক্তিগত লক্ষণ, তাহার অভিলাষ, তাহার দ্বেষ, তাহার লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধি, সময়ানুসারে তাহার মানসিক বা শারীরিক শান্তি ও অশান্তি, এই সকলই আপনার একান্ত প্রয়োজন; আমরা "রোগীর" চিকিৎসা করিয়া থাকি, আমরা "রোগের" চিকিৎসা করি না,—একথা সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য—পুস্তকের প্রতি পাতায় লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য; বাড়ীর দেওয়ালের উপর খোদিত করা কর্ত্তব্য।

আমরা বেশ দেখিতে পাই যে, ম্যালেরিয়া জ্বর যেখানে মড়কভাবে হইতেছে, সেখানেও এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের ঐ জ্বর কখনও হয় না। আবার এমন ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের জ্বর যেন কিছুতেই আরাম হইতে চায় না। আমরা বলি যে, ম্যালেরিয়া বড় খারাপ বাষ্প, বা ভয়ানক বিষাক্ত, ইত্যাদি—অর্থাৎ **বাহিরের জিনিসের** উপর দোষ দিয়া থাকি, কিন্তু সেই স্থানে এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা কখনও ঐ জ্বরে আক্রান্ত হন না, কেহ বা নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও পরিত্রাণ পান না,—এ বিষয় চিন্তা বা প্রণিধান করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না। কেবল যাহার জ্বর ক্রমাগত হইতে থাকে, ডাক্তার বাবু তাহাকে অবিরত কুইনাইনের মাত্রা বাড়াইয়া খাইতে দেন, শেষে যখন নানা যন্ত্রাদি পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া উঠে, তখন অনন্যোপায় হইয়া বলেন,—"এখন 'চেঞ্জে' যাও" অর্থাৎ বায়ু বা স্থান পরিবর্ত্তন কর, অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলা হয় যে, "আমার আর সাধ্য নাই, এক্ষণে, স্থানান্তরে গিয়া আমার দায়িত্ব হইতে

আমাকে নিষ্কৃতি দাও।" যদি চিন্তা করা যায়, তবে বেশ সুন্দররূপে আমাদের মনে প্রতিভাত হইবে যে, "ম্যালেরিয়া বা যে কোনও ব্যারাম উহাকে ছাড়িতে চায় না, একথা বলা ভুল, ঐ ব্যক্তিই ম্যালেরিয়াকে ছাড়িতে চায় না, বা পারে না।" অর্থাৎ "তাহার জীবনীশক্তির এ প্রকার ক্ষমতা নাই যে, তাহাকে সারাইয়া তুলিতে পারে," এ কথা বলাই সঙ্গত। একজনের জীবনীশক্তি এ প্রকার যে,—কোনও প্রকার পীড়া তাহাকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না, বা আক্রমণ করিলেও সে শীঘ্র সারিয়া উঠে, আর একজনের জীবনীশক্তি এ প্রকার যে, তাহাকে অতি সহজেই কোনও পীড়াতে আক্রমণ করে এবং একবার আক্রমণ করিলে, তাহার জীবনীশক্তি শীঘ্র তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। জীবনী-শক্তির ক্ষমতার এ তারতম্যের কারণ কি? তবে কি মঙ্গলময় ভগবান্ আপনাকে ও আমাকে বিভিন্ন ক্ষমতাযুক্ত জীবনীশক্তি দিয়া পাঠাইয়া-ছেন? না, তাহা নহে। ইহার কারণ,—আমরাই নিজেদের দোষে, আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষমতাকে নষ্ট করি—কিরূপে বা কি কর্ম্মদোষে, তাহা পরে বিবৃত হইবে। ফলতঃ এ সকল তারতম্যের একমাত্র হেতু আমাদের কর্ম্ম—ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

যদি এ কথা প্রকৃত হয় যে, আমাদের নিজ কর্ম্মদোষে জীবনীশক্তির পূর্ণ ক্ষমতাবিকাশে বাধা জন্মাইয়া নিজেরা নানা পীড়া, অসুবিধা, অস্বচ্ছন্দতা ভোগ করি এবং বহিঃপ্রকৃতির অধীন হই, তবে পীড়ায় চিকিৎসায় কি হইবে, আমাদেরই নিজের চিকিৎসাই কর্ত্তব্য। দোষ কোথায়? দোষ অগ্রে আমাদের মনে—পরে মন হইতে বাহিরে, তবে ঔষধ কোথায় দেওয়া উচিত? শাখাচ্ছেদ করিলে বৃক্ষ নষ্ট হয় না, মূলোচ্ছেদ না করিলে কিরূপে বৃক্ষনাশের আশা করা যাইবে? প্রত্যেকের মন ও কর্ম্মের প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে পীড়ারও তারতম্য হয়। ঔষধও তদনুসারে বিভিন্ন প্রকৃতির হওয়া চাই—এবং

ঔষধ শক্তির দ্বারা "রোগী"কে আরোগ্য করিলেই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য-সাধন হইল। আমরা এমনই স্থূলবুদ্ধি যে, "ষাঁড়ে ধান খায় ও তাঁতি বাঁধা যায়," আমরা নিজকর্ম্মদোষে বহিঃপ্রকৃতির অধীন হইয়া উঠিয়াছি, পূর্ব্বদিক হইতে সামান্য শীতল বায়ু লাগাইয়া হয়ত আমার সর্দ্দি কাসি হইল, অমনি বলিলাম—"পূর্ব্ব বায়ু বড় খারাপ, ইহাতে সর্দ্দি কাসি হইয়া থাকে।" কি ভ্রম, পূর্ব্ব বায়ুর অপরাধ কি? আমার নিজের দোষ, তাহা দেখি না। পূর্ব্ব বায়ূতে সকলের পীড়া হয় না কেন? যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ, তাহার পক্ষে শীত, বাত, ও আতপ সমান সুখপ্রদ। দুগ্ধের দোষ কি? আমি আমার অবস্থা এরূপ করিয়াছি যে, সামান্য দুগ্ধ সেবন করিলেই পেট ফাঁপে, অজীর্ণ হয়, পাতলা বাহ্যে হয়; আবার কেহ বা দুগ্ধ সেবন না করিলে আদৌ স্বচ্ছন্দ বোধ করে না, তাহার কোষ্ঠবদ্ধ হয়, কাজেই এই দুই প্রকার ব্যক্তিই পীড়িত। যে প্রকৃত সুস্থ, তাহার পক্ষে সকল দ্রব্যই সমান আনন্দপ্রদ, সকল দ্রব্যেই তাহার সমান প্রীতি। বালকে নিজের অসতর্কতার জন্য পড়িয়া যায় এবং যে স্থানটায় পড়িয়া যায়, মনে কর,—সেই স্থানটাই বড় দুষ্ট, সেই স্থানটাই তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে, কাজেই বালকটী উঠিয়াই ঐ স্থানটীকে পদাঘাত করিয়া থাকে—আমরাও তদ্রূপ। অগ্রেই আমার মনোদুষ্টি, তাহা হইতেই আমি আমার পূর্ণ স্বাধীনতা হারাইয়া নিজেকে বাহ্য প্রকৃতির অধীন করিয়াছি,—তবে "পূর্ব্ব বায়ূর" অপরাধ কি?

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি উপায়ে আমরা "আরোগ্য" করিতে পারি? কিরূপে জানা যাইবে যে, একটী রোগীর এই ঔষধটীর প্রয়োজন ও অন্য একটী রোগীর জন্য অন্য ঔষধের প্রয়োজন? কিরূপে, কি ধরিয়া আমরা প্রকৃতস্থানে আঘাত করিয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য করিব? তাহার উত্তর,—"রোগীর লক্ষণসমষ্টিই আপনার একমাত্র পরিচালক, ঐ লক্ষণসমষ্টিই,—প্রকৃত রোগ কি প্রকার বা কি প্রকার ভেষজ দ্রব্য প্রয়োজন,

তাহার সূচনা করিবে"। আপনি তদনুসারে নানা ঔষধের মধ্যে নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। "রোগের নাম" আপনাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, অনেক সময় কু-পথে, অ-পথে লইয়া যাইবে, কিন্তু লক্ষণসমষ্টিই আপনার একমাত্র সহায় হইয়া প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচনে সহায়তা করিবে এবং আরোগ্যপথে লইয়া যাইবে।

অতএব, আপনার প্রয়োজনীয়—(১) "রোগী"—রোগ নয়। (২) লক্ষণসমষ্টি—রোগের "নাম" নয়। এই "রোগীই" কেবলমাত্র তাহার লক্ষণ-সমষ্টি সাহায্যে আপনার চিকিৎসার বিষয়, একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বাভাস।

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরোগী ও দেহরোগী।

লোকে দেহের পীড়াকেই সাধারণতঃ পীড়া কহে এবং তাহারই চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক সমীপে উপস্থিত হয়। মনের সুস্থতা বা অসুস্থতা বড় একটা লক্ষ্য করে না, যখন মনের এরূপ পীড়া হয় যে, তাহার জন্য রোগীর দ্বারা আর সাংসারিক কার্য্য চলে না, অর্থাৎ যাহাকে লোকে মোটা কথায় উন্মাদ-রোগ বলে, তাহাই দেখা দেয়, তখনই কেবল তাহাকে আরাম করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করে। যদি সাংসারিক কার্য্যের কোনও অসুবিধা না হয়, অর্থাৎ হিসাব নিকাশ বা লোকজনের সহিত ব্যবহারের বিষয়ে কোনও বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তবে মনের যে অবস্থাই হউক না কেন, তাহা কেহই নজর রাখে না, বা চিকিৎসার প্রয়োজন বলিয়াই মনে করে না। একটু প্রণিধান করিয়া লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজনেরও বোধ হয় সুস্থ মন নাই। অথচ মনের রোগ আরোগ্য করিবার জন্য কাহারও বড় কিছু আগ্রহ দেখা যায় না। ইহা সমাজের বড় শোচনীয় অবস্থা।

শিক্ষক মহাশয়গণ বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন যে, তাঁহারা সহস্র চেষ্টা, যত্ন, উপদেশ এবং শাসনাদির সাহায্যেও কোনও কোনও ছাত্রের চরিত্র সংশোধন করিতে একেবারে অপারক হয়েন। একই শ্রেণীর ছাত্রগণ একই অধ্যাপকের নিকটে শিক্ষা করিবার সুবিধা লাভ করিয়াও প্রত্যেকে বিভিন্ন ভাবে বিদ্যা অর্জ্জন বা চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হয়। এমন কি, একই পিতামাতার সন্তানগণ বিভিন্ন পথ-গামী

হইতে দেখা যায়। যদি কেহ বার বার অন্যায় কার্য্য করে, লোকে তাহাকে দুষ্ট কহে। সকলেই বাল্যকাল হইতেই ১ম ভাগ, ২য় ভাগ পাঠ্য পুস্তকে এবং গুরুজনের উপদেশে পাইয়া থাকে,—"সদা সত্য কথা কহিবে," "অন্যের দ্রব্য না বলিয়া লইও না," "প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে," ইত্যাদি, কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তিতে ঐ সকল উপদেশ বিভিন্ন ভাবে ফল প্রদান করে। চোরকে "চুরি করিও না" বলিলেই কি সে চুরি ত্যাগ করিতে পারে? কখনই না। সে চুরি কেন করে? যেহেতু সে চুরি না করিয়া থাকিতে পারে না। সাধারণ কথায় লোকে বলিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অভ্যাসদোষে ইহা করিয়া থাকে। অভ্যাসদোষ বলিলে প্রকৃত কারণ বলা হইল না। একজনা এক প্রকার কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে তাহার অবশ্য অভ্যাস হইয়া যায়, সত্য কথা, কিন্তু একজনা এক প্রকার অভ্যাস করে, আর একজনা অন্য প্রকার অভ্যাস করে কেন? চোর বা মিথাবাদী চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা দোষ বা পাপজ্ঞানা সত্ত্বেও এবং বার বার তাহা হইতে বিরত হইবার চেষ্টা সত্ত্বেও চুরি না করিয়া, বা মিথ্যা কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না। এ সকলের প্রকৃত কারণ—**মন পীড়িত**। সুস্থ মনে চুরি করিবার প্রথম প্রবৃত্তিই আসিবে না, বার বার অভ্যাস করিবার কথা ত সুদূরপরাহত। সুস্থ মনে মিথ্যা কথা বলিবার ইচ্ছাই হইবে না। পিতামাতা বা শিক্ষকগণ বালকদিগকে শাসন অথবা উপদেশ দিয়াই যথেষ্ট প্রতিকার করা হইল বলিয়া মনে করেন, এমন কি, কোনও কোনও শিক্ষক ও পিতা প্রায়ই দারুণ প্রহার পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে ছাড়েন না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল প্রতিকারে প্রতিকার ত হয়ই না, বরং অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। আজকাল প্রায়ই স্কুলের ছাত্র অতি অল্প বয়স হইতেই ইন্দ্রিয়সেবী হইতে দেখা যায় এবং অবৈধ উপায়ে শরীরটী চিরজীবনের জন্য নষ্ট করিতে থাকে, ইহার কারণ, অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই অসুস্থ মন, তবে অতি অল্প সংখ্যক বালক, যাহারা কেবলমাত্র সঙ্গদোষে একার্য্যে ব্রতী হয়, তাহারা অতি শীঘ্রই বিরত হয়, সামান্য উপদেশ ইহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়, এমন কি, নিজেদের মনেই তাহাদের সমধিক গ্লানি উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে অতি শীঘ্রই সংশোধন করিয়া থাকে। আমরা অবশ্য এ সকল এতটা সূক্ষ্মভাবে দেখি না এবং চিন্তাও করি না। কিন্তু একথা অতিমাত্র সত্য যে, সুস্থ মনে কোনও অসৎ কার্য্য ও অসৎ চিন্তা আসিতে পারে না।

প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনও গৃহস্থে হয়ত অতিশয় দুঃখজনক ঘটনা, যেমন কাহারও অকালমৃত্যু বা গৃহদাহ অথবা ধনাপহরণ ঘটিয়াছে, ইহাতে গৃহস্থের মধ্যে সকলের পক্ষে সমান ক্ষতিজনক হইলেও কেহ বা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার কেহ বা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ঐ প্রকার উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহার মন অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ, নতুবা সে ব্যক্তি মনকে কখনই দমন করিতে পারিত না। দুর্ব্বল বা পীড়িত মনে সামান্য ঘটনাও বিশেষ ক্ষমতা বিস্তার করিয়া থাকে, কিন্তু সুস্থ মনে তাহা পারে না। আমরা নিত্যই দেখিয়া থাকি যে, সকলে সমান ক্রোধী নয়, কেহ হয়ত অতি সামান্য কারণে ভয়ানক অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠে, অন্যের হয়ত সহিষ্ণুতা অতীব প্রশংসনীয়। এই প্রকারের তারতম্য কেবল মাত্র মনের সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর নির্ভর করে। আমি জানি, কোনও একটী মধ্যবৃত্ত গৃহস্থের কর্ত্তা (একমাত্র উপার্জ্জনকারী নিজেই) অতি গোপনে স্ত্রীলোকদিগের কাপড় ছিঁড়িয়া দিতেন, এবং পরে স্ত্রীলোকদিগকে ভৎর্সনা করিতেন, অন্য পক্ষে তিনি সাধারণতঃ বেশ সুস্থই ছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার টাইফয়েড পীড়া হয়, এবং তাঁহার চিকিৎসার পর তিনি আমার নিকট ইহা স্বীকার করেন যে, কেবল স্ত্রীলোকদিগকে তিরস্কার করিবার সুযোগ খোঁজা

তাঁহার একটী বিশেষ রীতি ছিল, তবে এক্ষণে আর তাহা ছিল না। তাঁহাকে বোধ হয় টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসার ভিতর কোনও গভীর কার্য্যকরী ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল,—তাহারই ফলে তাঁহার ঐ প্রকৃতি গিয়াছিল। তিনি আমার নিকট অনেক ধন্যবাদ দেওয়ার পর ঐ কথা অতি সরল ভাবে কহিয়াছিলেন। ছোট ছোট ছেলেদের মেজাজ খারাপ হইলে, তাহারা তাহা চাপা দিয়া বাহিরে প্রফুল্লতার ভাণ করিতে জানেনা, কিন্তু বড় হইলে ভিতরের ভাব ভিতরে রাখিয়া, বাহিরে "ভাল মানুষটী" সাজিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা মানসিক সুস্থ, একথা বলা যায় না, এমন কি, চাপা দিয়া "ভাল মানুষ সাজিবার" প্রবৃত্তিটীও মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। এজন্যই মহাত্মা হ্যানিম্যান প্রকৃতই অনুভব করিয়া কহিয়াছেন যে, "মানব মাত্রেই আজকাল অভ্যন্তরে কুষ্ঠ রোগী"। অতি সত্য কথা।

সকলে না হইলেও অনেকেই জানেন যে, **যাবতীয় পীড়া,—মন হইতেই দেহে বিকাশ পায়। দেহটীকে মনই গঠন করে, এমন কি, দেহটী মনেরই স্থূল রূপ মাত্র।** মনটী যেমন, দেহটীও তেমনই হইবে। মনটী পীড়িত হইলে, দেহটী সুস্থ হইতে পারে না। দেহটীকে সুস্থ রাখিতে হইলে, আগে মনটীকে সুস্থ করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই, এজন্যই আমাদের ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ জীবনের সর্ব্ব প্রথম হইতেই গুরু-গৃহে বাস করিয়া সংযমাদি শিক্ষালাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং আমাদের দেশে যতদিন সেই ব্যবস্থা বলবতী ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সর্ব্বতোভাবে সুস্থ মনে, অতএব সুস্থদেহে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহারা আবার অন্য বর্ণাশ্রমীদিগের কল্যাণ করিয়া তাঁহাদিগকেও প্রকৃক পথে চালিত করিতেন। এখন "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই"! এখন মনের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, শরীরটায়ও

প্রকৃক সুস্থতা কিসে আসিবে,সে দিকেও দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি কেবল একবারে বাহিরে, কেবল বাহির সাফ্ চাই, কেবল"লেপাফা দুরস্ত" চাই। ভিতরে যাহাই থাক্ না কেন, বাহিরে চটক্ থাকিলেই হইল। ভিতরে যথেষ্ট গরল থাকা সত্ত্বেও, যদি দেখা হইবামাত্র সামান্য ভাবে মৃদু কপট হাস্যের সহিত একটু ঘাড় নাড়া দিতে পারা গেল, তবে যথেষ্ট সম্ভাষণ ও সদালাপ হইল, ইহাই এখনকার রীতি হইয়া উঠিয়াছে। ভিতর কেহ দেখে না, বাহির লইয়াই ব্যস্ত। ফলে, ভিতরটী অতি ভয়ানক নরক সদৃশ হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে, এবং সেই সকল নরক দেহে আসিলে আবার তাহা চাপা দিবার চিকিৎসা অবলম্বিত হওয়ায়, ক্রমাগত নূতন নূতন ব্যাধি, নূতন নূতন দুঃখের সৃষ্টি হইতেছে! তখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া ও ভগবান্‌কে দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়া উপায়ান্তর আর কি আছে?

যদি মনের সুস্থতার উপরেই শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে, যদি মনকে সুস্থ ও অরোগী করিতে পারাই প্রকৃত প্রয়োজনীয়, তবে কি প্রকারে তাহা করা যাইতে পারে? উপায় কি? কি উপায়ে মনকে নীরোগ করা যায়? অগ্রে দেখা প্রয়োজন যে, মনটী রোগী হয় কেন? মন কি জন্য রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে? যে কারণে আমাদের শরীরস্থ কোনও যন্ত্র বা অংশ রোগাক্রান্ত হয়, সেই কারণেই মনও (যাহা দেহেরই সূক্ষ্মাবস্থা মাত্র) রোগক্রান্ত হইয়া থাকে। **সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস দোষ হেতুই যাবতীয় রোগলক্ষণের উৎপত্তি। এই সকল দোষ মনোরোগেরও জনক বা কারণ।** এই সকল দোষের প্রথম উদ্ভব কি প্রকারে হইল, তাহা সম্প্রতি আলোচ্য নয়, এজন্য সে বিষয়ের অবতারণা করা হইল না। মনোদুষ্টির কারণ ও প্রতিকারই মুখ্যতঃ আলোচনা করা হইতেছে। সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্—এই তিনটী দোষের জন্য আমাদের শারীরিক ও মানসিক রোগ, সে বিষয়ে কোনও

সন্দেহ নাই। যে কোনও দোষ বা যে কোনও ঔষধ বা যাহা কিছু আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে, **সেই ক্রিয়ার প্রথম আঘাত, সর্ব্ব প্রথম ঝঙ্কার, বা সর্ব্বপ্রথম স্পর্শ,—মনে আরম্ভ হইয়া থাকে।** মনে করুণ, আমি যেন আপনাকে কোনও কারণে বা বিনাকারণে কতকগুলি তীব্র ভৎ‍র্সনা করিলাম। আমার ঐ ভৎ‍র্সনা সর্ব্বপ্রথমে কোথায় আঘাত করে? ভৎ‍র্সনা ও দুর্ব্বাক্য সকল **প্রথম আঘাত মনের উপর করে,** তাহার পর হয়ত শারীরিক লক্ষণসকল, যথা ক্রন্দন, হৃৎস্পন্দন, স্বেদ, এমনকি কম্প মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সেই প্রকার কোনও দোষ যখন ক্রিয়া করে, তখন তাহার **প্রাথমিক ক্রিয়া মনেই আরম্ভ হয়।** তবে একটী কথা আছে, যে দ্রব্য ক্রিয়া করিবে, **তাহা যদি স্থূল হয়, তাহা যদি সূক্ষ্ম না হয়,** তবে তাহার মনের উপর ক্রিয়া করিবার শক্তি থাকিতে পারে না। **মন যে স্তরের জিনিস, সেই স্তরের দ্রব্য হইলে তবেই মনে ক্রিয়া আগে দেখা যাইবে।** যে দ্রব্য স্থূল, **তাহা ত খাদ্যদ্রব্য।** কাজেই, স্থূলদ্রব্য শরীরে প্রবেশ করিবার যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই পথ দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে, এবং স্থূল হইতে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া **শেষে মনে** পৌঁছিবে। এখানে স্থূলের কথা হইতেছে না। দোষ সকল—অর্থাৎ সোরা, সাইকোসিস্, ও সিফিলিস—**ইহারা অতি সূক্ষ্ম, এ কারণে ইহারা সর্ব্বদাই মনের উপর ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয়।** কোনও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, দেখা যায় যে, যদি অতিশয় নিম্ন শক্তির হয়, তবে তাহা আমাদের মানসিক লক্ষণকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, কিন্তু যদি উচ্চ শক্তির হয়, তবে আগেই মনের উপর ক্রিয়া করে। ঔষধ সকলের প্রুভিং করিবার সময়েও, যথেষ্ট উচ্চ শক্তির

দ্বারা প্রুভিং না করিলে ঐ ঔষধের মানসিক লক্ষণসকল প্রকাশ পায় না। এজন্য যে সকল ঔষধ এখনও উচ্চ ও উচ্চতর শক্তিতে লইয়া গিয়া প্রুভিং হয় নাই, তাহাদের এখনও মানসিক লক্ষণসকল প্রস্ফুটিত হয় নাই। যাহা হউক, ইহা সিদ্ধ যে, দোষ সকল আদৌ মনের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, এ কারণে মনোদুষ্টিই দোষ সকলের প্রাথমিক ক্রিয়া—একথা স্থির। এই হইল, **প্রাথমিক মনোদুষ্টি বা মনোরোগ।** কিন্তু, আরও আছে, আরও গুরুতর প্রকারে মনোরোগের সৃষ্টি হয়। তাহা পরে কহিতেছি।

এখানে প্রসঙ্গ হিসাবে একটী কথা বলা আবশ্যক। এ জগতের সৃষ্টি-তত্ত্বের একটী সূক্ষ্ম মর্ম্ম আছে। কোন কিছুরই যেন আদি বা অন্ত বলিয়া ধরিবার উপায় নাই। সবই যেন "বীজাঙ্কুরবৎ"। অর্থাৎ বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ, কে কাহার কারণ, তাহা বলা যায় না। মেঘ হইতে বৃষ্টি, আবার বৃষ্টি হইতে মেঘ। মন পঙ্কিল হইলে দোষের সৃষ্টি হয়, আবার দোষই মনকে পঙ্কিল করে। এই মর্ম্মটী হৃদয়ঙ্গম করিলে অনেক কুতর্কের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই চক্রগতি চলিয়াছে ও চলিতে থাকে, এই রাত্রি দিন গতি যেন সৃষ্টির একটী প্রধান তত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। যাহা হউক, **যদি ঐ প্রাথমিক দুষ্টির পরেই তাহার প্রকৃত প্রতিকার হয়, তবে মনোরোগের এই খানেই নিবৃত্তি হয়।** কিন্তু হায়! তাহা হয় না। লোকটী বেশ ছিল, রেলওয়েতে কাজ করে, কোথায় কি কুক্ষণে দুষ্ট জাতীয় গনোরিয়া বিষ তাহার শরীরে প্রবেশ করিল; এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে **সন্দিগ্ধচিত্ত** করিল, পূর্ব্বে সে ব্যাক্তি বেশ সরল ও স্পষ্টবাদী ছিল, আজ-কাল তাহার **সকল বিষয় লুকাইবার** এবং **গোপনে কাজ করিবার, প্রবৃত্তি** আসিল। এ অবস্থার প্রতিকার কি প্রকারে হইয়া

থাকে, তাহা সকলই বোধ হয় জানেন। সে লোকটী কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিকটবর্ত্তী এলোপ্যাথিক ডাক্তারকে গিয়া কহিল,—"কি জানি কেন, আজ কয়েকদিন হইল, প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব করিতেছি, পেটের দায়ে রেলে চাকুরি করিতে আসিয়া, মহাশয়, কেবল ট্রেণে ট্রেণে ঘুরিতে ঘুরিতে শরীরটী গরম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আবার ত এই কাজ করিতেই হইতেছে ও হইবে, অতএব মহাশয় ২।১টী ইন্‌জেক্‌সন্ দিন না।" **এখানেও গোপন করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি থাকে।** যাহা হউক, ডাক্তার বাবু ত এইজন্য প্রস্তুতই আছেন, তিনি মনে মনে কিছু হাসিলেন ও বেশ একটু মোটা ফি লইয়া সপ্তাহে ২।৩টী করিয়া ইন্‌জেক্‌সনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি ভগবানের চক্ষে ধূলা দিতে যায়, সে নিজেই, তাহার ফলে, অন্ধ হয়—ইহাই নিয়ম। এই চাপা দিবার ফলে যে কত দুঃখ হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাহা হউক, প্রাথমিক মনোদুষ্টির প্রতিকার না হইয়া সর্ব্বস্থলে, অন্ততঃ অধিকাংশ স্থলে, এই প্রকারে চাপা দেওয়াটাই প্রকৃত চিকিৎসা বলিয়া চলিয়া থাকে।

চাপা দেওয়া চিকিৎসার ফলেই যত কিছু নূতন নূতন নামযুক্ত ব্যাধি। হায়! কে শোনে! লোকে আমাদিগকেই পাগল কহিবে। "পাঁচড়া চাপা দিলে কি আবার হাঁপানি হয় না কি? পাঁচড়া চাপা দেওয়া কি আবার? পাঁচড়া একটী চর্ম্মরোগ, কাজেই মলম লাগানই ত ঠিক, ইহাতে কি দোষ হইল? হাঁপানি ত বুকের রোগ, হাঁপানির সঙ্গে পাঁচড়ার কি সম্বন্ধ?" এই প্রকার কত কথাই লোকে বলে। কে স্থির হইয়া শোনে বা বুঝে? যাহাই হউক, নাই শুনুক, নাই বা বুঝুক, আমরা বুঝাইয়া চলিব। ফল এক সময় হইবেই— কেননা সত্য স্বয়ং প্রকাশ হইয়া থাকে।

উপরি লিখিত ঐ গনোরিয়ারোগীর যদি প্রকৃত চিকিৎসা হইত,

তবেই এইখানেই তাহার মনও নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইত, তাহা প্রায়ই হয় না। কি হয়? ইন্‌জেকসানাদির ফলে বাহিরের স্রাব প্রভৃতি লক্ষণগুলি কিছুদিনের জন্য অন্তর্হিত হয় এবং রোগশক্তি অন্তর্ম্মুখ হইয়া ভিতরের যন্ত্রগুলির উপর তাহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়, ক্রমে ক্রমে রোগীর স্মৃতিশক্তি প্রায় লোপ হয়, মেজাজ ভয়ানক খিট্‌খিটে হইয়া উঠে, অন্যান্য রোগ সকল, যাহা যাহা ঐরূপ চিকিৎসার ফলে শুভাগমন করিয়া থাকে, যথা বাতরোগ; সর্দ্দি, বহুমূত্র ইত্যাদি, তাহা উল্লেখ করা অসম্ভব। **জীবনীশক্তির নির্ম্মল স্রোতটি এখন পঙ্কিল হইল,** তাহার ফলে নানা বিকার হইবে, ইহাতে আশ্চার্য্য কি?

অতিমাত্র ক্ষুদ্র বর্ণনা এখানে লিখিত হইল, উদ্দেশ্য কেবল একটী উদাহরণ দেওয়া। **সর্ব্বাদৌ দোষ সকলের প্রাথমিক ক্রিয়ার ফলে, একপ্রকার মনোদুষ্টি ঘটে, তাহার পর "চাপা" চিকিৎসার ফলে, বিলম্বিত হইলেও স্বাভাবিক স্রোতের প্রতিকুলাচরণ জন্য, দ্বিতীয়বার মনোদুষ্টি ঘটে,** আবার তাহার উপর যদি পূর্ব্ব হইতেই সিফিলিস দোষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহার সহিতও, এবং তাহা না থাকিলেও, সোরার **সহিত মিলিত হইয়া রোগ সকলের জটিলতা ও দুরারোগ্যতা আবির্ভূত হয়।** যদি সিফিলিসও তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে (সোরা ত থাকিবেই, কেননা সোরা না থাকিলে গনোরিয়া আসিতেই পারে না), তবে ত ত্র্যহস্পর্শ হইল, তাহার অবস্থা যে অতিশয় শোচনীয়, তাহা আর বলিতে হইবে কেন? এই রোগজটীলতার সঙ্গে সঙ্গে মনেরও অতি শোচনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। যদিও সাধারণ কথায় যাহাকে "পাগল" বলে, সেই পাগল না হওয়া পর্য্যন্ত মনোরোগের

জন্য কেহ চিকিৎসকের নিকট যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ লোকের **মন সুস্থ**, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না।

যদি মনস্তত্ত্বটি প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা হয়, এবং কেবল নিজের নিজের হস্তে যে সকল প্রাচীন পীড়ার রোগী আছে, তাহাদের মনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, তবেই বেশ বুঝা যায় যে, সংসারটী একটী "পাগলা গারদ"। কোনও রোগী, অর্থাৎ প্রাচীন পীড়ার রোগী, যদি তাহার মানসিক চঞ্চলতা প্রদর্শন করে, আমাদিগকে গাল দেয়, অথবা এরূপ ব্যবহার করে যে, তাহার চিত্তদোষ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাতে আমরা দুঃখিত হই না। কেননা সে ব্যক্তি রোগী এবং তাহাকে আরোগ্য করার ভার আমার উপর আছে, ও যথা সময়ে আরোগ্য হইবে। কিন্তু যখন সাধারণতঃ লোকে যাঁহাদিগকে সুস্থ বলে, যাঁহাদের হাতে দেশের নেতৃত্বের ভার, যাঁহারা বিচারক, যাঁহারা শাসক, যাঁহারা রাজা, লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, এই প্রকার দায়িত্বযুক্ত ব্যক্তিদিগের পীড়িত মন লক্ষ্য করি, এবং দেখিতে পাই যে, পীড়িত মনে, দুষ্ট মনের দ্বারাই ঐ সকল ব্যক্তি অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতেছেন, তখন মনে হয় এ সংসারে সবই গোলমাল, কোনও কিছুই খাঁটী নাই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অশুদ্ধ মনের প্রেরণায় কার্য্য করিতেছে, অতএব ফল অশুদ্ধই হইবে। যিনি বিচারক, তাঁহাকে আইন অনুসারে বেদান্তের নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ন্যায় অচল, অটল, কূটস্থ হওয়া চাই, প্রত্যেক ঘটনাটী প্রত্যেক সাক্ষ্যটী তুলাদণ্ডে যেন ওজন করিয়া তাঁহাকে বিচার করিতে হয়, কিন্তু কোথায় সেরূপ বিচারপতি পাইবেন? অশুদ্ধ মনে নিরপেক্ষতা আসিতে পারে না। শুদ্ধ মন ব্যতীত শুদ্ধ প্রেরণা, শুদ্ধ চিন্তা, পবিত্র হিতৈষণা আসিতে পারে না। যে ব্যক্তি মানসিক সুস্থ, সে ব্যক্তির অন্নে অধিক রুচি হইবে কেন? যে ব্যক্তির মন নীরোগ, তাহার মনে অন্যের ক্ষতি করিয়াও নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি আসিবে কেন?

নীরোগ মনে নিজের স্বাধীনতার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। নীরোগ ও সুস্থ মনকে কি কেহ অধীন করিতে পারে? যদিও প্রকৃত সুস্থ মন পাওয়া এ জগতে অবশ্য অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়, তবুও যতটা সম্ভব হইতে পারে, ততটাই পাওয়া ও পাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রকৃত চিকিৎসক, তিনি সুস্থ মনের চিকিৎসার দ্বারা নিজেকে ও রোগীকে মানবজীবনের উচ্চতম আদর্শের পথে পরিচালিত করিয়া থাকেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, চাপা দেওয়া চিকিৎসার ফলে যখন মন পর্য্যন্ত পীড়িত হইল, তখন আবার ঐ পীড়িত মন নূতন নূতন ব্যাধির কারণ হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। মানবের জীবনীশক্তির প্রকৃতিই এই যে, সে সকল দোষকে ভিতর হইতে বাহিরে প্রবাহিত করিয়া অন্তরকে নির্ম্মল করিবার চেষ্টা করে, এবং ঐ প্রবাহের জন্য কতকগুলি মানসিক পীড়া যেন আকার ধারণ করিয়া বাহিরে বিকাশ পাইবার চেষ্টা করে। জীবনীশক্তির ঐ প্রকৃতি অতিশয় মঙ্গলময়ী, জীবনীশক্তি প্রতিনিয়তই ভিতরের ময়লা বাহিরে নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু এমনই চিকিৎসার ব্যবস্থা যে—যেমনই বাহিরে কিছু আসিল, অমনই গৃহস্থ ব্যাকুল হইয়া চিকিৎসককে আনাইল, এবং চিকিৎসকও যাহাতে আবার চাপা দেওয়া হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ফলে,—আবার তাহা ভিতরের দিকে গতি পাইয়া অন্তরস্থ যন্ত্রাদিকে পীড়িত করিতে থাকিল। এমনই চিকিৎসা যে, কোনও প্রকারেই মানুষের নিস্তার নাই। কাজেই অন্তর্ম্মুখ দোষগুলি রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় ভিতরেই সদাসর্ব্বদা অনিষ্ট করিতে থাকিল। অশিক্ষিত গৃহস্থ ও উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসক বাহিরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

হইলেই আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া নিজ নিজ মনে শান্তনা আনিলেন, এই প্রকারই চিকিৎসা বা প্রতিকার চলিতেছে ও চলিবে। সরকার বাহাদুর বলিতেছেন, এই প্রথাই ঠিক, তখন আর আমাদের এ সকল কথা বাতুলতা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

এক্ষণে অবস্থা ত এই, তবে **প্রকৃত প্রতিকার কি ?** প্রকৃত প্রতিকার অবশ্য আছে, তবে লোকে তাহা শোনে কই ? শুমুক আর নাই শুমুক, প্রকৃত প্রতিকার যাহাতে হয়, তাহা আমাদিগকে লোকের মনে প্রথিত করিতে হইবে, এবং যেখানে সুযোগ পাইব, সেখানেই কার্য্যতঃ ক'রয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সোরাশূন্য ব্যক্তি আজকাল দেখা যায় না। প্রত্যেকেই প্রায় সোরাদোষে দূষিত। কিন্তু অন্য দুইটী বিষ, যথা সাইকোসিস অর্থাৎ গনোরিয়াজনিত, এবং সিফিলিস অর্থাৎ উপদংশজনিত, দোষ সকল, এখনও তত বিস্তৃত হয় নাই। এজন্য ইহাদের **নূতন আক্রমণ হইবামাত্রই** কোনও উপযুক্ত হোমিওপ্যাথের আশ্রয় গ্রহণ করা একমাত্র কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, সেই অবস্থাতেই ঐ রোগ দুইটী নির্ম্মূল আরোগ্য হইয়া যায়, এবং সাইকোসিস ও সিফিলিস নামের দোষ দুইটী মানবশরীরে চির আবাসস্থল পাতিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিবার অবসর পায় না। লোকের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা আছে, এবং এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসক ; ভ্রান্ত ধারণা এই যে, কুস্থান গমনের পরে পরেই এটা ওটা করিলে ঐ বিষ অর্থাৎ গনোরিয়া ও সিফিলিসের আক্রমণের আর ভয় থাকে না। **এ ধারণা সর্ব্বনাশের হেতু।** প্রথমতঃ, অন্যায় ও পাপ কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, দ্বিতীয়ঃ, উহা কখনই সম্ভব নয়। কুক্রিয়া করিবামাত্রই ঐ ঐ বিষ সংক্রমণ হইয়া যায়, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই ফল দেখা দিয়া থাকে। যাহা হউক, মানব মাত্রেই

পাপ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ পাপ কার্য্য হইতে বিরত হওয়া ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। কিন্তু যদিই পদস্খলন হইয়া গিয়াছে, তবে আর মিথ্যা ভয় বা লোকলজ্জা জন্য নিজের পাপের বোঝা আরও অধিকতর ভারি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ **উপযুক্ত হোমিওপ্যাথের নিকট আসা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নাই।** তিনি তখনই এরূপভাবে চিকিৎসা করিবেন যে, উক্ত দুইটী দোষের কোনটীই আর স্থায়ীভাবে শরীরের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এবং ঐ **অবস্থাতেই নির্ম্মল আরোগ্য হইবে।** আমরা ঐ অবস্থার রাশি রাশি রোগী আরাম করিয়াছি। যিনি এই সময় পেটেণ্ট ঔষধ বা এলোপ্যাথিক ঔষধ অথবা ইঞ্জেক্সন লইবেন, তিনি আপনার মরণের পথ আপনি পরিষ্কার করিবেন। **হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য কোনও চিকিৎসাতে এই রোগ দুইটীর প্রকৃত আরোগ্যকারী ঔষধ নাই, একথা স্থির জানিতে হইবে।**

যাঁহাদের ঐ প্রথম আক্রমণের সময় অন্য মতের চিকিৎসা অবলম্বনে রোগ দুইটী চাপা পড়িয়াছে, তাঁহারাও যদি অল্প দিনের মধ্যে অথবা নিতান্ত পক্ষে নিজ নিজ ধর্ম্মপত্নীর নিকট গমনের পূর্ব্বে প্রকৃত হোমিও-প্যাথের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে তখনও তত কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়ায় অনেক সুবিধার আশা থাকে, কিন্তু অধিকদিন গত হইলে ক্রমেই অবস্থা খারাপ হইতে থাকিবে। আবার নিজ নিজ ধর্ম্মপত্নীতে উপগত হইলে নিরপরাধিনী পত্নীগণও ঐ ঐ দোষে দূষিত হইয়া থাকেন। ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা! কিন্তু ইহা নিত্যই হইতেছে। অন্য চিকিৎসায় কখনও আরোগ্য হয় না, অথচ আরোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া উপগত হইলে, **স্বামীর রোগ যে অবস্থায় রহিয়াছে, ঠিক সেই অবস্থাই স্ত্রীতে সংক্রমণ করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।** অনেক সময় দেখা যায়, যে বালিকা অতি নীরোগ কিন্তু বিবাহের পর, অর্থাৎ

প্রথম গর্ভের পর প্রসবের সময় স্বামী দেহের বিষ তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয়, হয়ত, স্ত্রীলোকটী ঐ সময় প্রাণত্যাগ করেন। যেখানে কোন এক ব্যক্তির বার বার সন্তানসন্ততি হয় ও মারা যায়, সেখানে নিশ্চয়ই, অতি নিশ্চয়ই, ঐ ঐ দোষ আছে। যেখানে কোন একটী লোকের বার বার বিহাহ ও প্রতিবারেই প্রসবের পর স্ত্রীর মৃত্যু, সেখানে নিশ্চয়ই ঐ ঐ বিষ বর্ত্তমান, ইহার কোনও সন্দেহ নাই। যেখানে স্ত্রী বন্ধ্যা, যেখানে স্ত্রী একবৎসা, যেখানে স্ত্রী মৃতবৎসা, যেখানে স্ত্রী প্রসবান্তে উন্মাদিনী, সেখানেই ঐ ঐ দোষের কার্য্য, ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। অতি সামান্য পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থরূপ কদর্য্য সুখের জন্য, তাহার উপর এলোপ্যাথির কুচিকিৎসা জন্য, দেশে যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা মনে করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিসের দ্বারা সংক্রামিত দেহ হইতে ঐ ঐ বিষের, প্রকৃত চিকিৎসার দ্বারা, নিরাকরণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবে যে যে বিষ নিজের জীবনে অর্জ্জিত, সেগুলি হোমিওপ্যাথী সুচিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে, **তাহাদের প্রথম মূর্ত্তি প্রকাশ পাইবে ও তাহার পর আরোগ্য হইবে**, তাহা না হইলে জানিতে হইবে যে ঠিক চিকিৎসা হয় নাই। আর যদি ঐ ঐ দোষ নিজ জীবনে অর্জ্জিত না হইয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, **তবে তাহাদের প্রাথমিক মূর্ত্তি দেখা দেয় না; কিন্তু এমন নিদর্শন পাওয়া যায়**, যাহাতে প্রকৃত আরোগ্যের **সূচনা** দিয়া থাকে। তবে দোষ সকল যত অধিক দিন শরীরে থাকিবে, ততই অনিষ্টের মাত্রা ও মনোদোষের জটীলতা আনয়ন করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক সময় যে সকল ব্যক্তি নিজেদের জীবনে সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষ অর্জ্জন করে নাই, তাহারা নিজদিগকে সুস্থই মনে করিয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রই তাহা ভ্রান্তি মাত্র। প্রায় প্রত্যেক

ব্যক্তিরই, ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি লাগে, সময়ে সময়ে বাতের বেদনা হয়, মধ্যে মধ্যে ফোড়া হয়, ঘামে দুর্গন্ধ হয়, সর্ব্বাঙ্গ অপেক্ষা মাথায় অধিক ঘাম হয়, বগলের ঘামে জামা হাজিয়া যায়, মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়া হয়, বিনা কারণে মনটী উদাস হইয়া উঠে। ঝড়বৃষ্টির সময় বা মেঘাগমে শরীরের ও মনের নানা অস্বচ্ছন্দতা ও পরিবর্ত্তন ঘটে, মলত্যাগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কম, মলত্যাগের সময় গুহ্য দ্বারে মল লাগে, (অবশ্য হয়ত অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু সুস্থদেহের নিয়ম এই যে, মলত্যাগের সময় মল কোনও স্থানে লাগিবে না ও জলশৌচেরও প্রয়োজন হইবে না। অন্যান্য জীবের জলশৌচের আবশ্যক হয় না, কেবল মাত্র পীড়িত হইলেই মনুষ্যের ও অন্যান্য জীবের মল গুহ্যদ্বারে লাগে ও জলশৌচের প্রয়োজন হয়)। সহজেই ক্রোধ আসে, অন্যের প্রাপ্তিতে মনে হিংসা আসে, কামক্রোধাদি রিপুদিগের ছন্দোহীন উত্তেজনা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদিতে সে ব্যক্তি নিজেকে অসুস্থ বলিয়া মনে করে না, তাহার ধারণা—“ইহা সকলেরই হইয়া থাকে”। ফলতঃ তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক ধারণা। যে ব্যক্তি নিজে নিজে পাপের ফলে ঐ সকল দোষ অর্জ্জন করিয়াছে, অথবা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে,—যে কোনও উপায়েই হউক, যদি দোষ সকল একবার দেহে সংক্রমিত হইতে পারিয়াছে, তখন **উচ্চশক্তি হোমিওপ্যাথি ঔষধের সদৃশ বিধানে নির্ব্বাচন ব্যতীত, মানবের দ্বারা কোনও চেষ্টাই কোনও কাজের হয় না।** আমাদের কবিরাজী চিকিৎসার অভ্যুদয়কালে যদিও তখন দূষিত গনোরিয়া ও সিফিলিস বিষ ছিল না, কেবলমাত্র সোরা দোষই তখন একমাত্র দোষ ছিল, তবুও আর্য্য ঋষিরা সে সময়ে রোগীকে রোগীহিসাবে নির্ম্মল আরোগ্য করিবার জন্য অর্থাৎ সোরাদোষকে নির্ম্মূল করিবার জন্য “কুটী প্রবেশ পূর্ব্বক রসায়ন চিকিৎসার” ব্যবস্থা করিতেন। সেই চিকিৎসার দ্বারা মানবকুল নির্ম্মল দেহ ও মন প্রাপ্ত হইয়া জীবনের প্রকৃত

উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইত। রসায়ন কি? "যজ্জরা-ব্যাধি-বিধ্বংসি-ভেষজং তদ্রসায়নম্"। অর্থাৎ যাহা উপস্থিত ব্যাধিকে এবং পূর্ব্ব ব্যাধিজনিত জরাকে বিশেষরূপে অর্থাৎ আত্যন্তিকরূপে ধ্বংস করিতে সমর্থ, তাহাই রসায়ন। এখনকার কবিরাজেরা ঐ চিকিৎসা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, কেন না এখনকার কবিরাজী কেবল "ভোলফিরান এলোপ্যাথিক ডাক্তারী"।

বাস্তবিকই, আজকাল যেরূপ কবিরাজী শিক্ষা-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাকে আর কবিরাজী বলা চলে না, ছদ্মবেশী ডাক্তারী শিক্ষাই হইতেছে। "আতপ চাউলের মদ" খাইলে যেমন মদটা খাওয়াও হয়, অথচ আতপ চাউল বলিয়া সংযমটাও বজায় থাকে, ঠিক তাহাই হইয়াছে। ভারতের দুরদৃষ্ট! যাক্ সে কথা। ফলতঃ যদি কেবল সোরাদোষের নিরাকরণ জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া কুটীপ্রবেশপূর্ব্বক রসায়ন চিকিৎসার প্রয়োজন হইত, তবে আজকাল ত্রিমূর্ত্তির সংহার কল্পে কি প্রকার বিরাট আয়োজন করা আবশ্যক, তাহা অনুমান করা কর্ত্তব্য। আরও বলি, সদর্পে বলি যে, আরও কিছুদিন গত হইলে—এই যে হোমিওপ্যাথীর এণ্টিসোরিক, এণ্টিসাইকোটিক, এবং এণ্টিসিফিলিটিক চিকিৎসা, যাহা মানবের এতই কল্যাণকর, যাহাতে মানবের শরীর ও মন অতিমাত্র বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং যাহা লোকের মনে গ্রথিত করিবার জন্য আমরা এত তারস্বরে চীৎকার করিতেছি, তাহাও আর থাকিবে না। হোমিও-প্যাথিতেও যে ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে কিছুদিন পরেই, আমাদের ন্যায় ৩,৪টী পাগলের তিরোধান হইলেই দেখিবেন যে, হোমিও-প্যাথীও একটী ইন্‌জেকসন্‌প্যাথী রূপ গ্রহণ করিয়া এলোপ্যাথীরই "বৈমাত্রেয় ভাই" হইয়া দাঁড়াইবে, আর দেরী নাই। এত পরিশ্রমে, অল্প অর্থ প্রতিদানে সন্তুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ সকল চিকিৎসা করিবার মত চিকিৎসক ক্রমে অতি অল্পই হইতেছে, এবং সামান্য দিন পরে

আর থাকিবে না। লোকে সত্য চায় না, সত্যের কদর জানে না, প্রকৃত চিকিৎসককে উৎসাহ দেয় না, কাজেই প্রকৃত চিকিৎসকের পোষায় না, কি করিবেন তাঁহারা ? একটী অপদার্থ ইন্‌জেসনের মূল্য ১৮৷২০৷২৫৲ টাকা অবলীলাক্রমে লোকে দিয়া থাকে,—কিন্তু একটী ১৫৷২০ বৎসরের জটীল রোগের প্রথম প্রেস্‌কিপশনের জন্য রেকড আদি করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য ১৬৲ টাকা, বা ৮৲ ফি দিতেও লোকে কাতর। হয়ত বলিবে, "অবস্থা হীন", নয়ত বলিবে, "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার এত খরচ, তাহা হইলে লোকে আর আপনার হোমিওপ্যাথী কিরূপে ব্যবহার করিবে ?" ঠিক যেন, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করাইয়া ডাক্তারকে কত না জানি অনুগ্রহই কবিতেছেন,—এই প্রকার অবস্থা। আমরা সত্য ও ভবিষ্যৎ দেখি না। কেবল "ভড়ং" বা বাহ্যাড়ম্বর এবং বর্ত্তমানটাই দেখি।

প্রতিকারের কতকটা আভাস মাত্র লিখিত হইল। যদি এই প্রতিকার অবলম্বন না করেন, আপনার শরীর ও মন চিরতরে নষ্ট হইবে, নূতন নূতন ব্যাধি সকলের আবির্ভাব হইবে, নিজেরা এবং সন্তান সন্ততি পীড়িত ও অল্পায়ু হইবেন ও হইবে। অদৃষ্টের ও ভগবানের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি ? যদি নিজের, আপনার পুত্রকন্যার এবং সমাজের প্রকৃত কল্যাণ চান, তবে এই কয়টী উপদেশ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিবেন :—

১। সর্ব্বপ্রধান—**সংযম, শুদ্ধমন ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা।**

২। যদি পূর্ব্বকর্ম্ম জনিত মনোদোষে পাপ করিয়া থাকেন ও সাইকোসিস এবং সিফিলিস নিজে নিজে অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে **একেবারে প্রকৃত হোমিওপ্যাথের** আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য।

৩। যদি বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, অথবা নিজের অর্জ্জিত কোনও বিষ

না থাকিলেও পূর্ব্ব পুরুষদিগের নিকট হইতে ঐ ঐ দোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য এবং শরীর ও মন নির্ম্মল করিবার জন্য, প্রকৃত হোমিওপ্যাথের আশ্রয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৪। বিলম্ব ও দ্বিধা করিলে ক্রমেই জটিল হইতে জটিলতর অবস্থা হইতেছে ও হইবে।

৫। যদিও নিজে কোন দোষ অর্জ্জন করেন নাই, এবং নিশ্চয়ই জানেন যে পূর্ব্ব পুরুষ হইতেও কোনও দোষ প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু যদি "টীকা" লইয়া থাকেন, তবে জানিতে হইবে, যে আপনার শরীরে কোনও বিষ প্রবেশ করিতে বাকী নাই। নিজের শরীরে অস্বচ্ছন্দ ভাবের প্রকাশ হইতে অথবা মানসিক অবস্থা হইতে আপনি অবশ্যই তাহা অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

এ পর্য্যন্ত এই সকল "পূর্ব্বাভাস" বর্ণনা করিয়া এক্ষণে মূল বিষয় আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা।

১ম ভাগ—পীড়ার নাম, রূপ, এবং কারণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নূতন ও পুরাতন পীড়া।

প্রাচীন পীড়া কাহাকে বলে, তাহা অতি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন পীড়া বলিলে সাধারণতঃ লোকে "পুরাতন রোগ,"—যে রোগে কোনও রোগী অনেক দিন হইতে ভুগিতেছে, তাহাই বুঝে। "প্রাচীন" বলিলেই লোকে মনে করে, অনেক দিন ধরিয়া রোগ ভোগ করিলে, সেই রোগ "প্রাচীন" বা পুরাতন, বা অল্পদিন হইতে কোনও রোগ হইলে, তাহা "নূতন"। সাধারণ লোকে এবং হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য মতের চিকিৎসকগণ, রোগ যতদিন হইতে হইয়াছে সেই **সময়ের তারতম্য অনুসারে বা দিনের সংখ্যানুসারে** রোগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। যথা - ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোনও রোগকে "নূতন", ছয় সপ্তাহের অধিক হইলে তাহাকে "স্বল্প-পুরাতন", এবং দুই, চারি বা ছয়মাস ধরিয়া ভোগ হইতে থাকিলে, তাহাকে "পুরাতন" নাম দিয়া থাকেন। এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিবার অন্য কোনও কারণ নাই, কেবলমাত্র ভোগ হিসাবে **সময়ের কমবেশীই** একমাত্র কারণ।

এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য যে, আমরা অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ, নূতন রোগ, ও পুরাতন রোগ কাহাকে বলি, এবং **কি হিসাবে**

বলি। আমরা সময়ের তারতম্যানুসারে ঐ প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকি, কি অন্য হিসাবে করি, তাহা জানা প্রয়োজন।

আমরা নূতন বা পুরাতন রোগ বলিয়া যে বিভাগ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে **রোগের ভোগকালের কোনও সম্বন্ধ নাই**। আমরা সময় বা দিনের সংখ্যা হিসাবে ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ করি না। আমরা বলি না যে, "এতদিন" গত হইলে এই রোগটী "পুরাতন" শ্রেণীতে পড়িবে, এবং "এতদিন" পর্য্যন্ত ইহা "নূতন" রোগ। আমাদের মতে যেটী পুরাতন পীড়া, সেটী **প্রথম দিন হইতেই পুরাতন**, এবং যেটী নূতন পীড়া, সেটীও ছয় বা আট সপ্তাহ ভোগ হইলেও,—নূতন। তবে আমরা **কি হিসাবে** শ্রেণী বিভাগ করি—কি হিসাবে আমরা কোনও রোগকে **নূতন** এবং কি হিসাবে কোনও রোগকে **পুরাতন** বলি?

আমাদের হিসাব বিশদ ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব, ও দেখিতে হইবে, **নূতন** পীড়া কাহাকে বলিয়া থাকি। যে রোগ আসিয়া শরীরে কিছুদিন ভোগ হইয়া **আপনিই** অবসান প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই আমরা নূতন রোগ বলি। যদি ঐ রোগের শক্তি অতিমাত্র প্রবল হয়, তাহা হইলে, অবশ্য রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ রোগের এরূপ **প্রকৃতি** নয় যে, তাহা শরীরে **ক্রমাগতই** ভোগ হইতে থাকিবে। প্রত্যেক নূতন পীড়ার একটা সময় আছে, এবং সে সময় ধরিয়া তাহার ভোগ হয়, এবং তাহার পর অবসান হয়,—তাহার প্রকৃতিই **সসীম**। তাহার প্রকৃতিই এই প্রকার যে, ঐ প্রকার ভোগকালের পর তাহার আপনিই শান্তি হয়। **পুরাতন পীড়ার প্রকৃতি তাহা নয়।** তাহার আপনিই আরোগ্য হইবার প্রবণতা নাই, তাহার প্রকৃতিই এই যে, **মনুষ্যশরীরে চিরকাল ধরিয়া নানা মূর্ত্তিতে ভোগ হইতে থাকিবে**। মনে করুন, কাহারও বসন্ত হইয়াছে—বসন্ত রোগটী আরম্ভ অবস্থায় কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিয়া

দেখা দিল ও ১৪।১৫ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইল। প্রায়ই ১০।১২।১৬ দিন পর্য্যন্ত ভোগ হইল—তাহার পর আরোগ্য হয়,—**আরোগ্য হওয়াই এই রোগের স্বভাব**। তবে বসন্ত অতি ভয়ঙ্কর লক্ষণাদিযুক্ত হইয়া উপস্থিত হইলে, রোগীর জীবননাশ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বসন্ত রোগের এরূপ প্রকৃতি নহে যে, চিরদিন ধরিয়া শরীরে নানা মূর্ত্তিতে, নানা নামে, চলিতে থাকিবে। এই রোগের দুই এক সপ্তাহ ভোগকালের পর **অবসান** আছে, কোন পুরাতন পীড়ার সে প্রকৃতি নহে। আপনিই আরোগ্য হওয়া তাহার প্রকৃতিই নয়। যেটী নূতন শ্রেণীর পীড়া, তাহা **প্রথম** হইতেই নূতন, আর যেটী পুরাতন পীড়া, সেটীও **প্রথম** দিন হইতেই পুরাতন। একথা বলা অসঙ্গত যে, অমুক রোগীর একটী যে রোগ হইয়াছে, তাহা যদি এতদিনের মধ্যে সারে, তবে তাহাকে নূতন পীড়া বলা যাইবে, আর যদি ততদিনের অধিক কাল ভোগ হয়, তবে সেটীকে পুরাতন পীড়া বলা যাইবে। কেন না, রোগের **ভোগ কালের তারতম্য** দেখিয়া তদনুসারে আমরা নূতন বা পুরাতন শ্রেণীতে বিভাগ করি না। আমাদের এ বিভাগের হেতু,—ভোগকালের তারতম্য আদৌ নয়—আমাদের এ বিভাগের হেতুই হইল,—রোগের **প্রকৃতি**। রোগের **প্রকৃতি** দেখিয়া, যে রোগের কোনও নির্দ্দিষ্ট ভোগ কালের পর আপনিই সারিয়া যাইবার প্রবণতা বা প্রকৃতি লক্ষিত হয়, তাহাকে আমরা নূতন রোগ কহিয়া থাকি, এবং তদ্বিপরীতে অর্থাৎ যে রোগ রোগীশরীরে **চিরকাল ধরিয়া নানা নামে, নানা মূর্ত্তিতে** বর্ত্তমান থাকে ও এই প্রকার থাকাই যাহার প্রকৃতি, যাহাকে আরোগ্য করিতে জীবনীশক্তি **অন্য কোনও একটী স্বতন্ত্র শক্তির সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ অপারক**, তাহাকে আমরা **প্রাচীন পীড়া বা চির-রোগ** কহিয়া থাকি। রোগের এই প্রকৃতি দেখিয়া, রোগটীকে নূতন কি পুরাতন শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে, এ বিষয় আমরা ঠিক করিতে সমর্থ

হই। এক্ষণে দুই একটী উদাহরণের সাহায্যে আরও একটু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। তাহার পর, নূতন এবং পুরাতন পীড়ার মধ্যে আরও কি বিভিন্নতা আছে, তাহার বর্ণনা করিব।

উপরে যে বসন্ত রোগের কথা বলা হইয়াছে, সেটী নূতন পীড়ার শ্রেণীভুক্ত করিবার হেতু কি, তাহা লিখিয়াছি। অতঃপর পুরাতন পীড়ার উদাহরণের দ্বারা বিস্তারিত ভাবে বিভিন্নতা বর্ণনা করিলেই হইবে। মনে করুন, কাহারও পেটে দারুণ শূল বেদনার জন্য চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছে। আপনি তাহার রোগলক্ষণাদি যত্ন করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন ও জানিলেন যে, রোগীর মধ্যে মধ্যে অম্ল বমন হয়, মুখে সর্ব্বদা জল সরে, শীতকালে এবং বৈকালে বৃদ্ধি হয়, হাত ও পা ফাটা ফাটা, গাত্রে নানা স্থানে দদ্রুরোগ আছে বা কতক আছে কতক লুপ্ত হইয়াছে, পেটে শূলবেদনার সময় কিছু আহার করিলে একটু উপশম হয়, মেজাজ খিট্‌খিটে, বেদনার সময় পেটে চাপ দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, ইত্যাদি। অবশ্যই লক্ষণানুসারে পেট্রলিয়াম ব্যবস্থা করা হইল, এবং পেট্রলিয়াম ১০০০শক্তি এক মাত্রা দিয়া ৭।৮ দিন পরে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা রহিল। রোগী ৮।১০ দিন পরে আসিয়া সংবাদ দিল,—"ডাক্তার বাবু, পেটের বেদনা অনেক কম হইয়াছে বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি, যাহা আমি অনেক কষ্টে অমুক চিকিৎসকের ঔষধ লাগাইয়া আরাম করিতে কতক সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহা আবার ভয়ানক বেগে দেখা দিতেছে—সেটী আমার সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি ও দাদ।" ইহাতে জানা গেল যে, নির্ব্বাচন ঠিকই হইয়াছে এবং রোগীকে বুঝান হইল যে, তাহার পেট বেদনা সারিলে তাহার চর্ম্মরোগও সারাইবার উপায় করা হইবে, সে জন্য তাহার চিন্তা নাই, ফলতঃ ভূয়োভূয়ঃ সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে, সেই ডাক্তার বাবুর ঔষধ যেন আর লাগান না হয়, কেন না তাহা হইলে পেট বেদনা সারিবে না, ইত্যাদি। রোগী পেট বেদনা হইতে শীঘ্রই পরিত্রাণ পাইল

বটে, কিন্তু তাহার পর ঐ উপদেশটী প্রতিপালন করা ততটা প্রয়োজনীয় মনে না করিয়া দাদের সেই ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিল, এবং আশ্চর্য্য কথা যে, যদিও দাদ ও চুলকনা চাপা গেল কিন্তু শূলবেদনাও আর দেখা দিল না। বলা বাহুল্য ঐ উপদেশটী তখন প্রকৃতই "গুলিখোরী" বলিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি হইল। যাহা হউক, প্রায় এক বৎসর পরে তাহার খুস্‌খুসে কাসি এবং অজীর্ণ রোগ আরম্ভ হইল, এবং "এটা সেটা" অবলম্বন করিয়া নিষ্ফল হইবার পর, চিকিৎসার জন্য আসিল। পূর্ব্বেকার লিপি অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তাহাকে পেট্রলিয়াম ১০০০ শক্তি দেওয়া হইয়াছিল, এবং এখনকার লক্ষণাদি পাইয়াও বেশ বুঝা গেল যে, তাহার সকল লক্ষণই সেই ঔষধকে সূচিত করে, অর্থাৎ তাহার পীড়াটী প্রাচীনের শ্রেণীতে পড়িবে, কেন না, তাহার সর্ব্বাঙ্গে দাদ ও কণ্ডুয়ণ চাপা পড়িয়া শূলবেদনা হয়, এবং যদিও প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক সূত্রানুসারে ঔষধ দেওয়াতে তাহার লুপ্ত রোগ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু আবার সেই সমস্ত দাদ ও চুলকানির উপর বাহ্যিক প্রলেপ দেওয়ায় সেগুলি চাপা পড়িয়াছে এবং **পীড়াশক্তিটী তাহার দেহের অন্য যন্ত্রে ও অন্যদিকে গতি ফিরাইয়াছে।** এখনও সেই পেট্রলিয়ামের লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকায় ঐ ধারণা দৃঢ়ীকৃত হইল। এই উদাহরণটী কাল্পনিক উদাহরণ নহে, ইহা প্রকৃতই আমার একটী রোগীর ইতিহাস।

এক্ষণে একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, কাহারও কলেরা বা বসন্ত কিম্বা হাম হইয়াছিল, এবং যে, রোগ হইয়াছিল, তাহা যদিও নূতন শ্রেণীভুক্ত বটে কিন্তু দেখা যায় যে, সে রোগীটী আরাম হইয়া তাহার পর নানা রোগলক্ষণ দেখা দিয়া রোগীকে বহুদিন ধরিয়া কষ্ট দেয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, নূতন রোগেরও আপনিই আরোগ্য হইবার প্রকৃতির অভাব এবং পুরাতন রোগের মত নূতন রোগেরও নানা নামে, নানা মূর্ত্তিতে রোগলক্ষণ প্রকাশ

করাই স্বভাব। এই আপত্তি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, নূতন রোগের পর যে **পর-রোগলক্ষণ** দেখা দেয়, তাহা রোগের জন্য নয়, ইহা উক্ত নূতন রোগের **কুচিকিৎসার ফলমাত্র।** কাহারও হামের পর রক্তামাশয় দেখা দিল, সেটী হাম রোগেরই "জের" বলিয়া এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ কহিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হাম রোগটীর **কুচিকিৎসা** হেতু তাহার এই রক্তামাশয় দেখা দিয়াছে। কলেরা রোগ উত্তমরূপে চিকিৎসিত হইলে তাহার কোনও "জের" থাকে না, তবে অন্যায় চিকিৎসা হইলে রোগশক্তি অন্য যন্ত্রকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে এবং তাহাকে আমরা চিকিৎসকের দোষ না দিয়া, রোগেরই "জের বা **পর-রোগ** কহিয়া থাকি। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন পীড়ায় কোনও "জের" থাকিতে পারে না। এ সকল বাক্যের প্রমাণ নিজ নিজ রোগীর ক্ষেত্রে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ প্রণিধান ও পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন ; সকল "নূতন রোগীর" এই পররোগ হয় না, যাহাদের হয়, কেন হয়, তাহা পরে কহিব।

উপরের শূলরোগিটীর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে,—যে রোগ পুরাতন, তাহার **নানা ভাবে, নানা যন্ত্রে প্রকাশ হওয়ার প্রকৃতি রহিয়াছে।** বস্তুতঃই ইহাকে নির্ম্মূল করিতে হইলে, অন্য আর একটী **পৃথক শক্তির** প্রয়োজন, নতুবা ইহা একটীর পর একটী করিয়া নানা নামে শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রোগীকে কষ্ট দিয়া থাকে। উক্ত শূল **রোগিটীর** চিকিৎসা করিলে, তবে তাহার পরিত্রাণের উপায় হইবে, (সে সকল বিষয় পরে বিবৃত হইবে)—নতুবা শূল **রোগের** উপশম হইলে রোগী সারিবে না, রোগশক্তিটীকে অন্যপথে চালিত করা হইবে মাত্র। পরিপাক যন্ত্র ছাড়িয়া হয় ত ফুস্‌ফুস্ আক্রমণ করিবে, তখনও যদি প্রকৃত হোমিওপ্যাথি সূত্রানুসারে চিকিৎসা না হয়,

তাহা হইলে রোগশক্তি, আরও **গভীরতর** প্রদেশ আক্রমণ করিবে, হয় ত মনকে আক্রমণ করিয়া রোগীকে উন্মাদগ্রস্ত করিবে। অনেক সময় দেখা যায়—হৃৎযন্ত্র আক্রমণ করিল। আবার ইহাও দেখিয়াছি, রোগী পাগল হইয়াছে,—তাহার অচিকিৎসা অথবা অসদৃশ চিকিৎসার ফলে ক্ষয়কাস দেখা দিল। ক্ষয়কাস চাপা পড়িয়া উন্মাদও হইয়া থাকে। প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে কহে—তাহা প্রত্যেক হোমিও-প্যাথেরই জানা বিশেষ প্রয়োজন। রোগলক্ষণের, কিছুদিনের জন্য "তিরোভাব" হইলেই তাহাকে আরোগ্য বলা যায় না। **প্রকৃত আরোগ্য** কাহাকে কহে, তাহা বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

বোধ হয়, যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে ইহা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝা গিয়াছে যে, রোগের **প্রকৃতি** দেখিয়া তবে, নূতন কি পুরাতন রোগ, তাহা ঠিক করা যায়। **রোগভোগকালের** তারতম্য দেখিয়া কোনও একটী রোগ নূতন কি পুরাতন, তাহা স্থির করা যায় না। অন্য মতের চিকিৎসকদিগের বা সাধারণ লোকের হিসাবে পুরাতন রোগ এবং আমাদের হিসাবে পুরাতন রোগ, একেবারে স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া, পুরাতন রোগের **কারণ** স্বতন্ত্র। পরে লিখিত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরাতন পীড়ার কারণ।

এক্ষণে আমরা ঐ প্রকার প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া নূতন কি পুরাতন রোগ, তাহা স্থির করিতে যদিও সক্ষম হইলাম, কিন্তু পুরাতন রোগের কারণ কি, তাহা না জানিলে কি প্রকারে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে, জানা যাইবে না। কোন একটী রোগী শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া আপনার নিকট আসিল ও কহিল যে, তাহার শিরঃপীড়া বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, এবং আপনি তাহার লক্ষণসমষ্টি লইয়া ঔষধ দিলেন,—রোগীটী এক ঘণ্টার মধ্যে উপশম বোধ করিল। পুনশ্চ ঐ রোগী ৮।১০ দিন পরে আসিল ও কহিল যে, তাহার আবার সেই প্রকার শিরঃপীড়া হইয়াছে, আপনি লক্ষণসমষ্টি তাহাই আছে দেখিয়া সেই ঔষধই দিলেন, এবারও সারিল তবে হয় ত এক ঘণ্টার পর নয়, আরও অনেক বিলম্বে। যাহা হউক, পুনরায় ৮।১০ দিন পরে শিরঃপীড়া দেখা দিল, আর কিন্তু আপনার নির্ব্বাচিত ঔষধে কোন কাজ হইল না। কেন? আপনি অবশ্য চিন্তা করিবেন—"শিরঃপীড়াটী ৮।১০ দিন পরে পুনঃ পুনঃ আসে কেন? প্রথম যে ঔষধ দিয়াছিলাম, তাহার সহিত ত লক্ষণসমষ্টির বেশ মিল আছে, এবং প্রথম প্রথম ২।১ বার বেশ উপশমও হইয়াছিল, সেই ঔষধ দেওয়াতেও আর উপশম হইতেছে না কেন? আমি ত ঔষধের শক্তি পরিবর্ত্তন করিয়াও দেখিলাম, তাহাতেও আর উপশম হয় না,—কেন?"

আরও কোনও রোগী আসিয়া আপনাকে কহিল যে, তাহার সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয় ও ৮।১০ দিন অত্যন্ত যন্ত্রণার পর সর্দ্দি পাকা হইয়া অনেকটা উঠিয়া যায়, কিন্তু আবার ঐ প্রকার ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি

হয়, ও যাতনা হয়। ইহার প্রতিকার করিতে গিয়াও আপনি দেখিলেন যে,—যে ঔষধে প্রথমে বেশ উপকার হইয়াছিল, পরে তাহাতে আর কিছু হয় না।

এই প্রকার অনেক ক্ষেত্রে আপনি বেশ দেখিতে পাইবেন যে রোগলক্ষণসকল মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, উপশম হয়, আবার দেখা দেয়, ইহাদের পুনঃ পুনঃ দেখা দিবার কারণ কি? এ সকল প্রশ্ন আপনার মনে উদয় হইলে, আপনি স্থির করিতে বাধ্য হইবেন যে, এইরূপ মধ্যে মধ্যে উদয় হইবার **প্রকৃতি** যে যে রোগের আছে, তাহাদের মূল বড় ভিতরে, তাহাদের মূল উপরে নহে, এজন্য বোধ হয় আরও গভীর ভাবে কার্য্য করিতে পারে, এইরূপ ঔষধের প্রয়োজন। আর এক কথা—আপনি চিন্তা করিবেন যে "এক জনের সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দি হয়, আর দশজনের ত হয় না, আর দশ জনের হয়ত ঠাণ্ডাতে থাকিতেই ভাল লাগে, দেখা যায়; কাহারও যে কারণে শিরঃপীড়া হয়, অন্য কাহারও সে কারণে কোনও রোগই হয় না—ইহারই বা কারণ কি?" এ সকল চিন্তা করিয়া আপনি হয় ত কহিবেন, রামের প্রকৃতি ও শ্যামের প্রকৃতি স্বতন্ত্র—এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কেন স্বতন্ত্র হইল? এরূপ ভিন্ন জনের ভিন্ন প্রকৃতি হওয়ার পশ্চাতে কোনও **কারণ** আছে কি না?

আপনি আরও প্রণিধান ও লক্ষ্য করিলেই জানিতে পারিবেন যে, শিরঃপীড়াটী কাহারও হয় ত আপনিই বা বাহ্যপ্রয়োগের কোনও ঔষধ শক্তির দ্বারা কিছুদিনের জন্য লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার স্থলে শূলরোগ দেখা দিল, সেই শূলের রীতিমত চিকিৎসা না হইলে হয় ত উহা চাপা পড়িয়া মূর্চ্ছা রোগ আসিল—এই প্রকার নানা মূর্ত্তিতে, নানা নামে, রোগলক্ষণ সকল আসিয়া থাকে। উপরোক্ত সর্দ্দি হইবার প্রকৃতি কিছুদিনের জন্য হয়ত লুপ্ত হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে শিরঃপীড়া কষ্ট দিতে লাগিল। এ সকল দেখিয়া আপনি স্থির করিলেন, ইহার কোনও **সুগভীর কারণ** আছে

এবং যদিও আপনি ঔষধের সাহায্যে ঐ সকল লক্ষণ কিছুদিনের জন্য উপশম করিতেছেন—তবুও বেশ দেখিতে পাইবেন যে, রোগীর ক্রমাগতই এটা সেটা নানা রোগ চলিয়াছে,—চলিতেই থাকিবে, তাহার বিরাম নাই। আপনি দেখিতে পাইবেন ও বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে,—মৃগী, উন্মাদ, শিরঃপীড়া, শোথ, উদরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র ইত্যাদি নানা নাম থাকিলেও, **ইহারা সকলেই একেরই নানা মূর্ত্তি**, এক হইতেই সকলের উৎপত্তি, তাহারা কেহই পৃথক পীড়া নহে, **একেরই পরিবর্ত্তিত রূপমাত্র**। এই "একের" নাম হ্যানিম্যান **সোরা** দিয়াছেন। এই সোরাই সকল প্রকার (নামের ও লক্ষণের) পীড়ার একমাত্র মূলীভূত কারণ এবং সকল পীড়ারই **আদি** অবস্থা,—অন্য সকল পীড়াই এই সোরার **রূপান্তর**। এক্ষণে আপনি বুঝিতে পারিবেন আপনার শিরঃপীড়ার রোগীকে নাক্স, স্পাইজেলিয়া কিম্বা সেঙ্গুইনেরিয়া দিয়া মূল বৃক্ষের একটী পত্র নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র, মূলবৃক্ষটী অন্যদিকে এবং ক্রমান্বয়ে যে শাখা বিস্তার করিতেছে, তাহার উপায় আপনি কিছুই করেন নাই। এই মূলবৃক্ষের শাখা ছেদন করিলেও উপায় হইবে না, ইহার মূলোৎপাটন না করিলে আপনার রোগীর নিস্তার নাই।

জীবসমাজের যাবতীয় পীড়ার আদি রূপ বা আদি অবস্থা **সোরা**। এই সোরা কিরূপে আসিল, ইহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহার আলোচনা পরে লিখিত হইতেছে।

যাহা হউক, আমরা প্রাচীন পীড়ার সহিত নূতন পীড়ার **বিভিন্নতা** কি প্রাচীন পীড়ার **প্রকৃতি** কিরূপ, এবং তাহার **কারণ** কি, তাহা অনেকটা জানিতে পারিলাম। এক্ষণে সোরা কি, এবং কিরূপে আসিল এবং কি প্রকারেই বা মানব দেহে এত বিস্তার স্থাপন করিল, তাহা লিখিত হইতেছে। **সোরাই মানবদেহের যাবতীয় রোগের আদিভূমি অর্থাৎ আদি কারণ**। সোরা না থাকিলে, দেহে কোন রোগই

আসিতে পারে না। যে সোরা মানবদেহে সকল রোগের নিদান এবং পৃথিবীতে এত অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহার বিষয় অতি সুন্দর প্রকারে আলোচনা না করিলে কিরূপে তাহার প্রতিকারের আশা করা যাইতে পারে? মঙ্গলময় ভগবানের সৃষ্ট মানবদেহে কিরূপে প্রথমে এই সোরার আবির্ভাব হইল, তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ, তাহার প্রতিকারের উপায় কি, এবং এই সোরা দোষই যে সকল রোগের নিদান তাহার প্রমাণ কি, ইত্যাদি সোরাবিষয়ক জ্ঞাতব্যসকল বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজন।

মানবদেহ সর্ব্বপ্রথমে অতি নির্ম্মল ছিল, কোনও প্রকার পীড়া বা পীড়াবীজ ছিল না। ভগবানের বিধান অনুসারে মনুষ্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিত। যতদিন মানুষ এইরূপে সেই মঙ্গলময়ের নিয়মাবলী প্রতিপালন করিয়া চলিতেছিল—ততদিন তাহাদের কোনও অস্বচ্ছন্দতা বা স্বাধীনতার অভাব ছিল না। যখন হইতে মানব তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই তাহার স্বচ্ছন্দতার হানি ঘটিতে লাগিল। অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিতে হইবে, এই ইচ্ছা করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের স্বাধীনতাও নষ্ট হইতে বাধ্য। যেমন কোনও একটী গাভীকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করাও যাহা, আর ঐ রজ্জুর দ্বারা আপনার নিজের বাঁধা পড়াও তাহা। গাভীটী যেমন আপনাকে ছাড়াইয়া পালাইতে অপারক, আপনিও গাভীটীকে ছাড়াইয়া পলাইতে অপারক। নিজে স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিব, এ ইচ্ছা করিলে অন্যকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। অন্যকে ভালবাসিতে হইবে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম,—ইহার ব্যতিক্রম করিলে এই স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য ফলভোগ করিতেই হইবে, কোনও পরিত্রাণ নাই। আমরা যতদিন সমাজে পরস্পরের প্রতি ভালবাসাসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন আমাদের স্বচ্ছন্দতা ও শান্তি বজায় ছিল। ক্রমে যখন অপরকে ভালবাসার চক্ষে না দেখিয়া তাহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইলাম, তখন নিজেরও হৃদয় কলুষিত

হইতে আরম্ভ করিল। যে হৃদয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল, সেই হৃদয়ে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা প্রথম দেখা দিল। এই ঈর্ষা, এই ভালবাসার অভাব, এই অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বা যাহাই বলুন, আমাদের হৃদয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে অধিক দিন থাকিতে পারে না, কেননা দেখা যায়, কাহারও প্রতি অসৎ বা অন্যায় **মনন** করিলে, এই মননটী কেবল মনন অবস্থায় অধিক দিন থাকে না, কিছুদিন পরে এই অন্যায় **মনন** অনুসারে অন্যায় **কার্য্য** করিবারও প্রবৃত্তি মনে উদয় হইতে থাকে,—অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট মনন অবস্থা হইতে ক্রমেই অপরের অনিষ্ট করিবার **উপায়চিন্তা** আসিতে লাগিল। কাহারও উন্নতি দেখিয়া প্রথমে হিংসার ভাব উদয় হয়, তখনও তাহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকিলেও চেষ্টা থাকে না, ক্রমে **চেষ্টা** আসে। এই **চেষ্টাই মানসিক "কুণ্ডুয়ন"**। কিরূপে অমুক ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিব, এই মানসিক ব্যগ্রতা, অস্থিরতা ও চেষ্টাকে মনের "কণ্ডুয়ন" বলা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যে বিশৃঙ্খলা বা যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা মনের ভিতরেই আছে, বাহিরে আসে নাই। হিংসা, মনন, অনিষ্ট কল্পনা অনিষ্ট করিবার চেষ্টা ইত্যাদি সকলই মানসিক অবস্থা, এখনও, কার্য্যভাবে বাহিরে আসে নাই। মানসিক ঐ অবস্থা এখনও মনেই আছে,—দেহে আসে নাই। মনের মধ্যে পূর্ব্বকার অমল শান্তি ও নির্ম্মল আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদ ও বিপর্য্যয় আসিয়াছে, ফলতঃ এখনও মনের কণ্ডুয়ন মনেই আছে,—বাহিরে, দেহে প্রতিফলিত বা বিকশিত হয় নাই। মনে বীজ জন্মিয়াছে,—কিন্তু এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই,—কাজেই এখনও লোকলোচনের অন্তরালেই আছে। কিন্তু আর কত দিন থাকিতে পারে? সর্ব্ব প্রথমের এই মানসিক বিশৃঙ্খলাই সোরার **প্রথম মূর্ত্তি**—অবিকশিত ও বীজস্বরূপ হইয়া এখনও মানসিক অবস্থায় আছে। ক্রমে তাহা বাহিরে অর্থাৎ দেহে প্রতিবিম্বিত হইল। মানসিক কণ্ডুয়নটীর অনুরূপ মূর্ত্তি বাহিরে দেখা দিল, অর্থাৎ দেহেও

"কণ্ডুয়ন" দেখা দিল। এই প্রকারে নিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত দেহস্থ "কণ্ডুয়ন" সোরার বাহ্য বিকশিত মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি এখন লোক-লোচনের অন্তরালে নাই, এখন এই মূর্ত্তি দৃশ্যমান। **এই মানসিক কণ্ডুয়ন,—সোরার প্রথম ও অদৃশ্য মুর্ত্তি, এবং দৈহিক কণ্ডুয়ন,—সোরার বাহ্য দৃশ্যমান মুর্ত্তি,** একথা বেশ মনে রাখিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে, নিয়ম লঙ্ঘন, পরে, অসৎ ও অন্যায় মনন, তাহার পরে, অসৎ ও অন্যায় কল্পনা ও চেষ্টা বা কণ্ডুয়ন, এবং সর্ব্বশেষে এই মানুসিক অবস্থা হইতে বাহ্যদেহে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত অবস্থা অর্থাৎ দৈহিক কণ্ডুয়ন, এই ক্রমগুলি আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এই অসৎচিন্তা, অসৎমনন এবং মানসিক ও বাহ্যিক কণ্ডুয়নের ফলস্বরূপ শরীরস্থ ধাতু দূষিত হওয়ায়, আমাদের দেহে রোগপ্রবণতা আনিত হইয়াছে। এক্ষণে **সোরা** কি? সোরা একটী অবস্থা। কিরূপ অবস্থা? বিপর্য্যয় বা বিশৃঙ্খলাবস্থা। কাহার বিপর্য্যয় বা বিশৃঙ্খলাবস্থা? মানব শরীরযন্ত্রের (শরীর যন্ত্র = দেহ + মন)। কোথায়, ইহার কিরূপে, উদ্ভব হয়? অসৎচিন্তা ও অসৎমনন হইতে প্রথমে মানসিক কণ্ডুয়নরূপ ধারণ করিয়া মন, এবং মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া **বাহ্যদেহে** কণ্ডুয়নরূপে উদ্ভূত হয়।

এ স্থলে একটী কথা বলিতে হইবে। অনেক কৃতবিদ্য চিকিৎসকেরও ধারণা আছে যে, সোরা অর্থে খোস্ চুলকনা; বস্তুতঃ তাহা আদৌ নহে। খোস্ চুলকনা সোরার **ফলমাত্র**। সোরা থাকিলে তবে খোস চুলকনা হওয়া সম্ভব, নতুবা নহে। যেখানে খোস চুলকনা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই সোরা আছে। আমরা সোরার অর্থ বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছি, কাজেই সম্ভবতঃ ভ্রম হইবার কারণ নাই। আমরা বুঝিয়াছি—সোরা একটী অবস্থা মাত্র, মানবদেহযন্ত্রের একটী দোষ, একটী বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও বিপর্য্যয়যুক্ত অবস্থা। শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থার বিপর্য্যয়। জীবনী-শক্তি যে স্বাধীনভাবে এতাবৎকাল কার্য্য করিতেছিল, সোরা আসিয়া

তৎপরিবর্ত্তে একটী বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে, এবং জীবনীশক্তিকে এখন তাহারই বশে কার্য্য করিতে হইতেছে। সোরা আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া যে কোনও রোগশক্তিকে শরীরে প্রবেশ লাভ না করিতে দিবার ক্ষমতাটী অটুট রাখিয়াছিল, এখন সোরার আবির্ভাবের পর হইতে জীবনীশক্তির আর সে ক্ষমতা নাই, এখন তাহাকে অন্য একটী শক্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে।

অতএব জানা গেল যে, সোরা অর্থে খোশ চুলকানি কদাচই নয়। খোস চুলকানি থাকিলে, তৎপশ্চাতে সোরা নিশ্চয়ই আছে বুঝিতে হইবে, কিন্তু খোস চুলকানি না থাকিলে যে সোরা নাই, তাহা নয়,—কণ্ডুয়ন থাকিলেই যথেষ্ট। যেখানে কণ্ডুয়ন সেখানে সোরা, এবং যেখানে সোরা সেখানে কণ্ডুয়ন। যেখানে সোরা নাই, সেখানে কণ্ডুয়ন নাই, এবং যেখানে কণ্ডুয়ন নাই, সেখানে সোরা নাই। কণ্ডুয়নের ফলে চুলকনা বা ঘর্ষণ কার্য্য, এবং চুলকনা কার্য্যের ফলে, দেহের চর্ম্মের উপর উদ্ভেদ— প্রথমে রসপূর্ণ, পরে পূঁজপূর্ণ—দেখা দেয়। কাজেই খোস চুলকানি সোরার আরও গৌণ (secondary) বা দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মূর্ত্তিমাত্র, অতএব খোস চুলকানিকে সোরা বলিবার কোনও কারণ নাই। সোরা—কারণ, এবং খোস চুলকানি,—সোরার কার্য্য।

এই সোরার আবির্ভাবের পর হইতে আমাদের রোগপ্রবণতা আসিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। একথা আরও একটু পরিষ্কাররূপে আলোচনা প্রয়োজন, সোরার দ্বারা কিরূপে আমাদের রোগপ্রবণতা আসে, তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা চাই। সোরা আমাদের কি করিল? আমাদের নির্ম্মলচিত্তে একটা বিশৃঙ্খলা আনিয়া দিল। মনকে দূষিত করিল। মন অর্থে—জ্ঞানশক্তি, বোধশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। এই তিনটী শক্তির সমষ্টিই মন। যদি মানবের মন দূষিত হইল, তাহা হইলে, তাহার ফলে, জ্ঞান, বোধ ও ইচ্ছা, এই তিনটীই দূষিত

হইল। আমাদের যেমন মন, আমাদের তেমনই কার্য্য। অগ্রে মনে ইচ্ছা ও কল্পনা হইয়া থাকে, পরে সেই ইচ্ছা ও কল্পনা অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। দূষিত মনে দূষিত কল্পনা ও দূষিত ইচ্ছাই জন্মিয়া থাকে, এবং তদনুসারে যে কার্য্য করা হয়, তাহাও দূষিত হইতে বাধ্য। সোরা হেতু মানবের মন অর্থাৎ কার্য্যপ্রস্রবণ কলুষিত হইয়াছে, তাহার ফলে কু কার্য্য করার জন্য আবার আরও দুটী দোষ মানবদেহে আশ্রয় লইয়াছে—সে দুটী,—সিফিলিস্ ও সাইকোসিস, অর্থাৎ উপদংশ ও মেহ। উপদংশ ও মেহ **কু-কার্য্যের** ফল, সোরা **কু-মননের**, কু-ইচ্ছার ফল। সোরা না থাকিলে উপদংশ ও মেহ আসিতে পারে না। মেহ ও উপদংশ আসিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রয়োজন; সেই ক্ষেত্রটী, সোরা অগ্রে তৈয়ার করে। অতএব সোরাই উপদংশ ও মেহের কারণ,—প্রকৃত প্রস্তাবে সোরাই যাবতীয় রোগের কারণ, কেননা সোরা না থাকিলে যখন অন্য দুটী অর্থাৎ উপদংশ ও মেহ আসিতে পারে না, তখন সোরাই সকল রোগের মূল, একথা সিদ্ধ ও সত্য। সোরা অগ্রে ক্ষেত্র তৈয়ার করিল, তাহার পর নিজে, এবং নিজের প্ররোচনার দ্বারা দুষ্কার্য্য ঘটাইয়া, উপদংশ ও মেহকে আনিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া মানবদেহযন্ত্রকে নানা-ব্যাধির বিলাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে। অগ্রে মনোদুষ্টি পরে কার্য্যোদুষ্টি হেতু আমরা রোগপ্রবণ হইয়াছি। কু-মনন ও কু-কার্য্য ফলে আমরা নিজের স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারাইয়া বাহ্যপ্রকৃতির দাস হইয়াছি। রোগ সকল কি? রোগ সকল বাহ্য প্রতিরূপ, প্রতিচ্ছায়া, প্রতিবিম্ব। কাহার প্রতিচ্ছায়া? মানব মনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিচ্ছায়া। আমাদের কোনও রোগ আসিতে পারে না, যদি আমাদের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মনে তাহার মূর্ত্তি গঠিত না থাকে। আমাদের **মনের অবস্থাটীই** রোগ-**রূপে বাহিরে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র।**

অতঃপর মেহ ও উপদংশ কাহাকে বলে, তাহা জানা প্রয়োজন।

সোরা কাহাকে বলে এবং প্রাচীন পীড়ার সহিত সোরার সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ কাহাকে কহে, ইহাদের প্রকৃতি কিরূপ, ইহাদের ক্ষমতা কতদূর, এ সকল জানা অতীব প্রয়োজনীয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, সোরা মানবের কু-মনন ও কু-চিন্তার ফল। এই কু-মনন ও কু-চিন্তার ফলে মানব কুকার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া সাইকোসিস ও সিফিলিস নামক দুইটী দোষ শরীর-যন্ত্রে আনিয়াছে। সোরা কু-মনন ও কু-চিন্তার ফল, এবং অপর দুটী, কুকার্য্যের ফল।

সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস বলিলে, পাছে ইহাদের প্রকৃত অর্থ মনে না আনিয়া অপর কিছু মনে আনিয়া ফেলা হয়, সেজন্য বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কেননা, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, সোরা বলিলে অনেকে খোসপাঁচড়া মনে করেন, কাজেই অনেকেই সাইকোসিস বলিলে মেহরোগ, এবং সিফিলিস বলিলে উপদংশ রোগ মনে করিতে পারিবেন, ইহাতে বিচিত্র কি ? এজন্য বার বার এত সাবধান করিবার প্রয়াস। আমি এ বিষয় একটু আরও পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা করি। সোরার অর্থ বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, এজন্য আর পুনরায় বলা নিষ্প্রয়োজন। সাইকোসিস ও সিফিলিসের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

সাইকোসিস—সাইকোসিস কি, জানিতে হইলে, অগ্রে গনোরিয়া কি, তাহা জানা আবশ্যক। শাস্ত্রে অর্থাৎ আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে "মেহরোগ" বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা "গণোরিয়া" নহে। "গণোরিয়া" বলিতে "বিষাক্তমেহ" বলিলে কতকটা বলা হয়। মূত্রনালীর প্রদাহ হইলেই তাহাকে "গনোরিয়া" বলা যায় না। অতিরিক্ত রৌদ্র সেবন, নানা উগ্রবীর্য্য দ্রব্য ভোজন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি হইতে অনেক সময় ঐ নালীর প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে কদাচই "গনোরিয়া"

বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, যাহাকে "গনোরিয়া" বলে, তাহা দূষিত স্থানে গমন জনিত হইয়া থাকে। দূষিত স্ত্রীলোকের নিকট উপগমন না করিলে প্রকৃত "গনোরিয়া" হইতে পারে না। সেই "গনোরিয়া" যদি নূতন অবস্থায় সদৃশবিধানে চিকিৎসা হয়, তবে আর কোনও অনর্থ ঘটাইতে পারে না। (গনোরিয়ার লক্ষণাদি কি কি, তাহার চিকিৎসাই বা কি, তাহা আমার লিখিবার উদ্দেশ্য নয়, এবং তাহা পাইবার অসুবিধাও নাই, নানা পুস্তক হইতে অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমার উদ্দেশ্য,— সাইকোসিস কি, তাহার প্রকৃতি ও কার্য্য আলোচনা করা)। এক্ষণে, উক্ত দূষিত স্থানে গমনজনিত যে গনোরিয়া হয়, তাহা যদি প্রথমেই সদৃশ বিধানে চিকিৎসা না হয়, তবে সাইকোসিস হইবার কোনও অসুবিধা থাকে না। কোনও ব্যক্তি যখন তাহার দুষ্কার্য্য জন্য গনোরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন "গোপনের কার্য্যফল, গোপনেই যাহাতে শেষ করিতে পারা যায়", এজন্য সে বিশেষ চেষ্টা করে। বিশেষতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রভাবে প্রায়ই উগ্রবীর্য্য ঔষধাদির দ্বারা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইনজেকসনাদির প্রয়োগে ৪।৫ দিনের মধ্যে গনোরিয়ার স্রাবটী লুপ্ত হইলে, রোগী আপাততঃ স্বচ্ছন্দ মনে করে, **ইহাই সকল অনর্থের আরম্ভ**। যখনই বাহ্যিক স্রাবটি লুপ্ত হইয়া গেল, তখনই **রোগশক্তি অন্তর্মুখ** হইল, এবং **সাইকোসিসের স্থাপনা হইল**। রোগশক্তি অন্তর্মুখ হইয়া আভ্যন্তর যন্ত্র সকলকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিবেই করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এখনও যদি প্রকৃত চিকিৎসা হয়, তাহা হইলেও অনেক সুবিধা হয়, তাহাও হয় না। পরন্তু ঐ রোগীর ঐ প্রকারে স্রাবটী লুপ্ত হইবার পর, তাহার ফলে, যদি কোনও রোগলক্ষণ আসে, তাহা হইলে চিকিৎসকেরা কখনই স্বীকার করেন না যে, গনোরিয়ার কুচিকিৎসার ফলে এই প্রকার হইয়াছে বা হইতে পারে। তাহার উপর, রোগলক্ষণকে আরও চাপা দিতে গিয়া আরও বিপদ

ঘটাইবার ব্যবস্থা করেন, এদিকে রোগশক্তি আরও গভীরতর ও অধিক প্রয়োজনীয় যন্ত্র সকলকে দূষিত করে, ক্রমে সোরার সহিত মিলিত হইয়া নানা অনর্থ আনয়ন করে, এবং ক্রমেই এমন অবস্থা আসে যে, তখন রোগীর রোগমুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করা অতীব সুদূরপরাহত হইয়া উঠে।

যাহা হউক, সাইকোসিস কি ? সাইকোসিস সোরার ন্যায় একটী অবস্থা। কাহার অবস্থা ? মানব শরীর-যন্ত্রের অবস্থা। কি প্রকার অবস্থা ? এমন একটী অবস্থা, যাহাতে মানবকে অন্য প্রকারের (অর্থাৎ সোরা হইতে যে সকল রোগলক্ষণ আসে. তাহা হইতে আরও অন্য প্রকারের কতকগুলি) রোগলক্ষণের অধীন করে। একেই ত সোরার কৃপায় পূর্ব্বেই যে অনেক প্রকারের রোগপ্রবণতা পাইয়াছে, এক্ষণে আবার সাইকোসিসের জন্য আরও অনেক প্রকার রোগের প্রবণতা পাইল। কেন এ অবস্থা আসিল ? গনোরিয়ার বাহ্যিক স্রাব অসমলক্ষণে চিকিৎসার ফলে লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় তাহার রোগশক্তিটী অন্তর্মুখ হইয়া এ অবস্থা আনয়ন করিয়াছে। আবার সোরার সহিত মিলিত হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর ভাব ধারণ করিতে থাকিবে।

সিফিলিস—ইহাও অনেক সময় অনেকে উপদংশ রোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সিফিলিস রোগটী মানবের কুকার্য্যের ফল। কুস্থানে উপগমনজনিত এই কুৎসিত ব্যাধি হয়, সাইকোসিসও তাহা হইতেই হয়, তবে গনোরিয়া ও উপদংশে বিভিন্নতা এই যে—গনোরিয়াতে লিঙ্গের অভ্যন্তরে ও মূলে প্রদাহ ও ক্ষত হয়, আর উপদংশে লিঙ্গের মুণ্ডে ও বাহিরে প্রদাহ ও ক্ষত হয়। দুইটী রোগই একই কুকার্য্যের ফল এবং প্রথমাবস্থায় অনেক সাদৃশ্য থাকে। কোনও ব্যক্তির উপদংশ ক্ষত হইবামাত্র উহা অতি গোপনে ও অল্পায়াসে আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে ইমজেকসন্ প্রভৃতি আপাততঃ ও আশু উপশমকারী উপায় অবলম্বন করে এবং তাহার ফলে রোগ-শক্তিটী অন্তর্মুখি

হইয়া "সিফিলিস" নামক দোষের সৃষ্টি করে। সিফিলিস দোষও শরীরযন্ত্রের অবস্থা বিকৃত করিয়া ফেলে এবং মানবকে আরও কতকগুলি রোগের অধীন করে। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সিফিলিস অপেক্ষা সাইকোসিস্ আরও অধিক ভীষণতর। যাহা হউক সোরা, সাইকোসিস এবং সিফিলিস ইহাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্য্যায়ের প্রকৃতি ও লক্ষণ সকল পরে যথাস্থানে বিস্তারিত লিখিত হইবে। এক্ষণে, এইটুকু যেন মনে থাকে যে, সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস বলিতে একটী করিয়া **অবস্থা, যাহারা রোগ প্রবণতা আনয়ন করে।** উহাদিগকে কেহ যেন **রোগবিশেষ** বলিয়া ভ্রম না করেন। উহারা শরীরের এক একটী **দোষ** বা **অবস্থা** মাত্র। সোরা, সাইকোসিস এবং সিফিলিস প্রত্যেকে জীবনশক্তির স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতিকে নিজ নিজ গতি ও প্রকৃতি অনুসারে প্রথম হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে, এবং জীবনশক্তি তাহাদের বসে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

ইতিপূর্ব্বে যে নূতন ও প্রাচীন পীড়ার বিভিন্নতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাতে বিভিন্নতার **প্রথম চিহ্ন,**—উভয়ের প্রকৃতির তারতম্য অর্থাৎ নূতন পীড়ার আপনিই আরাম হইবার প্রকৃতি এবং প্রাচীন পীড়ার নানা নামে ও নানা মূর্ত্তিতে চিরকাল দেখা দিবার প্রকৃতি। **দ্বিতীয় চিহ্ন,**—নূতন পীড়ার কারণ প্রধাণতঃ সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস নহে, ইহারা নূতন পীড়ার **গৌণ** কারণ হইলেও **মুখ্য** নহে। প্রাচীন পীড়ার মুখ্য কারণ,—সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস, ইহাদের ১টী, বা ২টী অথবা ৩টীর সংমিশ্রণ।

যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহার দ্বারা আমরা বুঝিলাম যে, নানা নামে ও নানালক্ষণযুক্ত যে সকল রোগ জনসমাজে অভিহিত আছে, তাহারা কেহই এক একটী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রোগ নহে, তাহারা সোরা, সাইকোসিস ও

সিফিলিস, এ সকলের ১টীর, অথবা ২টীর বা ৩টীর একত্র সন্নিবেশজাত বিভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। রোগীর লক্ষণাদির সমষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের মধ্যে কোন্‌টী বা কোন্ দুইটীর প্রধান্য আছে, তাহা আমরা স্থির করিয়া লইয়া থাকি। অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, "সোরা, সাইকোসিস্ বা সিফিলিস যে প্রাচীন পীড়ার কারণ,—তাহার **প্রমাণ** কি ? কিরূপে জানা যাইবে যে, মানবশরীরে মূর্চ্ছা, উন্মাদ, রক্তস্রাব, প্রদর, শোথ, উদরাময়, ক্ষয়কাশ ইত্যাদি নানা নামে এবং নানা মূর্ত্তিতে অভিহিত রোগ সকল নিজে নিজে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়, ইহারা সোরা, সাইকোসিস এবং সিফিলিসের প্রকারভেদ বা মূর্ত্তিভেদ মাত্র ?" এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া 'মহাত্মা হ্যানিম্যানের অভিজ্ঞতার ফল' বলিলে যথেষ্ট হয় না। নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার অভিজ্ঞতার সহিত মিল করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়, নতুবা যে যতই বলুক বা লিখিয়া উপদেশ দিতে থাকুক, কিছুতেই মানসিক প্রত্যয় আসে না, আসিতে পারে না। আমি নিজের ২।১টী রোগীর কথা লিখিতে পারি, কিন্তু তদানুসারে নিজের নিজের রোগীর ক্ষেত্রে উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রমাণ এবং উপলব্ধি হইবে, নতুবা কোনও প্রত্যয় সম্ভাবনা নাই। ১মতঃ—মেটিরিয়া মেডিকা উত্তমরূপে পাঠ ও ঔষধ সকলের মধ্যে সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা নিরূপণ ; ২য়তঃ—রোগীর লক্ষণসমষ্টির সংগ্রহ, ঔষধ নিরূপণ এবং উচ্চশক্তি প্রয়োগ ; ৩য়তঃ—যথেষ্ট সময় অপেক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ, এই সকল না থাকিলে কোনও প্রমাণ পাইবার আশা করা যায় না। ইচ্ছা সকলের মূল। যদি দৃঢ় ইচ্ছা থাকে, তবে কিছুই অভাব থাকে না। নতুবা সাধারণতঃ যে প্রকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হয়, তাহাতে কি ফল হইবে ? শূলবেদনার রোগী আসিলে যে কয়টী ঔষধ পেটবেদনায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, তাহাদের মধ্যে যে কোনও ২টী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবার উপদেশ দেন ও তাহাতে ফল না হইলে

আবার, অন্য ২টী ঐ প্রকারে দিয়া থাকেন, এরূপ চিকিৎসক শতকরা ৭৫টী, বাকী ২৫টীর মধ্যেও সকলের এরূপ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার ফলে তাঁহারা ৩০ শক্তির উর্দ্ধে ব্যবহার করিতে সাহস করেন। শতকরা ২১১টী চিকিৎসক প্রকৃত হ্যাঁনিম্যানের হোমিওপ্যাথি অনুসারে চিকিৎসা করেন। বাকী আমাদের মধ্যেই ৯৮জন চিকিৎসক এ সকল "গুলিখোরের কথা" বলিয়া উড়াইয়া দিবেন,—অন্য প্যাথদের ত দূরের কথা। সত্যে নির্ম্মল ও অটল বিশ্বাস চাই এবং সেই পথে চলা চাই, নতুবা নামধারী হোমিওপ্যাথ হোমিওপাথির কেবল সর্ব্বনাশ করিতেছেন মাত্র। নিজেরই বিশ্বাস নাই, আর "রোগীর বিশ্বাস নাই, দৃঢ়তা নাই,"—বলিলে চলিবে কেন? নিজের বিশ্বাসের মূলে,—পরিশ্রম, অনুসন্ধান ও সত্যপথ অবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমি মধ্যে মধ্যে উপরোক্ত সত্যের প্রমাণ স্বরূপে রোগীতত্ত্ব দিব—উপস্থিত একটী রোগীর বিষয় লিখিতেছি, এটী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও প্রামাণিক।

শ্রীযুক্ত·········রায় চৌধুরী, বয়স ৪২।৪৩, বাড়ী দামোদরপুর, জেলা মানভূম, থানা পুরুলিয়া—গৌরবর্ণ, শীর্ণকায়, মাথাটী অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাতে একটু বড়, রুক্ষ মেজাজ, শুষ্কদর্শন, ১৯১৮ সালের ১১ই জুন তারিখে আমার নিকট আসেন এবং নিম্নলিখিত অবস্থা বর্ণনা করেন।

বর্ত্তমান লক্ষণাবলী—প্রায় সর্ব্বদাই শুষ্ক কাসি, কাসের সহিত মাত্র লালা, শ্লেষ্মা আদৌ থাকে না, সময়ে সময়ে ঐ লালার সহিত রক্তের ছিটা থাকে, বাহে ভাল হয় না, বৈকাল ৪।৪॥০ টার পর হইতে শরীর খারাপ মনে হয়, কিন্তু বিশেষ ভাবে জ্বর বলিয়া মনে হয় না। অন্যান্য লক্ষণ বিশেষ কিছু বলিলেন না।

পূর্ব্ব ইতিহাস—রোগীর পিতামাতা নাই, কাজেই বাল্যকালের

লক্ষণ বা ইতিহাস পাইলাম না। রোগী যখন স্কুলে পড়িতেন, তখন, তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শরীর বেশ ভাল ছিল, তিনি স্কুলের বোডিংএ থাকিতেন, তাঁহার স্বভাব বড় নির্ম্মল ছিল, এজন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে বোডিংএর 'মনিটার" নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তিনি জ্বর ও হাঁপানি রোগে ৪।৫ বৎসর ভোগ করিয়া শোথ ও উদরাময়াদি দেখা দিবার পর মারা যান। মাতার তৎপূর্ব্বেই উদরী রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। রোগী ১৯ বৎসর বয়সে একদিন কোনও বৃহৎ পুষ্করিণীতে বাজী রাখিয়া সাঁতার দেন, প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সাঁতার দিতে হয়, এবং সেই দিন সন্ধ্যায় তাঁহার জ্বর হয়, তাহার সঙ্গে অঙ্গবেদনা, কাসি ইত্যাদিও হয়, ১০।১২ দিন পরে আরোগ্য হন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইয়াছিল, কুইনাইন ব্যবহার হইয়াছিল কি না, তাহা তাঁহার মনে ছিল না। তাহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে সর্দ্দি কাসি হইত ও কখনও উপবাস, কখনও এলোপ্যাথিক ঔষধ ২।৪ দিন ব্যবহার করিতে হইত। পরে ৩০।৩১ বৎসর বয়সের সময় নিউমোনিয়া হইয়াছিল, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হয় ও প্রাণসংশয় হইয়া উঠে, ৭৫ দিনের পর পথ্য হয়, ১৫।১৬ দিন জ্ঞান ছিল না; এই নিউমোনিয়া সারিবার পর হইতেই সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাঁহার সর্দ্দি হইবার অভ্যাস জন্মিয়াছে। বিশেষ সাবধানে থাকিলেও তাঁহার সর্দ্দি আসে, কাসিও হয়, সামান্য জ্বরবোধ হয়। প্রায় সকল সময়েই বামধারে বুকের উপরদিকে তীব্র ছুঁচফোটা মত বেদনা থাকে, মধ্যে মধ্যে কাসির সহিত সামান্য সামান্য রক্তের ছিটা দেখা যায়। আহারে ইচ্ছা তত নাই, তবে সামান্য আহার করিলে পেট যেন ফুলিতে থাকে, চোঁয়া ঢেকুর উঠে। রোগী অতিশয় শীতকাতর।

গত বৎসর শীতকাল হইতে একটু বাড়াবাড়ি দাঁড়াইয়াছে। বড় দুর্ব্বলতা, এবং রাত্রি ২।৩ টার পর হইতে আর নিদ্রা হয় না, উঠিয়া

বসিতে হয় ও কাসিতে হয়, তখন হইতে প্রায় সকাল পর্য্যন্ত কাসিতে হয় এবং সেই সময় শ্লেষ্মা উঠে, অন্য সময় শুষ্ক কাসি, কিছুই উঠে না।

বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা গেল না, তবে বাম ধারের বুকের উপর এক ইঞ্চি আন্দাজ স্থানের শব্দ একটু বিকৃত বলিয়া বোধ হইল, ফলতঃ এ লক্ষণের উপর আমি ততটা আস্থা স্থাপন করিলাম না।

আমি যে সকল লক্ষণ পাইলাম, তাহাতে "কেলি কার্ব্ব" নির্ব্বাচন করার পক্ষে কোনও বাধা দেখিলাম না। কেলি কার্ব্ব ২০০ শক্তি, এক মাত্রা, ১৪।৬।১৮ তারিখে দিলাম, এবং ১৫।১৬ দিন পরে সংবাদ দিতে কহিলাম, কিন্তু প্রায় একমাস ধরিয়া বিশেষ লক্ষ্য করিলাম, কোনও ফল দেখিতে পাইলাম না।

৩০।৭।১৮—কেলি কার্ব্ব, ১০০০ শক্তি নিত্য প্রাতে এক মাত্রা করিয়া, তিন মাত্রা দিলাম ও এক মাস অপেক্ষা করিয়াছিলাম। রোগীকে মধ্যে মধ্যে আমার সহিত দেখা করিতে কহিলাম।

৪।৮।১৮—রোগীর নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার বুকের বেদনাটী অত্যন্ত বাড়িয়াছে, আজ তিন দিন বাড়াবাড়ি বটে, তবে গত কল্য রাত্রিতে, বিশেষতঃ শেষ রাত্রে, বড় কষ্ট গিয়াছে। দিনের বেলায় শুষ্ক কাসি অপেক্ষাকৃত কম।" ঔষধ দিলাম না।

১৮।৮।১৮—"যে বৃদ্ধিটুকু হইয়াছিল তাহা গিয়াছে, যেন অনেকটা ভাল আছি বলিয়া মনে হয়, এখন আহার করিয়া তৃপ্তি বোধ হইতেছে ও ততটা দুর্ব্বল মনে হয় না, কাসিও কম। রাত্রে নিদ্রা বেশ হয় না, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল।" ঔষধ নিস্প্রয়োজন।

২৫।৯।১৮—পর্য্যন্ত রোগী ক্রমেই ভাল বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু ঐ দিন রাত্রে তাঁহার সকল যন্ত্রণার একেবারে ভয়ানক বৃদ্ধি হওয়ায় আমাকে ডাকিয়া পাঠান, আমি গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমারও বিশেষ

চিন্তা হইল, প্রাতঃকালে ৫॥০ টার সময় প্রায় অৰ্দ্ধপোয়া রক্ত, কাসির সহিত বাহির হইয়াছে, তাহা একটী পাত্রে রাখা হইয়াছিল, রোগীর ভয়ানক জ্বর, তন্দ্রাভাব, পেট ফাঁপা ইত্যাদি দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম। বাড়ীর লোকের তুষ্টির জন্য একটী শিশিতে কেবল কতকটা জল দিয়া, ৮টী দাগ করিয়া দেওয়া হইল এবং বলিয়া দেওয়া হইল, যেন প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া খাওয়ান হয়। তিন দিন পরে জ্বরের অবসান হইল, কিন্তু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে রক্ত দেখা দিতেছে ও কাসির জন্য বড় কষ্ট। এই সকল দেখিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়া, বিশেষতঃ রোগীর মানসিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতেছে দেখিয়া, ইহা ঔষধের বৃদ্ধি নয়, তাহা স্থির করিলাম, অথচ পূর্ব্ব মাত্রায় ক্রিয়ার অবসান হইয়াছে এ ধারণাও করিতে পারিলাম না, কেন না তাহা হইলে এত বৃদ্ধি হইত না ও এত অধিক রক্তস্রাব, পেট ফাঁপা, মানসিক অবসন্নতা ইত্যাদি লক্ষণের আবির্ভাব হইত না। এই সকল প্রণিধান করিয়া এবং নির্ব্বাচনও ভ্রান্ত নয়, ইহা স্থির করিয়া, ২৮।৯।১৮ তারিখে **সালফার** ১০০০ শক্তি ১ মাত্রা দিলাম।

১৬।১০।১৮—রোগী আসিয়া দেখাইলেন, তাঁহার গায়ে কি বাহির হইয়াছে, আমি দেখিয়া সেইগুলি সাইকোসিস দোষের উদ্ভেদ স্থির করিলাম ও কহিয়া দিলাম, তাহাতে যেন কোনও কিছু বাহ্য ঔষধ দেওয়া না হয়। রোগীর অবস্থা অনেকটা ভাল বোধ হইল, মধ্যে ৫।১০।১৮ তারিখ হইতে আর রক্ত দেখা দেয় নাই।

২৪।১০।১৮—আমি এই দিন রোগীর গাত্রে যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে না, যাঁহারা নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহ হয়ত বিশ্বাসই করিতে পারিবেন না। উপরোক্ত উদ্ভেদ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বাহির হইয়াছিল, এমন কি, চক্ষের পাতাগুলিও

বাদ যায় নাই। গুহ্যস্থানে ও মাথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এ সকল দেখিয়া আমার মনে আনন্দ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল।

নভেম্বর মাসের ১৫।১৬ই পর্য্যন্ত ঐ ভাবেই থাকিয়া উদ্ভেদগুলি ক্রমে আপনিই অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিল, আমি ২০।১১।১৮ তারিখে **সালফার সি-এম** শক্তি এক মাত্রা দিলাম। প্রথমে এত উচ্চশক্তি দিবার সাহস হয় নাই, কেন না রোগীর অবস্থা তখন বড় দুর্ব্বল ছিল, তাহা ছাড়া, এত উচ্চ শক্তি দিলে, কি জানি, তাহার প্রতিক্রিয়ায় বিশেষ অসুবিধা হয়।

১৪।১২।১৮—তারিখে রোগী সংবাদ দিলেন, পূর্ব্ব মাত্রা ঔষধের পর আরো ১০।২০টী উদ্ভেদ বাহির হয়, কিন্তু তাহারা প্রায় সকলই অদৃশ্য হইয়াছে, রোগীর মনে যেন প্রতীতি হইয়াছে যে, তিনি নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন।

এক্ষণে, রোগীর লক্ষণ,—শুষ্ক কাসি, ভোর রাত্রের কাসিতে শ্লেষ্মা উঠা, এবং ঠাণ্ডা লাগায় ভয় ও মধ্যে মধ্যে নূতন সর্দ্দির আক্রমণ হওয়ায়, এইগুলি, পূর্ব্বের তুলনায় ছয় আনা অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই ভাবেই থাকেন, আর কোনও পরিবর্ত্তনের ভাব না দেখিয়া ২।১।১৯ তারিখে **কেলি কার্ব্ব, সি-এম, শক্তি** এক মাত্রা দিই।

৭।৩।১৯—রোগী সংবাদ দিলেন যে, তিনি বেশ সুস্থ আছেন, তবে ঠাণ্ডা লাগার অভ্যাসটী গেলেই এখন নির্ভয় হইতে পারেন। আমি আরও অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিলাম। ১১।৪।১৯ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার সেই ঠাণ্ডা লাগার অভ্যাসটী যাওয়ার বা কমিবার কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া, **টিউবারকুলিমাম বোভিনাম**, সি এম, এক মাত্রা দিয়াছিলাম। আর অনেক দিন কোনও সংবাদ পাই নাই, প্রায় এক বৎসর পরে রোগীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে সুস্থ আছেন, জানিলাম।

যাহা হউক, আমরা জানিয়াছি যে, নানা নাম ও নানা রূপযুক্ত যে

সকল রোগের কথা আমরা শুনিতে পাই, তাহা এক একটি স্বতন্ত্র রোগ নহে, তবে তাহারা কি? তাহারা **সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস, এই তিনটীর মধ্যে একটীর বা দুটীর বা তিনটীরই একত্র সন্নিবেশজাত বিভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র।** আবার ইহাদের মধ্যে সোরার প্রাধান্য এত বেশী যে, সোরা না থাকিলে সাইকোসিস বা সিফিলিস কেহই আসিতে পারে না। অতএব এ কথা বেশ বলা যায় যে,—**সোরাই যাবতীয় প্রাচীন পীড়ার কারণ বা যাবতীয় পীড়া একমাত্র সোরারই বিভিন্ন রূপ।** এ কথা সাধারণের মনে, এমন কি, অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নামধেয় ব্যক্তিরও মনে, দৃঢ় ধারণা হওয়া বড় কঠিন। এই ধারণা হয় না কেন? অনেকেরই পর্য্যবেক্ষণ নাই বলিয়া এ ধারণা দৃঢ় হয় না। মনে করুন, কোনও ব্যক্তির সোরাদোষের জন্য গাত্রে নানা দদ্রু, চুলকানি ও খোস হইয়াছে—আপনি যদি বলেন যে, "এ গুলি বাহ্য প্রলেপ ব্যবহার করিয়া চাপা দেওয়া সঙ্গত নহে, তাহাতে নানা অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কি, তাহার ফলে দুরারোগ্য ও মারাত্মক অবস্থা আসিতে পারে,"—তাহা হইলে অনেকের নিকটেই আপনি হাস্যাস্পদ হয়েন। এক্ষণে, মনে করুন, কোনও একটী শিশুর হাম হইয়া ঐ হামের উদ্ভেদগুলি কুচিকিৎসার জন্য "লাট" খাইয়া গেল। সকলেই জানেন যে, হাম বা বসন্তরোগের উদ্ভেদগুলি বসিয়া যাইলে বা "লাট" খাইলে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। এ অবস্থায় সকলেই স্পষ্টতঃ দেখেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে "লাট" খাওয়ার ফল কত ভীষণ। শরীর মধ্যস্থ উৎকৃষ্ট যন্ত্র সকল আক্রান্ত হইয়া নানারোগ উৎপাদিত হয় এবং এমন কি, উক্ত লাট খাওয়া উদ্ভেদগুলি পুনরায় বাহিরে আনিতে সক্ষম না হইলে, শিশুটীর জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থা চক্ষের সম্মুখে দেখিলে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, যে কোনও চর্ম্মরোগ, যথা,—দদ্রু, খোস ইত্যাদি, বাহ্য প্রয়োগের দ্বারা চাপা দিলে

তাহার ফল বড় ভয়ানক, তখন আপনার কথা বিশ্বাস করিবে না, কেন না ইহাতে সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত কোনও অনিষ্ট হয় না, ইহার গতি একটু ধীর, এজন্য পর্য্যবেক্ষণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, চিকিৎসকেরাও ইহা গবেষণা করেন না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের কথা কি আছে?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, "সোরাদোষই সকল রোগের একমাত্র হেতু, অথবা নানা নামের, নানা রূপের, নানা লক্ষণের ও রোগের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহারা সকলেই সোরা, সাইকোসিস বা সিফিলিসের ১টী বা ২টীর বা ৩টীর সমষ্টিজাত বিভিন্ন মূর্ত্তি,"—এই বাক্যের মূলে কোনও যুক্তি ও প্রমাণ আছে কি না? যদি কোনও যুক্তি বা প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এজন্য এ বিষয়ের যুক্তি ও প্রমাণস্বরূপ স্থূলতঃ যাহা যাহা বলা যাইতে পারে, তাহা অগ্রে লিখিলাম। অগ্রে যুক্তির কথারই অবতারণা করা সঙ্গত, তাহার পর, প্রমাণ বিষয়ক কথা বলা হইবে।

(১) যুক্তির কথা।—ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, "কুণ্ডুয়নই" সোরার বাহ্য বিকশিত মূর্ত্তি। পূর্ব্বেই মনে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে—সেই বিশৃঙ্খলা বাহ্যদেহে বিকশিত হইয়া "কুণ্ডুয়নরূপে" প্রথমেই দেখা দেয়। এক্ষণে জিজ্ঞাসার কথা এই যে—মনোবিশৃঙ্খলা মনেই থাকিতে পারিত, বাহিরে আসার কি প্রয়োজন ছিল, বাহিরে আসিল কেন? ফলতঃ, মন হইতে বাহিরে আসার ব্যবস্থা মঙ্গলময়ী প্রকৃতিই করিয়াছেন। মনের ঐ অবস্থাটী যখন বাহিরে আসে, তখন মনের বিপর্য্যয়াবস্থার একটু লাঘব হয়, মন একটু সুস্থ হয়, ইহা প্রকৃতির নিয়ম, তাহা ছাড়া, বাহিরে আসিলে ঐ অবস্থার আরোগ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়,—এজন্য প্রকৃতিদেবীর ঐ প্রকার ব্যবস্থা।

পীড়া যখন আরোগ্যপথে যায়, তখন তাহার গতি ভিতর হইতে বাহিরে, আর যখন বৃদ্ধির পথে যায়, তখন বাহির হইতে ভিতরে,—বিশেষ লক্ষ্য করিলেই ইহা বেশ বুঝা যায়। এই সত্য চিরপ্রতিষ্ঠিত, ইহার ব্যত্যয় নাই। যদি প্রকৃতির মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আভ্যন্তরিক বিপর্য্যয়টী বাহ্য পথে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া দেহস্থ চর্ম্মে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে বহিস্থ ঐ কণ্ডূয়ন, চুলকানি বা খোসগুলিকে বাহ্য প্রলেপাদির প্রয়োগের ফলে রোগশক্তিকে পুনরায় অন্তর্মুখ করিলে অনিষ্ট ব্যতীত কি আশা করা যাইতে পারে? পুনরায় আরোগ্যপথে আনিতে হইলে ঐ গতিকে বহির্ম্মুখ না করিতে পারিলে উপায়ন্তর নাই, ইহা স্বল্প পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, যখনই বাহ্য প্রলেপাদির দ্বারা, কি অন্য কোন প্রকার কুচিকিৎসার ফলে, রোগ-শক্তি অন্তর্মুখ হইল, তখন অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রকে আক্রমণ করিয়া প্রথমে তাহার **কার্য্যদুষ্টি,** তাহার পর তাহার **আকারগত পরিবর্ত্তন** সাধন করিয়া থাকে। অবশ্য আকারগত পরিবর্ত্তনের জন্য সোরা ব্যতীত **আরও একটী দোষের** প্রয়োজন। যাহা হউক, যাঁহারা বলেন যে, উদ্ভেদ ও খোস চুলকানি গুলি কেবলমাত্র চর্ম্মের রোগ, ভিতরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা যে একেবারে ভ্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চর্ম্ম শারীরিক যন্ত্র বিশেষ এবং প্রত্যেক যন্ত্র নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এরূপ ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে সম্পাদন করে, যাহাতে সমগ্র দেহযন্ত্রখানির (দেহ+মন) সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাধীনভাবে থাকার পক্ষে প্রত্যেক যন্ত্রের দ্বারা সাহায্য হয়। **প্রত্যেক যন্ত্র নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার সময় ঐ মূল উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার দিকে তাহাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য থাকে**—এবং তাহার ব্যভিচার হইলেই দেহ-যন্ত্রে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং

বুঝিতে হইবে যে, চর্ম্ম স্বাধীন যন্ত্র নয়, ইহার উদ্দেশ্য, যাহাতে দেহযন্ত্রটী সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাধীন ভাবে চলিতে থাকে। এক্ষণে প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া দেহ-যন্ত্রখানির কল্যাণকল্পে মনের বিশৃঙ্খলাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলে অর্থাৎ কুচিকিৎসার ফলে সেই বিশৃঙ্খলায় বিকশিত মূর্ত্তিগুলি অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে, সমগ্র দেহযন্ত্র খানিকে পীড়িত হইতে হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? ইহাতে চর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র দেহেরই ক্ষতি। কেননা কোন যন্ত্রই স্বাধীন নয়—তাহারা সকলে "অঙ্গাঙ্গীভাবে" আবদ্ধ, তাহারা নিজ নিজ কার্য্য এরূপ ভাবে করে, যেন তাহাতে তাহাদের সকলের সমষ্টিগত দেহ-যন্ত্রের সম্পূর্ণ সুস্থতা, স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা সম্পাদিত হয়। এজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক যন্ত্রের পীড়া হইলে সমগ্র দেহখানি কষ্টভোগ করিয়া থাকে। অতএব, কণ্ডুয়ন, খোসচুলকানিগুলি কেবল মাত্র চর্ম্মের রোগ, এবং তাহাদের ভিতরের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। কাজে কাজেই তাহাদের উপর বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ বা অন্য কোনও প্রকার কুচিকিৎসার ফলে রোগশক্তিটী অন্তর্মুখ হইলে সমগ্র দেহটীই অসুস্থ হয় এবং অভ্যন্তরস্থ বিশেষ আবশ্যকীয় যন্ত্রগুলিকে দূষিত করিয়া নানা নামের রোগ আনয়ন করে, ইহা যুক্তির কথা, তাহার সন্দেহ নাই।

(২) **প্রমাণের কথা।**—এখন সোরা, সাইকোসিস বা সিফিলিস ইহারা একেই, বা দুই বা তিনের সংমিশ্রনই যে বিবিধ রোগের কারণ বা নিদান, অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে সোরাই একমাত্র কারণ একথার প্রমাণ কি? অনুসন্ধান করিলেই প্রমাণ পাওয়া যায়। একে একে সেগুলির যথাসাধ্য অবতারণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

(ক) প্রাচীন রোগীর চিকিৎসাকালে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগীর রোগলক্ষণগুলি পূর্ব্বে যে ভাবে ক্রমে ক্রমে আবির্ভাব

হইয়াছিল, আরোগ্যের অবস্থা আরম্ভ হইলে সেগুলি ঠিক **পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবে বা পশ্চাৎ গতিতে** পুনরাবির্ভাব হইয়া, অবসান বা আরাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এটী একটু পরিষ্কার ভাবে বলিতে হইলে উদাহরণের বিনা সাহায্যে চলিবে না, কাজেই একটী উদাহরণ দিতেছি, ইহা হইতে ইহার তথ্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে, আশা করা যায়। কোন একটী স্ত্রীলোক, তাঁহার শ্বেতপ্রদর স্রাব হইতে থাকে ও বয়স ১৯।২০ বৎসর হইলেও তাঁহার শয্যামূত্র নামক লজ্জাজনক ব্যধি তাঁহাকে বালিকা বয়স অবধি এ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন নাই। তিনি বিশেষ গুণবতী বলিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নিরাময় করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল এবং নানা চিকিৎসার পর আমার নিকট লইয়া আসেন। এ প্রকার রোগকে মহাত্মা হ্যানিম্যানের ভাষায় একাংশিক (one-sided) বলা যায়। যাহা হউক, ইতিহাস লইয়া জানা গেল, ঐ স্ত্রীলোকটীর বালিকাবস্থায় তিন বৎসর বয়সে ভয়ানক Eczema ও খোস হইয়াছিল, তাহাতে অত্যন্ত চুলকানি ও রসপড়া ছিল। তাঁহার মাতামহীর নিকট জানিতে পারিলাম যে এত আঠা আঠা রস কাটিত যে, প্রায়ই প্রাতঃকালে ঐ বালিকার দেহ শয্যার চাদরের সহিত দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া যাইত। ইহা ছাড়া, কাল কাল চেহারা ও কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার ধাতু, ইত্যাদি লক্ষণ সমষ্টি লইয়া **গ্রাফাইটিস** সি, এম দিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে ২টী অনুবটীকা, ৪ আউন্স আন্দাজ জলে দিয়া, ৩ দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটু একটু খাইতে দিই। তাহার পর, ১৫।২০ দিন পরে একবার সংবাদ দিতে বলি এবং কোনও পরিবর্ত্তন বোধ করিলে তাহার পূর্ব্বেই সংবাদ দিবার কথা উপদেশ দিই। আমি তখন আদৌ জানিতাম না বা কেহই আমাকে অবগত করেন নাই যে, তাঁহার স্বামীর কোনও দিন গনোরিয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে বালিকা পত্নী এই পীড়াও পাইয়াছিলেন এবং কোনও প্রকারে সে পীড়ার লক্ষণাদি চাপা

দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৮।১৯ দিন পরে সংবাদ জানিলাম যে, রোগিনীর জ্বালাযুক্ত স্রাব হইতেছে এবং সামান্য জ্বরও হইয়াছে, গিয়া দেখিলাম, ও বেশ বুঝিতে পারিলেও বলিতে ততটা সাহস হইল না যে উহা গনোরিয়ার স্রাব। ফলতঃ, "ইহার কারণ কি ?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পরেই তাঁহার স্বামী মহাশয় মুক্তকণ্ঠে সকল কথা প্রকাশ করিলেন। আমি রোগীনীকে কেবলমাত্র ৪।৫টী সাদা মোড়ক দিয়া আসিলাম। এই কষ্টে আরও ৮।১০ দিন ভুগিবার পর (মোটের উপর প্রায় এক মাসের পর) রোগীনীর সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার বালিকা বয়সের সেই চর্ম্মরোগ আসিয়া দেখা দিল, ইহাতে রোগীনী ভীতা হয়েন, তবে তাঁহার অন্য লক্ষণাদির সুবিধা বোধ হওয়ায়, আমি যে বাহ্যপ্রয়োগ করিবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা অমান্য হয় নাই। কিছু দিন পরে **সিপিয়া** ৫০ এম দিতে হয়। যাহা হউক, সে সকল বিস্তৃত ইতিবৃত্ত এস্থলে লিখিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে বসপড়া ভাব গিয়া যখন শুষ্কভাব দেখা দিল, তখন **সিপিয়া** এবং সর্ব্বশেষে **সালফার** দিতে হইয়াছিল। এই রোগীতত্ত্বটী দিবার উদ্দেশ্য এই যে, **উচ্চশক্তি প্রয়োগ করিলে কিরূপে প্রকৃত হোমিওপ্যাথি সূত্রানুসারে নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়ায়, রোগীর পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল রোগলক্ষণ কুচিকিৎসা হেতু লুপ্ত হইয়া রোগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা একে একে পশ্চাৎ গতিতে পুনরুদ্দীপ্ত হয়** এবং তাহা দ্বারাই **বেশ প্রমাণ হয় যে, আদি রোগ** কেবল মাত্র **সোরা।** এই ক্ষেত্রে যদিও গনোরিয়া বিষও রোগিনীর দেহে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু তাহাও উক্ত শক্তীকৃত ঔষধের ক্রিয়ায় পুনরাবির্ভাব হইয়া সারিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্বভাবে সর্ব্ব প্রথমের সোরা দোষের বাহ্য বিকশিত মূর্ত্তিস্বরূপ চর্ম্মরোগ, তাহাও

আসিয়া দেখা দিল ও আরোগ্য হইল। ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। নিজ নিজ চিকিৎসার ফল গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকলেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই। তবে দুইটী জিনিষ প্রয়োজন—১। বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি সূত্রনুসারে নির্ব্বাচন এবং ২। উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগ। নিম্ন শক্তিতে এ ফল আশা করা একেবারে অসম্ভব। এ বিষয় পরে চিকিৎসা ভাগে আরও বিশদভাবে লিখিত হইবে।

(খ) অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে,—কোনও ব্যক্তি বাহ্যতঃ দেখিতে বেশ সুস্থ, তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না যে, তাহার কোনও প্রকার অসুস্থতা আছে,—একদিন হয় ত সামান্য কোনও কারণে, যথা একটু সাঁতার দেওয়া, কিম্বা বৃষ্টির জলে ভিজা, বা কোনও একটা মন্দ সংবাদ পাওয়া, অথবা সামান্য গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ,—এই প্রকারের কোনও একটী কারণে তাহার শরীর অসুস্থ হইল, তখন সে ব্যক্তি মনে করে, "ইহা কি হইয়াছে" ? ২।৩ দিনেই সারিয়া যাইবে। "কিন্তু এই সামান্য কারণে সে ব্যক্তি হয়ত, একটার পর একটা, তাহার পর আরো একটা, এরূপ নানা অসুখ ক্রমাগতই ভোগ করিতে থাকে"। লোকেও মনে করে—"এমন কি অত্যাচার হইয়াছে যে, সে ব্যক্তি এত দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা রোগ ভোগ করিতেছে ?" এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,—যে পরিমাণে অত্যাচার, তাহা অপেক্ষা তাহার ভোগের পরিমাণ অনেক বেশী। বেশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এই প্রকার ক্ষেত্র হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সামান্য অত্যাচার তাহার রোগের **প্রকৃত কারণ** নয়। প্রকৃত কারণ ঐ ব্যক্তির দেহে সুপ্তভাবে ছিল, ঐ সামান্য কারণে বা অত্যাচারে **ঐ সুপ্তশক্র জাগরিত হইয়াছে মাত্র**। নতুবা, এত প্রবলভাবে দুঃখভোগের কারণ যে ঐ সামান্য অনিয়ম বা অত্যাচার,

ইহা বলা যায় না। দেহাভ্যন্তরস্থ ঐ সুপ্ত শত্রু,—**সোরা ব্যতীত আর কেহই নয়।**

(গ) প্রাচীন পীড়ার স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শত শত বাহিরের প্রতিকার সত্ত্বেও, ইহার যেন, **আরোগ্য হইবার প্রবৃত্তি নাই।** অনেক সময় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, নানা ভাবে ও নানা রূপে দেখা দেওয়াই ইহার স্বভাব, এবং নিয়ম, পথ্য, স্থান পরিবর্ত্তন প্রভৃতি প্রতিকারে বিশেষ কোনও ফল হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দৃশ্যমান রোগলক্ষণ সকলকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য, বা তাহাদের স্থায়ী অবলম্বন স্বরূপে, এমন একটী কিছু আছে যে, তাহাকে স্থায়ীভাবে দূর করিতে হইলে, এ সকল প্রতিকার যথেষ্ট নয়। অভিনয়, ছায়াবাজী প্রভৃতিতে একজন লোক যেমন অন্ধকারে বসিয়া কেবল পটপরিবর্ত্তন করিতে থাকে, সেই লোককে দেখা যায় না, কেবল একটীর পর একটী পটের পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হয়, ঠিক সেইরূপ সোরা নিজে লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া মানবদেহে রোগলক্ষণ সকলের ক্রমাগত যেন এক একটী চিত্র পরিবর্ত্তন করিতেছে। সেই লোকের তিরোধান না করিতে পারিলে, পটপরিবর্ত্তন কার্য্য চলিতেই থাকিবে, সে কার্য্যের নিরাকরণ আদৌ হইবে না।

(ঘ) বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের ত কথাই নাই, এমন কি, সাধারণ লোকেও অনেক সময় দেখিতে পাইয়া থাকেন যে, একটী লোক নানাপ্রকার রোগলক্ষণ হইতে কষ্ট পাইতেছেন, এরূপ সময় যদি কোনও প্রকারে তাঁহার শরীরে কতকগুলি খোস্ চুলকানি দেখা দেয়, তাহা হইলে ঐ সকল রোগলক্ষণ যেন আশ্চর্য্যরূপে হঠাৎ প্রশমিত হইয়া থাকে,—এজন্য মুসলমানেরা খোস্ চুলকানিকে—"খোদার মেহেরবানি" বলিয়া থাকেন। ইহার দ্বারাও বেশ প্রমাণ হয় যে, রোগলক্ষণ সকল এবং খোস চুলকানি, **একই কারণ,** অর্থাৎ সোরা হইতে উৎপন্ন।

নিজ নিজ রোগীদের চিকিৎসাকালে, রোগীর লক্ষণ সমষ্টির উপর নির্ব্বাচিত সমলক্ষণসূত্রের ঔষধ উচ্চশক্তিতে প্রয়োগ করার পর, বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এসকল সত্য নিজের মনে আপনিই প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাহা না করিলে, অন্য প্রমাণ যতই বাহির করা হউক না কেন, ঠিক ঠিক উপলব্ধি হইতে পারে না। যাহা হউক, ইহা ব্যতীত আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, তবে প্রধানতঃ যেগুলি পাওয়া যায়, তাহাই দেওয়া হইল।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রাচীন পীড়া কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃতি কিরূপ, এবং কারণ,—প্রকৃত প্রস্তাবে কি, এবং তাহার ২।৪টী স্থূল প্রমাণ, এগুলি বিবৃত করা হইয়াছে।

এক্ষণে আরও একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে, প্রাচীন পীড়ার **চিকিৎসা** বিষয় লেখা আদৌ সঙ্গত হইবে না বুঝিয়া অগ্রে সেই বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা দেখিয়াছি যে, সোরার প্রাথমিক বিকশিত মূর্ত্তি, মানবদেহে খোস্ চুলকানিরূপে দেখা দেয়, এবং ঐ খোস্ চুলকানিগুলিকে দেহযন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র এবং কেবলমাত্র **স্থানীয় অর্থাৎ চর্ম্মেরই রোগ**, ইহা মনে করিয়া বাহ্য প্রলেপাদি দ্বারা তাহাদিগকে চাপা দিবার ফলে, তাহারা আরোগ্য না হইয়া অবরোধ প্রাপ্ত হয়, এবং রোগশক্তিটী অন্তর্মুখ হইয়া নানা প্রকার রোগলক্ষণের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব প্রাথমিক মূর্ত্তি দেখা দিবার পরেই যদি চাপা দেওয়া না যায়, তবে ততটা অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না—এবং ঐ অবস্থায় যদি প্রকৃতভাবে আরোগ্যকারী ঔষধ দেওয়া হয়, তবে সোরা ঐ অবস্থাতেই নির্ম্মূল হইয়া যায়, এবং মানবের এত প্রকারের দুঃখ ও কষ্টের হাত হইতে মুক্তি হইতে পারে। অতএব, **কি কি কার্য্যে "চাপা দেওয়া"** ঘটে, তাহা জানা কর্ত্তব্য, কেননা তাহা জানা না থাকিলে তাহার নিবারণও সম্ভব নহে। এজন্য

যে যে প্রতিকার প্রকৃতপক্ষে আরোগ্যমূলক নহে, এবং যাহাদিগকে "চাপা দেওয়া" বলা যায়, সেই সেই প্রতিকারগুলি বা কার্য্যগুলি কি কি, অর্থাৎ কি করিলে রোগ আরোগ্য না হইয়া কেবল মাত্র চাপা পড়ে বা অবরোধ প্রাপ্ত হইয়া রোগশক্তিকে অন্তর্মুখ করিয়া ফেলে, সেগুলি বিশেষ ভাবে জানা ও তন্নিবারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"চাপা দেওয়া" চিকিৎসা।

অতঃপর, যে যে কার্য্য করিলে, রোগীকে প্রকৃত আরোগ্য না করিয়া কেবল মাত্র তাহার দ্বারা রোগশক্তিকে অন্তর্মুখ করা হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলে নানা প্রকার জটিল হইতে জটিলতর রোগলক্ষণ সকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই সেই কার্য্য বা অচিকিৎসা, কুচিকিৎসা ইত্যাদির আলোচনা করিব। কেননা প্রথমেই সে গুলির হাত এড়াইতে পারিলে অনেক যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ হইবে।

১। যে সকল কার্য্যে ঐ প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান—**বাহ্য প্রলেপ**। আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে, খোষ, চুলকানি বা উদ্ভেদ যাহা আমাদের ত্বকের উপরিভাগে দেখা দিয়া থাকে ও **দারুণ কণ্ডুয়ন উপস্থিত করে**, তাহাই **আভ্যন্তরীণ "সোরার" বাহ্য বিকশিত** মূর্ত্তি। ঐ কণ্ডুয়নযুক্ত উদ্ভেদ, যাহাকে লোকে সাধারণতঃ "চর্ম্মরোগ" কহে, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে চর্ম্মরোগ নহে, সে গুলি **সমগ্র দেহের রোগ**, তবে চর্ম্মোপরি **প্রকাশ** পাইয়া থাকে মাত্র। লোকে তাহা বুঝে না, তাহারা ধারণা করে, এই সকল উদ্ভেদাদি কেবলমাত্র **চর্ম্মেরই স্বতন্ত্র রোগ**, এবং ইহাদের চিকিৎসা বাহ্য প্রলেপাদির দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে করা উচিৎ। তাহাদের এ ধারণা অন্যান্য মতের চিকিৎসকগণই করিয়া দিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই প্রকারে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, যাঁহারা বাহ্য প্রলেপের দ্বারা তাঁহাদের তথাকথিত "চর্ম্মরোগ"

গুলিকে লুপ্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে রোগীর ঘোরতর অনিষ্ট করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি এবং পুনরায় কহিতেও দোষ নাই যে, লোকে যেখানে রোগীর হাম বা বসন্ত **শীতল বাতাসে** অথবা **জোলাপাদির দ্বারা "লাট" খাইয়া যায়,** সেখানে বুঝিতে পারে,—কেননা সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্টই দেখিতে পায় যে, রোগীর পক্ষে তাহা কি বিপদের কথা, এমন কি, অনেক সময় ঐ হাম বা বসন্ত পুনরায় বাহির করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণের আশাই থাকে না। কিন্তু তাহাদের তথাকথিত "চর্ম্মরোগ" চাপা পড়িলে যে ঐ প্রকার ভয়ানক অনিষ্ট হইবে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না—কেননা ইহার ফল সঙ্গে সঙ্গেই হয় না, কিছুদিন বিলম্বে হয়। কাজে কাজেই, বাহ্য প্রয়োগাদির দ্বারা **চিকিৎসা** হওয়া ত দূরের কথা, ইহাদের দ্বারা নানাবিধ **দুরারোগ্য রোগলক্ষণকে ডাকিয়া আনা হয়** মাত্র, একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য মতের চিকিৎসকগণ, বিশেষতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ, বাহ্যমূর্ত্তি লোপ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত, তাহার পর যখন অন্য লক্ষণ আসিয়া পড়ে, তখন তাঁহারা কহেন যে, এটী একটী **নূতন ও স্বতন্ত্র** রোগ, অতএব ইহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা কর্ত্তব্য, ফলে, রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে আসিতে থাকে। আমি জানি, পুরুলিয়ার একটী খৃষ্টান বালকের পায়ে একজিমা হয়, তাহা বাহ্য প্রয়োগে লোপ করায় ৩।৪ মাস পরে তাহার দুরারোগ্য উদরাময় হয়; দুর্ব্বলতা, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, দারুণ মানসিক অবসাদ, মলে গোটা গোটা খাদ্যদ্রব্যের কুচি, দুর্গন্ধ মল ইত্যাদি লক্ষণ পাওয়ায় তাহাকে ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হয়। ফলতঃ কিছুইতেই যখন উপশম হইল না, তখন রোগী আমার হাতে আসে, ও **সোরিনাম** ১০০০ শক্তি দেওয়ার পর সেই একজিমার পুনরাবির্ভাব হয় ও তৎসঙ্গে তাহার উদরাময় ও অন্যান্য লক্ষণের তিরোভাব ঘটে। এই প্রকার

অনেক চিকিৎসক, যাঁহারা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিকসূত্রে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন ও নিজ নিজ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে জানা গেল যে, **সোরার বাহ্য বিকশতি মূর্ত্তিকে চাপা দেওয়ার ফলে অনেক অনিষ্ট হয়।** এতৎ ব্যতীত, **গনোরিয়া ও সিফিলিসের বাহ্য বিকশিত মূর্ত্তিগুলিকে চাপা দিলেও সেই প্রকার বা তাহা-পেক্ষা আরও গুরুতর অনিষ্ট হয়,—স্মরণ রাখিতে হইবে। গনোরিয়ায় স্রাব হইতেছে, সেজন্য রোগীও যাহাতে গোপনে স্রাবটী বন্ধ হয়, এজন্য ব্যস্ত,** এবং চিকিৎসকও, যাহাতে তাহা বন্ধ হয়, তাহাই করেন, যেহেতু তাহা হইলেই তিনি "আরোগ্য" করিবার জন্য প্রশংসাভাজন ও পারিতোষিকের পাত্র হইবেন, এজন্য তিনিও ব্যস্ত, কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জেকসন দিয়া বন্ধ করা হয়, ফল যাহাই হউক না কেন? ইহার ফল যে কি ভয়ানক, তাহা বর্ণনা করিবার নয়। ব্যাধিযুক্ত বারাঙ্গনার সহিত গোপন সহবাসে ঘৃণিত **সিফিলিসও** ঐ প্রকার ইঞ্জেকসন দ্বারা অথবা বাহ্য প্রয়োগে, উপস্থিত "আরাম" করা হয়। এই প্রকারে সোরা, গনোরিয়া এবং সিফিলিস প্রত্যেকটীকে অন্যায়ভাবে বাহ্য প্রয়োগে চাপা দেওয়া হইতেছে, ফলতঃ ইহাতে রোগীও সন্তুষ্ট এবং চিকিৎসক মহাশয়ও বিশেষভাবে গৌরবান্বিত, যদিও ইহার ফল **বংশানুক্রমিক চলিতে থাকে** এবং উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধি আনিয়াও নিবৃত্তি হয় না। এই ত গেল,—সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিসের **প্রথম** বিকশিত মূর্ত্তি চাপা দিবার কথা, ইহার উপর আবার **বার বার ঐ প্রকার চাপা দিবার ফলে** যে সকল ব্যাধি আসে (**অর্থাৎ** Secondary ও Tertiary) **তাহাদিগকেও চাপা দেওয়া**

হইয়া থাকে, আবার, ইহাকেই লোকে ও চিকিৎসকগণ **"চিকিৎসা"** কহেন, এবং এই প্রকার চিকিৎসার জন্য জনসাধারণ লালায়িত ও সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

উপরোক্ত ভাবে চাপা দেওয়ার ফল যে কতদূর অনিষ্টজনক, তাহার সামান্য অভ্যাস দেওয়া হইল মাত্র, বিষদভাবে লিখিতে হইলে এক জীবনে শেষ হইবার নহে। তাহা ছাড়া, উপরে এক একটীর অর্থাৎ সোরা, গনোরিয়া ও সিফিলিসের **স্বতন্ত্র** ভাবে চাপা দেওয়া হইলে কিরূপ ফল হইতে পারে, তাহারই ইঙ্গিত করা হইল, কিন্তু ইহারা মানব শরীরে কখনই একা একা অথবা স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না, প্রায়ই পরস্পর **মিলিত** হইয়া থাকে, অতএব যখন এক একটীর বাহ্য মূর্ত্তি চাপা দেওয়াই এত অনিষ্টজনক, তখন ইহারা দুইএ দুইএ বা একত্রে তিনটীই যে শরীরে মিলিত হয়, সে শরীরের রোগ লক্ষণের চাপা দিবার ফল যে কি ভয়ানক, তাহা অনুমান কয়া যায় না। সোরা, গনোরিয়া ও সিফিলিসের আদি মূর্ত্তি চাপা দিলে কি কি রোগলক্ষণ আসিয়া থাকে এবং তাহা হইতে কি ভাবে ২য় পর্য্যয় এবং ৩য় পর্য্যায়ের রোগলক্ষণ সকল (Seconday & Tertiary) আসিয়া থাকে, তাহা ছাড়া, যে কোন দুইটী বা তিনটীরই একত্র সমাবেশ হইলেই কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে হইলে, সেগুলি জানা বিশেষ আবশ্যক, এজন্য সেগুলি বিশদভাবে লিখিত হইবে।

২। আর একপ্রকারের কুচিকিৎসার ফলে রোগলক্ষণ চাপা পড়ে —তাহা অনেকের জানা নাই, সেটা **অবৈধ অস্ত্রপ্রয়োগ।** যেখানে অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবার **ক্ষেত্র** নয়, সেখানে অস্ত্র-চিকিৎসা করিলে রোগশক্তি অন্তর্ম্মুখ হইয়া যন্ত্রান্তর আক্রমণ করে ও আরও গুরুতর রোগ আনিয়া থাকে। কোন্‌টী প্রকৃত অস্ত্রচিকিৎসার ক্ষেত্র, জানিতে হইবে, নতুবা যখন তখন বা যে

কোনও রোগে অস্ত্র চিকিৎসা হইলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

৩। তৃতীয় শ্রেণীর "চাপা" দেওয়ার ক্ষেত্রটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে উগ্রবীর্য্য ঔষধ, যথা,—**কুইনাইন, আর্সেনিক** প্রভৃতির দ্বারা, জ্বরকে আরোগ্য না করিয়া, চাপিয়া দিলে যে কি ফল হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন ও নিত্যই দেখিতেছেন। জ্বরলক্ষণ যেমনই হউক না কেন, সে বিচার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, জ্বরটী কোনও প্রকারে বন্ধ করাই আবশ্যক, তাহাতে রোগীও সন্তুষ্ট ও চিকিৎসকও ধন্য হইয়া থাকেন। রোগী কিন্তু **সারে** না, ক্রমে তাহার **যকৃৎ, প্লীহাদি যন্ত্র বড় হয়, উদরাময়, শোথ ইত্যাদি দেখা দেয়, কাহারও বা যক্ষ্মা।** অথবা ঐ জাতীয় রোগলক্ষণ আসিয়া রোগীর জীবন শেষ করিয়া ফেলে।

৪। কেহ মনে করিবেন না যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দ্বারাও "চাপা" দেওয়ার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দ্বারাও "চাপা" দেওয়া হইতে পারে। মনে করুন, কাহারও কোনও একটী রোগ লক্ষণ মধ্যে মধ্যে উদয় হয়, অথবা কাহারও ৮।১০।১২টী রোগ লক্ষণের মধ্যে ২।১টী অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছে, সেখানে **আংশিক ভাবে সাদৃশ্যযুক্ত** কোনও ঔষধ প্রয়োগেও **চাপা দেওয়া** হইয়া থাকে, কেননা এই ক্ষেত্রে ঔষধটীর নাম "হোমিওপ্যাথিক" ঔষধ হইলেও, তাহা প্রকৃত **হোমিওপ্যাথিক** সূত্রে প্রযুক্ত না হওয়ায়, তাহার ক্রিয়া **হোমিওপ্যাথিক** হয় না। হোমিওপ্যাথিক বাক্স হইতে ব্যবহৃত হইলেই, অথবা হোমিওপ্যাথিক মতে কোনও চিকিৎসা ব্যবসায়ীর দ্বারা প্রযুক্ত হইলেই যে হোমিওপ্যাথি হইবে, তাহা নয়। ঔষধকে হোমিওপ্যাথি বলিতে হইলে অনেক বিষয় প্রয়োজনীয়। প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক নিয়মে ব্যবহার হইলে, তবেই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক সূত্রে "আরোগ্য" আনয়ন করে, নতুবা "চাপা" দেওয়াই

হইয়া থাকে, অর্থাৎ **রোগলক্ষণগুলির** কোনও প্রকারে কিছুদিনের জন্য তিরোভাব হইলেও, **রোগী** সারে না। রোগলক্ষণগুলি যাইলেই যে রোগী সারিবে, এরূপ আশা সকল স্থলে করা যায় না,--যেখানে **রোগী** সারিল অতএব রোগলক্ষণগুলি চলিয়া গেল, সেখানেই প্রকৃত **হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য**, অন্যথা, হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য নহে, কেবলমাত্র রোগ-লক্ষণগুলির কিছুদিনের জন্য অপসারণ হইয়া থাকে মাত্র। তবে একটা কথা আছে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রকৃতভাবে প্রয়োগ না হইবার ফলে যে "চাপা দেওয়ার" কথা লিখিত হইল, তাহাতে বিশেষ কোনও কুফল হয় না, কেবল রোগী সারে না, এই পর্য্যন্ত, কিন্তু অন্যান্য তিন দফার বর্ণিত চাপা দেওয়া চিকিৎসার ফল যত ভয়ানক এবং যেরূপ রোগান্তরের সৃষ্টি করে, অথবা যেরূপ ভাবে যন্ত্রান্তর আক্রমণ করে, ইহাতে সে ভয় নাই; তবে রোগিটী সারে না এবং তাহার রোগটীকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে সময় দেওয়া হইয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত। আমরা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে হোমিও-প্যাথ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদের হাতে যেন এই ৪র্থ দফায় বর্ণিত "চাপা দেওয়া" চিকিৎসাও না হয়। রোগীই প্রধান লক্ষ্য, এবং **রোগী** সারিলে রোগলক্ষণগুলিই অবশ্যই যাইবে এবং প্রকৃত আরোগ্য হইবে।

"চাপা দেওয়া চিকিৎসা" এইরূপ অনেক প্রকার হইতে পারে, তবে ২।৪টী মাত্র এখানে বর্ণনা করিলাম। ইহা হইতেই জিজ্ঞাস্য হইবে যে, প্রকৃত আরাম কাহাকে কহে। **প্রকৃত আরোগ্য** যাহাতে হয়, যদি সেই চিকিৎসা অবলম্বন করা হয়, তবে "চাপা" পড়ার ভয় থাকে না। সাধারণতঃ লোকে **রোগলক্ষণের তিরোভাবকেই** আরোগ্য কহে। **কিন্তু যে কোনও প্রকারে** রোগলক্ষণের তিরোভাবকে প্রকৃত আরোগ্য বলা যায় না। প্রকৃত আরোগ্যের পূর্ব্ব সূচনা কি, লক্ষণ কি, পরীক্ষা কি ইত্যাদি বিষয় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত আরোগ্য।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, রোগীর রোগলক্ষণের যদি তিরোভাব হইল অথবা রোগী মরিল না, অথবা এক ব্যাধিলক্ষণ হইতে অন্য ব্যাধিলক্ষণ আসিয়া জুটিল, তাহা হইলে পূর্ব্বব্যাধি অবশ্যই আরোগ্য হইয়াছে। ঐরূপ ধারণার হেতু প্রধানতঃ এই যে, হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য কোনও প্যাথিতে "**রোগী**" **আরোগ্যের কথা নাই**, "রোগ" আরোগ্য করিতে হয় এবং তাহাই সম্ভব, ইহাই লোকে জানে। চিকিৎসকও বলেন—"জ্বর ত সারাইলাম, কিন্তু হাঁপানি হইল, তা আর কি করা যাইবে, এত ব্যস্ত হইবার কোনও কারণ নাই. এটী একটা স্বতন্ত্র রোগ।" অথবা "বসন্তরোগ ত ভাল করিলাম, কিন্তু রক্তামাশয় হইয়াছে, উহা একটী স্বতন্ত্র রোগ, ইহা চিকিৎসা করিলেই সারিবে", ইত্যাদি। সুতরাং সাধারণ লোকে যে ঐরূপ বিশ্বাস করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যায়,—কেহই **স্বতন্ত্র** রোগ নয়, **নামগুলি** কেবল স্বতন্ত্র। ফলতঃ **রোগীই** চিকিৎসার বিষয়, রোগী জ্বরের সময়ও যে অসুস্থ ছিল, জ্বর সারিবার পর হাঁপানি অবস্থাতেও সেই ভাবেই অসুস্থ আছে, অথবা বসন্ত অবস্থাতে রোগী যেমন পীড়িত ছিল, বসন্ত সারিবার পর রক্তামাশয়ের অবস্থাতেও সেই প্রকারই পীড়িত। রোগী কোনও অবস্থাতেই সুস্থ হইতে পারে নাই, **রোগীর** দিকে চিকিৎসকের নজরই পড়ে নাই। চিকিৎসকও জানেন, লোকেও জানে যে, যে কোনও প্রকারে রোগ লক্ষণ যাইলেই হইল, অথবা রোগী **না মরিলেই**—চিকিৎসাও হইল, আরোগ্যও হইল।

প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে বলে? প্রকৃত আরোগ্যের **লক্ষণ** কি? **পূর্ব্বসূচনা** কি?—ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে না জানিয়া প্রাচীন বা তরুণ পীড়া চিকিৎসা করা সঙ্গত নয়।

প্রথম কথা—একটী নির্জীব যন্ত্র, যথা, জলের কল, কি কাপড়ের কল, কিম্বা জাহাজের কল খারাপ হইলে, তাহা মেরামত করা ও মানুষের পীড়া আরাম করা, কি একই জিনিষ? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে,—না, এক জিনিষ নয়। একটী নির্জীব যন্ত্র কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশের **সমষ্টি** মাত্র, মানবদেহ তাহা নয়। জড় জাতীয় একটী কলের কোনও অংশ খারাপ বা বিকল হইলে, সেটী মেরামত করিবার পর গোটা যন্ত্রটী কার্য্যকর হইয়া থাকে, জীবদেহ তাহা নয়, কেননা জীবদেহ কতকগুলি অংশের**সমষ্টি মাত্র নয়**, তাহা ছাড়া আরও কিছু আছে। কি আছে? মন আছে, চৈতন্য আছে। পীড়িত অংশে পীড়ালক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে অগ্রে **মনে পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে**, কেননা মনই দেহযন্ত্রের চালক, মন বিকল না হইলে দেহ বিকল হয় না। সর্ব্বপ্রথমেই মনে বিকৃতি দেখা দেয়, তাহার পর যন্ত্রবিশেষে ঐ বিকৃতি বিকশিত হয় মাত্র। **মানবদেহটী মানবমনেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র**। সুস্থ অবস্থায় কোনও বিশৃঙ্খলা থাকে না। **বিশৃঙ্খলা আগেই জীবনীশক্তিতে আবির্ভাব হয়**, এবং **মনেই তাহার প্রথম ঝঙ্কারটী অনুভব করে, তাহারই প্রতিবিম্ব মাত্র দেহযন্ত্রে দেখা দেয় ও তখনই স্থূল চক্ষে সকলে দেখিতে পায় যে, পীড়া হইয়াছে**। মনের বিশৃঙ্খলা না যাইলে, দেহের রোগ যাইবে কেন? কাজেই প্রকৃত আরোগ্য পথে, আগেই **মন** আরোগ্য হইবে, সর্ব্বশেষে দেহের পীড়া, যাহা স্থূল চক্ষের বিষয়ীভূত, তাহা অপসারিত হইবে। মানবদেহকে নির্জীব যন্ত্রমাত্র মনে ধারণা করিয়া দেহের অংশবিশেষকে মেরামত করিবার ব্যবস্থা দ্বারা মানবকে সুস্থ করিবার আশা করা বাতুলতা মাত্র। আগে মন আরোগ্য হইলে,

অর্থাৎ তাহার যে শৃঙ্খলাটী কোনও কারণে নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, সেই শৃঙ্খলা দেহযন্ত্রে প্রেরিত হয়, অতএব দেহ সারে। যদি প্রকৃত আরোগ্য প্রয়োজন হয়, অগ্রে দেখিতে হইবে, মনের উন্নতি হইল কিনা, যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে জানিতে হইবে যে, অরুণোদয় হইয়াছে, সূর্য্য উঠিবার দেরী নাই, পীড়া আরাম শীঘ্রই হইবে। আর যদি মনের উন্নতি না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, রোগী প্রকৃত আরোগ্যের পথে যায় নাই। একটী সামান্য উদাহরণ দেখিলে ঐ তত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম হইবে। **রাসটক্সের কিম্বা আর্সেনিকের কোনও রোগীতে ঔষধ দিবার ২।১০ মিনিট পরেই সর্ব্বাগ্রে রোগীর অস্থিরতা যায়, তাহার পর দৈহিক বা বাহিরের লক্ষণ যায়।** যদি তাহাই হয়, তবে জানিতে হইবে, ঠিক মত ঔষধ নির্ব্বাচন হইয়াছে এবং রোগী প্রকৃত আরোগ্যের পথে আসিতেছে। এজন্য সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা একটী জীবদেহ চিকিৎসা করিয়া থাকি, **যে দেহের চালক হইতেছেন মন।** উন্নতি আগে মনে আরম্ভ হইতে হইবে, এবং মন হইতে দেহে উন্নতি আসিবে, নতুবা জোর করিয়া আফিং দিয়া উদরাময় লক্ষণটীকে চাপা দিলে, তাহাকে **আরোগ্য** বলা যাইতে পারে না। যদি পীড়ালক্ষণের তিরোভাবের পূর্ব্বেই বা সঙ্গে সঙ্গেই রোগী নিজে **স্বচ্ছন্দ** বোধ না করে, তবে প্রকৃত আরোগ্য হয় নাই, স্থির জানিতে হইবে। চিকিৎসকের কার্য্য কি? **চিকিৎসকের কার্য্য,—রোগীকে সুস্থ** এবং **স্বচ্ছন্দ করা** ও তাহার রোগলক্ষণ যাইলে **সে নিজে** যদি সুস্থ বোধ করে, তবেই আরোগ্য হইল, নতুবা নহে। এই একটী বিষয় বিস্তারিত ভাবে উদাহরণ প্রভৃতি দিয়া লিখিতে হইলে তাহাতেই একখানি পুস্তক হইতে পারে, বিষয়টী এত গভীর ও প্রয়োজনীয়। কোনও সময় ধানবাদের একটী সম্ভ্রান্ত উকীলের পত্নী পঞ্চম মাস গর্ভাবস্থায় জ্বর ও উদরাময়ে পীড়িতা

হন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য স্থানীয় ৩।৪টী এলোপ্যাথিক ডাক্তার নিযুক্ত হন, ও তাঁহাদের ঔষধ ও ইন্‌জেক্‌সনের ফলে সপ্তম মাসে ঐ রোগিনীর গর্ভটী স্রাব হইয়া যায়, এদিকে রোগিনীর অবস্থাও ক্রমে খারাপ হইতে থাকে। প্রসবের ১৫।১৬ দিন পরে যখন মৃত্যু আসন্ন, তখন আমাকে ডাকা হয়, আমি গিয়াই রোগিনীর জীবনীশক্তির বড় অভাব দেখিয়া আশ্বাস দিতে পারিলাম না—তবে "অবস্থানুসারে আপনি ঔষধ দেন, ফলাফল যাহা হইবার হউক" ইত্যাদি বলিয়া অনুরোধ করায়, আমি লক্ষণানুসারে মিউরিএটিক এসিড দিই, তাহাতে এক দিনের মধ্যে অনেক লক্ষণের উন্নতি দেখা গেল, কিন্তু, হায়! রোগিনীর অস্বচ্ছন্দতা গেল না। রোগলক্ষণের উন্নতি দেখিয়া অপর সকলে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলিতে বাধ্য হইলাম যে, উহা উন্নতি নয়, রোগিনীর অবস্থা খারাপ এবং বাস্তবিক সেই দিনেই ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া তিনি মারা যান। তাঁহার তখনকার অবস্থা চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রে ঔষধ নির্ব্বাচনের কোনও দোষ ছিল না। আমার এই উদাহরণের উদ্দেশ্য এই যে, রোগলক্ষণের উন্নতির পূর্ব্বেই বা সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি না হইলে তাহা আরোগ্য নয়। ইহারই প্রমাণ জন্য এই ঘটনা বিবৃত করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা।

অতএব বুঝা গেল যে, ঔষধ প্রয়োগের পর **মানসিক উন্নতি** সর্ব্বাগ্রে দেখা দিলে জানিতে হয় যে, প্রকৃত আরোগ্য আরম্ভ হইয়াছে এবং যদি তাহা না হয়, তবে অন্যদিকে যতই সুবিধা বোধ হ'উক না কেন, প্রকৃত আরোগ্য আশা করা যাইবে না। কেন? যেহেতু **রোগী নিজে** স্বচ্ছন্দ বোধ না করিলে জানিতে হইবে, ঔষধের আরোগ্যকারিণী ক্রিয়া আরম্ভই হয় নাই। **মনেই যখন রোগের প্রথম আবির্ভাব,** তখন আগেই সেখানে ক্রিয়া প্রকাশ হইলে তবেই জানা যায় যে, প্রকৃত আরোগ্য আরম্ভ হইয়াছে। এ অবস্থায় অনেক সময় হয়ত বাহ্য রোগলক্ষণের কোনও উপশম হইল না, এমন কি, বৃদ্ধিও হইতে পারে, কিন্তু যদি এ সকল সত্ত্বেও মনের প্রফুল্লতা আসিয়া থাকে, তবে জানিতে হইবে যে, রোগ প্রকৃত আরামের দিকে চলিতেছে ও চলিবে। অতএব **মানসিক উন্নতিই প্রকৃত আরোগ্যের প্রথম সূচনা,—জানিতে হইবে।** কিন্তু যদি মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর রোগলক্ষণ সকলেরও উন্নতি দেখা যায়,—তবে ত "সোনায় সোহাগা।" ফলতঃ **মানসিক উন্নতি সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজনীয়।**

২য় কথা—আরোগ্যের **প্রথা ও প্রকার।** প্রকৃত আরাম হইবার পূর্ব্বে এবং সেই উদ্দেশ্যে যে ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে, তাহার ক্রিয়া,—**অতি দ্রুত, কোমল ও স্থায়ী হওয়া উচিত।** মহাত্মা হানিম্যান কহিয়াছেন—"rapid, gentle and permanent restoration of health," অর্থাৎ দ্রুত, মৃদু ও স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যের

পুনরানয়ন। স্বাস্থ্যটীকে অর্থাৎ রোগীর স্বচ্ছন্দতাটীকে আনিতে হইবে, ফলতঃ কেবলই তাহা নয়,—কি **ভাবে** আনিতে হইবে? **দ্রুতভাবে, মৃদুভাবে,** এবং **স্থায়ীভাবে।** দেখা যায়, অনেক সময় জোর করিয়া রোগলক্ষণগুলিকে অপসারিত করা হয়, যেমন দদ্রু, খোস, চুলকানি ইত্যাদিকে উগ্রবীর্য্য ঔষধাদি প্রলেপের দ্বারা ২।১ দিনের মধ্যে সরাইয়া দেওয়া হয়, অথবা অবিরাম জ্বরের প্রারম্ভে অনেক সময় জোর করিয়া জোলাপাদি দিয়া বা ঘর্ম্মকারক ঔষধাদির দ্বারা, অথবা কুইনাইন প্রভৃতি উগ্রভেষজ প্রয়োগ করিয়া, জ্বরটীকে মগ্ন করা হয়, এরূপ উদাহরণ লক্ষ লক্ষ দেওয়া যাইতে পারে, এবং নিত্য নিত্য এই ভাবেই চিকিৎসা চলিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত আরোগ্য এ ভাবে হয় না, হইতে পারে না। প্রকৃত আরোগ্যের **ধারা** অতি মৃদু—ইহাতে কোনও **জোর** নাই। যেমন কোনও ব্যক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তির দ্বারা স্বপক্ষে আনা, এবং তাহার পরিবর্ত্তে জোর করিয়া, লাঠির ভয় দেখাইয়া, বা অস্ত্রাঘাত করিয়া অথবা জব্দ করিয়া, নিজের মতে আনা, এই দুইটীর **ধারা** সম্পূর্ণ পৃথক—এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। প্রকৃত আরোগ্যকারী ঔষধ কি করে? প্রকৃত আরোগ্যকারী ঔষধ আগেই **যেখানে** বিশৃঙ্খলা হইয়াছে, সেখানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া জীবনীশক্তিকে ঠিক পথে চালিত করে। পূর্ব্বে জীবনীশক্তি ক্রিয়া করিতেছিল বটে, কিন্তু **স্বাভাবিক** ভাবে ক্রিয়া করিতে পারিতেছিল না, এজন্য দেহে রোগ প্রকাশ হইয়াছিল, এক্ষণে ঔষধ প্রথমে জীবনীশক্তিকে সাহায্য করায়, জীবনী-শক্তির **নিজের ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তি ঘটে,** এবং তাহার অর্থাৎ, জীবনীশক্তিরই **স্বভাবিক ভাবে** ক্রিয়া করার **ফলেই** আরোগ্য আসিয়া থাকে, কোনও **ঔষধবিশেষের ক্ষমতায়** কিছু হয় না। কাজেই জীবনীশক্তির যেরূপ **মৃদু** ও **কোমল** ভাবে কার্য্য করা নিত্য অভ্যাস, ঠিক সেই ভাবেই আরোগ্য

আনয়ন করিবে ও করিয়া থাকে। অতএব, কোনও স্থানে পোড়াইয়া ফেলা, কোনও স্থানটীতে ফোস্কা করা, ইত্যাদি ব্যাপার যাহা **ঔষধের জোরে** করা হয়, তাহা প্রকৃত আরোগ্য করা নয়, পরন্তু উগ্রবীর্য্য ঔষধের দ্বারা একটা **অস্বাভাবিক** ক্রিয়া দেখান মাত্র, ইহাতে যথার্থ পক্ষে জীবনীশক্তির রোগারোগ্য করিবার স্বাভাবিক শক্তিকে বরং **বাধা** দেওয়া হয় মাত্র। যখন জীবনীশক্তির সাহায্যের দ্বারাই; তাহার নিজের শক্তিতেই, এবং তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্রিয়ার দ্বারা আরোগ্যকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তখন এরূপ আরামের **প্রকারটী, ধারাটী, প্রকৃতিটী** অতি অবশ্যই মৃদু হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? ইহা যে জীবনীশক্তির **স্বাভাবিক ক্রিয়া** ? আমাদের সুস্থ-শরীরে অন্নাদি ভুক্ত পদার্থ সকল জীর্ণ করিতে কোন কষ্ট বা অস্বচ্ছন্দতা আসে কি ? তাহা ত আসেই না, বরং আনন্দই আসে,—যেহেতু আমরা জীবনীশক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতার সহিতই অনুভব করিয়া থাকি। যখন এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা আরোগ্য কার্য্য সম্পন্ন হয়, তখন আরোগ্যের প্রকারটীও অতি অবশ্যই মৃদুই হইবে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, জোর করিয়া রোগলক্ষণ সকল অপসারিত করিলে, রোগীর কষ্টই হইয়া থাকে, কেননা সেখানে অন্য শক্তির জোর আছে, "জবরদস্তি" আছে, কাজেই **স্বাভাবিক** নয়, স্বাভাবিক হইলে কোমল বা মৃদু হইত।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনেক সময় হোমিওপ্যাথি ঔষধ প্রয়োগের পর অতিশয় ভয়াবহ লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে, ইহার কারণ কি ? আমি নিজেরই চিকিৎসার ভিতর একটি বিকারের বর্ণনা দিতেছি, ইহাতে বিষয়টী আরও সুস্পষ্ট হইবে। পুরুলিয়ার একটী খ্যাত নামা উকিল বাবুর পুত্র, ৭ বৎসর বয়ঃক্রম, তাহার ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে জ্বরবিকার হয়, ২০।২২ দিন কৃতবিদ্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহাশয়দের হাতে ছিল, ২৩ কি ২৪

দিনের পর আমাকে ডাকা হয় ও এই লক্ষণ দেখি। বালকটীর নড়ন চড়ন নাই, চক্ষের মণীতে অঙ্গুলি প্রদানেও কোনও অনুভব নাই, মধ্যে মধ্যে পাগুলি নড়িতেছে মাত্র। মলমূত্র ১২।১৪ ঘণ্টা হয় নাই, পেটটী ফাঁপা, জ্বর পূর্ব্বে ছিল, অর্থাৎ গতকল্য পর্য্যন্ত ছিল, ঐ দিন সকাল হইতে ৯৭ ডিগ্রি গাত্রতাপ হইয়াছে, ইত্যাদি। আমি রোগীর জীবনের কোনও আশা নাই তাহা স্পষ্ট কহিয়া, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ", এই বলিয়া জিঙ্ক ২০০ ৩।৪টী বটীকা ১ শিশি জলে দিয়া সামান্য সামান্য প্রতি ঘণ্টায় দিতে কহিলাম, এবং যতক্ষণ না কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ততক্ষণ এইরূপ দিবার কথা কহিয়া দিলাম। বাড়ীর লোক সকলকে বেশ করিয়া, বুঝাইয়া দিলাম যে, শীঘ্র ফল বা কিছু পরিবর্ত্তন পাওয়া যাইবে না, ফলতঃ কিছু পাইলেই যেন আমায় সংবাদ দেওয়া হয়; এবং ইহাও কহিলাম যে, যদি ফল হয় ইহাতেই হইবে, নতুবা অন্য উপায় আমার দ্বারা হইবে না, কাজেই ধৈর্য্য অবলম্বন চাই। এ সকল ক্ষেত্রে অনন্যোপায় বলিয়া লোকে কাজে কাজেই ধৈর্য্য অবলম্বন করে, নতুবা এলোপ্যাথদের "বৈজ্ঞানিক" চিকিৎসা ছাড়িয়া এ প্রকার চিকিৎসায় স্থির থাকা, প্রায়ই দেখা যায় না। যাহা হউক, তাহার পর দিনে ৯।১০-টা বেলার সময় সংবাদ পাইয়া, গিয়া দেখিলাম যে, রোগীর অনেকটা কাল কাল মল বাহির হইয়াছে ও রোগী মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিতেছে। আমি প্রায় একঘণ্টা বসিয়া থাকিতে থাকিতে রোগীর একপ্রকার ভয়ানক আক্ষেপ আরম্ভ হইল যে, তাহা চক্ষে দেখিতে পারা যয় না! আমি কেবল মাত্র স্থির হইয়া বসিয়া বেশ করিয়া লক্ষ্য করিলাম ও রোগীর চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া ২।১ বার জানিলাম, যেন কতক উন্নতি বটে। রোগীর পিতাকে আমি কহিলাম যে, আমি এখানে বসিয়া থাকিব না, কেননা, কি জানি, রোগীর দারুণ কষ্ট দেখিয়া কোনও ঔষধ দিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। এ অবস্থায় কোনও ঔষধ দেওয়া সঙ্গত নয়। ফলতঃ রোগীর

ফল আরম্ভ হইয়াছে,—আশা করা যায়। তাঁহারা কি মনে করিলেন, জানি না। তবে উপায় কি? বৈকালে সংবাদ পাইলাম যে, রোগীর অনেকটা চৈতন্য ফিরিয়াছে, গিয়া যাহা দেখিলাম ও যাহা করিয়াছিলাম, তাহা এখানে লিখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঔষধের ক্রিয়া মৃদু বা কোমল না হইয়া এতদূর ভয়াবহ হইল কেন? একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই সকল ভয়াবহ লক্ষণ যাহা রোগীর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল বা এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা ঔষধের **ক্রিয়া নয়, ক্রিয়ার ফল মাত্র।** ঔষধ ক্রিয়া করিতে গিয়া বা ক্রিয়া করিতে করিতে যদি পথিমধ্যে, কোনও **অচিকিৎসা** বা **কুচিকিৎসার** ফলে, সঞ্চিত **আবর্জ্জনা** দেখে, তবে তাহাকে তীব্র বেগে সরান ছাড়া কি করিবে? একটী জলনালার মুখে কতকগুলি মাটী কাদা জমিয়া থাকিলে, তাহাকে যেমন বলপ্রয়োগে সরান প্রয়োজন হয় এবং জলের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়ায়, না সরাইলে চলে না, সেইরূপ ভাবে এ ক্ষেত্রে ঔষধের ক্রিয়ার **ফলে** ঐরূপ পরিষ্কার করিবার কার্য্যটী **প্রকৃতির দ্বারা** সংঘটিত হয়। কাজেই, এ সকল,—**ক্রিয়ার ফল মাত্র, ক্রিয়া নয়।** ক্রিয়াটী প্রকৃতই অতি **মৃদু** ও **স্বাভাবিক।** নিজ নিজ চিকিৎসায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহা লিখিত হইল, ইহা দ্বারা অনুমান হইবে যে, যখন আরোগ্য কার্য্যটী **জীবনীশক্তির নিজের ক্রিয়ার** দ্বারাই হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই দ্রুত ও স্থায়ী হইবে। প্রকৃতির **বিরুদ্ধে** কার্য্য করিলে, সে কার্য্যে বিলম্ব হইতে পারে, এবং সে কার্য্য ভবিষ্যতে নষ্ট হইতে পারে, কেননা যে উগ্র ভেষজের ক্রিয়ায় ফলটী দেখান হয়, সেই ক্রিয়ার অবসান হইলে ফলটীরও অবসান হয়, কাজেই রোগলক্ষণ আবার উদয় হইতে দেখা যায়। কুইনাইন দ্বারা জ্বরটী আটক করিয়া ৮।১০ দিন পরে

কুইনাইনের ক্রিয়াটী ফুরাইলে সেই জ্বর আবার দেখা দেয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। অতএব আরোগ্যের **প্রকার বা রীতির** উপর অনেক নির্ভর করে। কেবল রোগ লক্ষণ সকলের যে কোনও প্রকারে তিরোভাব হইলেই আরোগ্য হইল না,—তবে কি ভাবে হওয়া চাই? **মৃদুভাবে, দ্রুতগতিতে ও স্থায়ীভাবে** হইতে হইবে,—এবং প্রকৃত হোমিওপ্যাথী সূত্রে ঔষধ দিলে তাহাই হইয়া থাকে।

আমাদের প্রকৃত হোমিওপ্যাথীক সূত্রে ঔষধের প্রয়োগে যে আরোগ্য আনয়ন করে, তাহা যে অতি কোমল ভাবে হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, আমাদের আরোগ্যের গতি, মানব দেহে জীবনীশক্তির গতি বা **স্রোতের অনুকূলে,** কাজেই মৃদু না হইয়া পারে না। মনের সুশৃঙ্খলা আনয়ন হেতু, সেই সুশৃঙ্খলা অনুসারে, **মন হইতে** আরোগ্যের **প্রবাহ বা স্রোতটী বাহ্যদেহে** আসে। সকলেই জানেন যে প্রকৃতির নির্ম্মাণ ক্রিয়া মন হইতে দেহে আসিয়া থাকে—ইহার প্রবাহ **মন হইতে দেহের দিকে।** প্রকৃত প্রস্তাবে মনের স্থূল বিকাশই দেহ। যেহেতু আমাদের ঔষধ মনের বিশৃঙ্খলা অগ্রেই নষ্ট করিয়া স্বাভাবিক শৃঙ্খলা আনয়ন করে, সেই শৃঙ্খলা দেহে পৌছাইতে প্রকৃতির কোনও কষ্ট হয় না, কেননা ইহা জীবন স্রোতের **অনুকূলে;** যদি **প্রতিকূলে** পৌছাইতে হইত, তাহা হইলে মৃদু বা কোমল হইত না। স্রোতের প্রতিকূলে যে ভেষজ দ্রব্য কার্য্য করে, তাহার ক্রিয়া মৃদু বা কোমল কখনও হইতে পারে না।

অতএব প্রকৃত আরোগ্য অগ্রে মনে আরম্ভ হইবার ফলে, রোগীর স্বচ্ছন্দতা আসা চাই এবং ঔষধের ক্রিয়া অতি মৃদু, দ্রুত এবং স্থায়ী হওয়া উচিত্। ইহাতেও যথেষ্ট হয় না। আমরা ঔষধের ক্রিয়া কোথায় আগে আরম্ভ হইলে বুঝিতে পারিব, আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহা জানিয়াছি, আবার ক্রিয়াটী কি প্রকৃতির ও কি ভাবে হওয়া উচিত,

তাহাও জানিয়াছি, তবে এই দুইটী হইলেই যথেষ্ট হইবে না। আরও যাহা প্রয়োজন, তাহাই লিখিত হইতেছে।

প্রকৃত আরোগ্য হইতে হইলে, **কতকগুলি স্বাভাবিক, সহজ ও স্থির নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে** হওয়া উচিত। বিষয়টী বড়ই জটিল, কাজেই বিশেষ প্রণিধান প্রয়োজন। নিয়মগুলি কি প্রকার? **স্বাভাবিক, সহজ,** এবং **স্থির নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয়।** যেমন জল নিম্নগামী, ইহা সকলেই জানেন,—ইহা একটী **স্বাভাবিক** নিয়ম, সকলের **বোধগম্য** নিয়ম এবং এই নিয়মের কখনও **পরিবর্ত্তন** সম্ভব নয়। এই নিয়ম কোনও স্থান, কাল, পাত্র অপেক্ষা রাখে না। চুম্বকের লৌহের প্রতি আকর্ষণ, ইহাও একটী স্বাভাবিক নিয়ম ও অপরিবর্ত্তনীয়। এইরূপ জগতে অনেক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল নিয়মের বশে প্রতিনিয়ত সংসারে ঘটনা সকল ঘটিতেছে। আমাদের প্রকৃত আরোগ্য ঐ প্রকার কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের বশেই হয় ও হওয়া উচিৎ। যাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলা যায়, তাহা অবশ্যই ঐ প্রকার স্বাভাবিক নিয়মের বশে হইবেই হইবে, অর্থাৎ ইহা কোনও **আকস্মিক** ঘটনা নহে, ইহা **নিয়মের** অধীন। যেমন যেখানেই বৃষ্টি, সেইখানেই জানিতে হইবে মেঘ ছিল, সেইরূপ যেখানে প্রকৃত আরোগ্য, সেইখানেই জানিতে হইবে, ইহা কতকগুলি নিয়মের বশে হইয়াছে, **হঠাৎ** বা **বিনা নিয়মাধীনে** আরোগ্য হয় না। সে নিয়মগুলি কি? মনে করুন, একটি নিয়ম এই যে, সদৃশ লক্ষণে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ২য়, অতি অল্পমাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, ৩য়, একেবারে একটী মাত্রা ঔষধের অধিক ঔষধ প্রয়োগ করা হইবে না। ৪র্থ, যে সকল পীড়া মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া থাকে, সেই সকল পীড়ায় কোনও বারের আক্রমণের শেষে ঔষধ দিতে হইবে।

পীড়ার ভোগকালে ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি আপনার আরোগ্য এই সকল নিয়ম বশে হইয়া থাকে, তবেই প্রকৃত আরোগ্য হইয়াছে, নতুবা নহে। কোনও খ্যাতনামা চিকিৎসক যদি লিখিয়া গিয়া থাকেন যে, **নক্সভমিকা** উদরাময়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ, আমরা তাহা শুনিব না। নক্সভমিকা দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করিতে হইলে, আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রুভিং দেখিয়া সমলক্ষণের রোগীতে প্রয়োগ করিব, ও উপরোক্ত নিয়ম সকল অনুসরণ করিব, তাহার **ফলে** যদি আরোগ্য হয়, তবেই আমরা কহিব যে আরোগ্যটী ঠিক হইয়াছে, এমন কি, ঠিক নিয়মে প্রয়োগ হইলে, আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিতে পারিব যে, রোগী আরোগ্য হইবে; কেন না, আমরা জানি যে, উক্ত নিয়মে ব্যবহৃত ঔষধ শুভ ক্রিয়া করিবেই, অবশ্য যদি অন্য কোনও অবান্তর অন্তরায় না থাকে। যদি ক, খ, গ, ঘ, উপস্থিত থাকে, তবে তাহার **ফলে** স আসিবেই। যদি হোমিওপ্যাথি সূত্রের নিয়মগুলি পালন হইয়া থাকে, তবে আরোগ্য আসিবেই। এই জন্য এই আরোগ্যকে "বৈজ্ঞানিক হিসাবে" আরোগ্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের অধীনে আরাম না হইলে, তাহাকে প্রকৃত আরাম বলা যাইবে না। আমরা যখন প্রকৃত আরোগ্য পাইবার ইচ্ছা করিব, তখন ঐরূপ কতকগুলি নিয়মের অধীনে ঔষধ প্রয়োগ করিবার **ফলে** আরোগ্য আসিবে। এইরূপে যে আরোগ্য হয়, আমরা তাহার **নিদর্শন** জানি, **সূচনা** জানি। **যে যে ভাব বা সূচনা উপস্থিত হইলে**, রোগী আরোগ্যের পথে যাইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিব, সেই সকল নিদর্শন, সেই সকল সূচনা, কেবলমাত্র **উক্ত নিয়মের অধীনে চলিলেই পাওয়া যায়**, নতুবা পাওয়া যায় না, এবং তাহা পাওয়া গেলে পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে বাকি থাকে না যে, প্রকৃত আরোগ্য শীঘ্রই আসিতেছে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, প্রকৃত আরোগ্য পাইতে হইলে অনেকগুলি জিনিষের প্রয়োজন, যা তা করিয়া ঔষধ দিলে চলিবে না। অথবা যে কোনও প্রকারে আপনার রোগীর রোগ সারিলেই চলিবে না, আপনি যে বলিবেন যে, "রোগ লক্ষণ সকলের অন্তর্ধান হইয়াছে, **অতএব** আমার রোগী বেশ সারিয়াছে," তাহা হইতে পারে না। **যে কোনও প্রকারে** রোগলক্ষণগুলি লুকাইলেই হইল না, কেননা তাহাতে **রোগী** সারিবে না, আপনার উদ্দেশ্য,—**রোগীকে মানুষ**-হিসাবে আরোগ্য করা,—একটা **নির্জীব যন্ত্র** বিকল হইতে তাহাকে মেরামত করা ও একটী **মানুষ** রোগী হইলে তাহাকে নিরাময় করা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আপনার রোগীকে **মানুষ হিসাবে** সারাইতে হইবে। তাহা করিতে হইলে, বহির্লক্ষণের তিরোভাব হইলেই হইবে না। মানুষের মনটী যেমন, মানুষটী তেমন। কাজেই আগেই মনের উন্নতি প্রয়োজন, অর্থাৎ আগে মনের উন্নতি হইলেই জানিতে হইবে, আপনার রোগী ঠিক্ আরামের পথে আসিতেছে। ঔষধের ক্রিয়াও অতিশয় মৃদু, দ্রুত এবং স্থায়ী হইতে বাধ্য, কেননা ঔষধ আগে মনে কাজ আরম্ভ করিয়া, স্বাভাবিক স্রোতের অনুকূলে, দেহে তাহার ফল বিকাশ করিয়া থাকে বলিয়া, উহার ক্রিয়া ঐ সকল গুণযুক্ত না হইয়া পারে না। রোগীর উপর কোনও জোর নাই, তাহার রোগলক্ষণ সকলের উপরও কোনও প্রকার জবরদস্তি নাই। মনের উপর ক্রিয়ার **ফলটী, যেন স্রোতোবশে,** দেহে আরোগ্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবে। তাহা ছাড়া, আপনার ঔষধ প্রয়োগ ও তাহার ফল, কতকগুলি স্থিরনির্দ্দিষ্ট, স্বাভাবিক ও সহজ নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই সকল নিয়মানুসারেই, অন্যান্য স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনাপরম্পরার ন্যায়, আপনার আরোগ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। যদি সেই সকল নিয়ম অমান্য করিয়া, যা তা হিসাবে আপনার ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে, তবে "বৈজ্ঞানিক হিসাবে" আরোগ্য

আসিবে না। পরন্তু যদি ঐ সকল নিয়মকে যথারীতি অনুসরণ করিয়া আপনি কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে পূর্ণভাবে আরোগ্যের পূর্ব্বেই আপনি জানিতে পারিবেন, যে অতিশীঘ্রই সুবিমল আরাম আসিতেছে। আপনি কতকগুলি সূচনা বা নিদর্শন পাইবেন, তাহার দ্বারা আপনি ভবিষ্যৎ ফল বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, কখনও কোনও কালে তাহাদের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়,—মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় **চিরনির্দ্দিষ্ট,** অর্থাৎ **অপরিবর্ত্তনশীল**। যথা নিয়মে কার্য্য করিলে আরামের জন্য আপনি যেরূপ নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তদ্রূপ উল্লিখিত সূচনা বা নিদর্শনগুলিও, সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়ের ন্যায়, নিশ্চয়ই আসিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সকল সূচনা বা নিদর্শন সকল কি, এবং কিরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা লিখিবার পূর্ব্বে একটী কথা বিশেষ পরিস্ফুট করা কর্ত্তব্য মনে করি। এই কথাটী আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কেননা আমরা যতদূর নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে পারি ও করিয়া থাকি, এতদূর সর্ব্বনাশ অন্য মতের চিকিৎসকগণ কখনই করিতে পারেন না।

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল, তাহাতে অবশ্যই জানা যায় যে, আমাদের আরোগ্যের পথ, অর্থাৎ **প্রকৃত অথবা একমাত্র আরোগ্যের পথ—ভিতর হইতে বাহিরের দিকে।** অন্য মতের চিকিৎসায় আরোগ্য **চেষ্টা** ঠিক বিপরীত, **অর্থাৎ বাহির হইতে ভিতরে।** অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সুদীর্ঘকাল চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়াও রোগীর চিকিৎসার সময় ঔষধ দিবার সঙ্গে সঙ্গে **বাহ্য প্রলেপাদি** দিতে বলেন, অন্ততঃ অনুমোদন করেন। মনে বুঝিয়া দেখিবেন, এ প্রকার আদেশ বা অনুমোদন কি সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। আপনার প্রযুক্ত ঔষধ

ভিতর হইতে বাহিরের দিকে গতি প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিল, আবার, বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা রোগ শক্তিটী অন্তর্ম্মুখে ধাবিত হইতে লাগিল, ফলে—শরীরে একটী মহাগণ্ডগোল হইয়া বসিল। ইহাতে রোগীর লক্ষণ সকল এরূপ ভাবে জড়িত ও শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িবে যে, আরোগ্যের আশা ত দূরের কথা, অন্য প্রকার রোগলক্ষণ ও যাতনা সকল আসিয়া রোগীকে বিধ্বস্ত করিবে; এই প্রকার অবস্থার কারণ,—একমাত্র আপনার সামান্য অনবধানতা। অনেক সময় অনবধানতাও কারণ নয়, হয়ত সামান্য চক্ষুলজ্জা। কোনও এলোপ্যাথিক ভ্রাতা হয়ত এতাবৎকাল কোনও নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন, কিছুদিনের পর ঐ চিকিৎসায় ফল না পাওয়ায় আপনাকে ডাকা হইল, আপনি রোগী দেখিয়া হয় ত কেলি কার্ব্ব ব্যবস্থা করিলেন, এবং তখন হয়ত উক্ত ভ্রাতার কথানুসারে একটী এন্টিফ্লজিষ্টিন বা পুল্‌টিশ বা মালিশ দিবাব ব্যবস্থাও চলিতে লাগিল। এ অবস্থায় যদি আপনি না জানিয়া অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে যত শীঘ্র আপনি এলোপ্যাথি পথ অবলম্বন করেন, তত শীঘ্রই আপনার, আপনার রোগীরও হোমিওপ্যাথির পক্ষে মঙ্গল। আর যদি আপনি জানিয়া শুনিয়া কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরে ইহা করিয়া থাকেন, তবে আপনার জ্ঞান-পাপের কখনও পরিত্রাণ হইবে না। আপনি জ্ঞানকৃত অন্যায় করিতেছেন। রোগীর আত্মীয় স্বজন অনেক সময় এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবুদিগকে আসিতে বলেন, ও বলেন যে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হইবে এবং এলোপ্যাথিক ডাক্তার বাবু নিত্য আসিয়া বুকটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যাইবেন। ঠিক যেন "নলটি" বুকে না চাপাইলে ব্যাধি মুক্তির আর উপায় নাই, অথবা যেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের দ্বারা এই অদ্ভুত পরীক্ষার সম্ভাবনা আদৌ নাই। সে যাহা হউক, আমাদের এই প্রকার "সালেনামা" করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ান, এলোপ্যাথিক

ঔষধ বা প্রলেপ বাহিরে লাগান,—এই প্রকার ব্যবস্থা বা অনুমোদন করা, কিঞ্চিন্ন্যূন নরহত্যার পাতকের ভাগী হওয়া মাত্র। আবার দেখিয়াছি, এলোপ্যাথিক ডাক্তার বাবুরা, এলোপ্যাথিক ঔষধের ডিস্‌পেন্‌সারির ভিতর ১২।২৪টি ঔষধের একটি বাক্স রাখিয়া দেন ও পাছে রোগী হাতছাড়া হইয়া কোনও প্রকৃত হোমিওপ্যাথের আশ্রয় গ্রহণ করে, এই ভয়ে আবার হোমিওপ্যাথি ঔষধও দেন ও তৎসঙ্গে বাহ্যিক প্রলেপাদিও দিয়া থাকেন। এইরূপে দুই দিক রাখিতে গিয়া রোগীরই সর্ব্বনাশ হয়, ডাক্তারের কিছু অনিষ্টের কারণ নাই, কেননা তাহার সরকারী তগ্‌মা বাঁধা আছে। এই সকল ব্যবস্থা বা কুব্যবস্থা দেখিয়া মনে কষ্ট হইলে চলিবে না, যাহাতে প্রকৃত লোকশিক্ষা হয়, ও লোকে চিকিৎসার প্রকৃত **মর্ম্ম** ও **তত্ত্ব** বেশ বুঝিতে পারে, তাহা করিতে হইবে। সকলের উপর **নিজেদের** সাবধান হওয়া চাই। আমরা নিজেরাই অসিদ্ধ, আর অপরকে সিদ্ধ করিব কি প্রকারে?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত আরোগ্যের নিদর্শন।

আমরা এক্ষণে, প্রকৃত হোমিওপ্যাথি সূত্রানুসারে নির্ব্বাচিত ঔষধ এক মাত্রা, কোনও পুরাতন পীড়ার রোগীকে দেওয়া হইয়াছে, নির্ব্বাচন কার্য্যে কোনও ভ্রম হয় নাই, এবং ঔষধের মাত্রাটীও যথারীতি ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ সকল স্বীকার করিয়া লইলাম,—এক্ষণে, কি প্রকার নিদর্শন, কি প্রকার সূচনা বা কি প্রকার চিহ্ন দেখিয়া আমরা স্থির উপলব্ধি করিতে পারিব যে, আমাদের রোগীকে যে ঔষধ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ফলে রোগীর প্রকৃত আরোগ্য শীঘ্রই আসিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, এইরূপ নিদর্শন বা সূচনা পাওয়া যায়—যাহা দেখিয়া আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারি যে, ঔষধের ফল প্রকৃত "হোমিওপ্যাথিক" হইয়াছে, এবং কেবল যে রোগলক্ষণের তিরোধানরূপ আরোগ্য আসিবে, তাহা নয়, যাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে তাহাই হইবে, আমাদের রোগীটী সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হইবে এবং ক্রমেই রোগ লক্ষণ সকল আর থাকিবে না। সেই সকল নিদর্শন অতঃপর আলোচিত হইতেছে।

১। সর্ব্ব প্রথম নিদর্শন আমরা ইতিপূর্ব্বে কতক আলোচনা করিয়াছি ;—অর্থাৎ আরোগ্যের গতি যদি **ভিতর হইতে বাহিরের দিকে** হইল, অর্থাৎ আগে মনে ক্রিয়া দেখাইয়া ক্রমে সেই ক্রিয়া ভিতর হইতে দেহের দিকে আসিতে থাকে ও সুফলগুলি ক্রমেই এই ভাবে বিকাশ পাইতে থাকে, তবেই জানিতে হইবে যে প্রকৃত আরোগ্যের আশা করিতে পারা যায়। কোনও একটী রোগীর রোগলক্ষণগুলিকে ঠিকমত

লিখিয়া লইলে তাহার ভিতর কতকগুলি মানসিক লক্ষণ ও কতকগুলি বাহ্যদেহের লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে পারা যায়। মানসিক লক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে বাহিরের দিকে আসিলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি লক্ষণ একেবারে ভিতরের, আবার কতকগুলি তাহাদের অপেক্ষা অনেক বাহিরের, আবার কতকগুলি সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক। উদাহারণ স্থলে দেখিতে হইলে, মনে করুণ যে, কাহারও মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, কিছু ভাল লাগে না, কেবল ইচ্ছা হয় যে এখানে সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, এই লক্ষণটী একেবারে সম্পূর্ণ মানসিক ও আভ্যন্তরিক; আবার মনে করুণ, তাহার মাথা ঘুরে, বুক ধড়ফড় করে, যকৃতস্থানে সময়ে সময়ে ছুঁচ ফোটান বেদনানুভব হয়, এই প্রকার লক্ষণ সকলও আভ্যন্তরিক হইলেও অনেকটা বাহিরের, অন্ততঃ একেবারে আভ্যন্তরিক নহে; আবার মনে করুন, ঐ রোগী শয্যায় শয়নের পরে সর্ব্বদাই গাত্র চুলকাইতে থাকে, ও প্রায়ই তাহার দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম হয়, ইত্যাদি প্রকারের লক্ষণ সকল একেবারে বাহ্যিক। এক্ষণে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ দিবার পর যদি দেখা যায় যে, তাহার ঐ গাত্রকণ্ডুয়ন আগেই নিবৃত্তি পাইল, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণের কোনও পরিবর্ত্তনের ভাব দেখা গেল না, তখন আমাদের মনে সন্দেহ হওয়া উচিত যে, ইহা কখনই **হোমিও-প্যাথিক ক্রিয়া** হইতে পারে না। প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ক্রিয়া অর্থাৎ প্রকৃত আরোগ্যোন্মুখী ক্রিয়া হইলে, আগেই তাহার মনের চাঞ্চল্য, কিছু ভাল না লাগা, এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা ইত্যাদি অভ্যন্তর লক্ষণগুলির উন্নতি হওয়া উচিৎ ছিল। যদি তাহা না হইয়া বাহ্য লক্ষণ সকলের উন্নতি প্রথমেই দেখা যায়, তবে সে অবস্থায় জানিতে হইবে যে, প্রকৃত আরোগ্য পথে রোগী যাইতেছে না। তখন কি করা কর্ত্তব্য, অন্য কোনও ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে আলোচনা করা হইতেছে না, চিকিৎসার কথা লিখিবার সময়ে

সে সকল অতি বিশদভাবে লিখিত হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত জানা রহিল যে, সর্ব্বপ্রথমে যদি মানসিক লক্ষণ সকলের উন্নতি দেখা যায়, তবেই ঠিক আরোগ্যের পথে যাওয়া যাইতেছে, এ কথা বুঝিতে হইবে, তদ্বিপরীতে অর্থাৎ বাহ্য লক্ষণ সকলের প্রথমেই উন্নতি দেখিলে বিশেষ সন্দেহের কথা।

২। উপরোক্ত ঐ যে মানসিক লক্ষণসকলের প্রথমেই উন্নতি দেখিয়া রোগীর প্রকৃত আরাম সূচিত হইবার বিষয় লিখিত হইল, সেই উন্নতির অনুভবটী **রোগীর নিজেরই হওয়া চাই**। রোগী নিজে, তাহার ভিতর হইতে, মানসিক লক্ষণের উন্নতি অনুভব করিলে, তবেই সেটী প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নতি। অপরের চক্ষে উন্নতি বোধ হইবার পূর্ব্বেই রোগী, নিজের সে বিষয়ের অনুভব হইবে। যে "রোগের" আরোগ্য জন্য চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে, সেই "রোগ" হয়ত ঠিকই আছে, এবং অপরে সে জন্য হয়ত অনুমান করিতেছে যে রোগের কোনও ইতর বিশেষ হয় নাই, কিন্তু তাহা হইলেও রোগী **নিজে যদি তাহার অভ্যন্তরের অভ্যন্তর প্রদেশে কতকটা স্বচ্ছন্দতা, কতকটা আরাম, একটু স্ফূর্ত্তি** ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি অনুভব করে, তাহা হইলেই **প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা** পাওয়া গিয়াছে, জানিতে হইবে।

৩। যদি ঔষধ প্রয়োগের ফলে সর্ব্বাগ্রে মনে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া মানসিক লক্ষণ সকলের উন্নতি দ্বারা প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবেই অন্যান্য শুভ সূচনাগুলি (যাহা অতঃপর আলোচিত হইবে) ক্রমে ক্রমে আসিতে থাকিবে। ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে যে মানবের দেহ কেবলমাত্র তাহার মনেরই বাহ্য ও বিকশিত মূর্ত্তি মাত্র। মনে যাহা আরম্ভ হয়, কিছুদিন পরে তাহাই, স্বাভাবিক প্রবাহবশে, দেহে পর্য্যবসিত হয় মাত্র। যদি মনে কার্য্য আরম্ভ হইয়া

থাকে, তবে অবশ্যই তাহার ফলে স্বাভাবিক স্রোতের গতিবশে, দেহের সুস্থতা আশা করা যাইবে। আমাদের জানা আছে যে, প্রাচীন পীড়া সর্ব্বাগ্রে দেহে প্রকাশ পায়, ক্রমে ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ **পীড়ার গতি বাহির হইতে ভিতরের দিকে**। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ঐ পীড়ায় আরোগ্যকার্য্যটী আগে মনে বা অভ্যন্তরে আরম্ভ হইয়া, ক্রমে দেহে আসিয়া থাকে। কাজেই রোগের যে দিকে গতি, প্রকৃত প্রস্তাবে' আরোগ্য কার্য্যটীর গত ঠিক তাহার বিপরীত—কেননা **আরোগ্যের গতি, ভিতর হইতে বাহিরে**। আরোগ্যের এই গতিটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। যদি আরোগ্যের গতিটী ভিতর হইতে বাহিরে দেখা যায়, তবেই ইহা **প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা**, নতুবা নহে। এই তত্ত্বটী বেশ বিশদভাবে আলোচনা না করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবার আশা করা যায় না, এজন্য এ সম্বন্ধে আরও কিছু লেখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা কিরূপে ও কোন্ কার্য্যের ফলে, প্রথমেই বাহ্য দেহে প্রকাশিত রোগলক্ষণ সকলকে প্রকৃত আরোগ্য না করিয়া, রোগ-শক্তিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া, জটিল প্রাচীন পীড়ার সৃষ্টি করা হয়, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কুচিকিৎসা, অচিকিৎসা ইত্যাদির ফলেই তাহা হইয়া থাকে, এ বিষয় বেশ করিয়া বলা হইয়াছে। অতএব আমাদের এ কথা বুঝিতে বাকি নাই যে, রোগশক্তি বাহ্যদেহ ছাড়িয়া, ভিতরের দিকে ধাবমান হইয়া, প্রাচীন পীড়া আনয়ন করে। এক্ষণে প্রকৃত আরোগ্য আশা করিতে হইলে, ঐ শক্তি দ্বারা রোগলক্ষণ সকলকে ভিতর হইতে বাহিরে আনা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে, যদি আপনার ঔষধ প্রয়োগের ফলে ভিতর হইতে রোগ লক্ষণ সকল বাহিরে অর্থাৎ বাহ্য দেহের দিকে আসিতে থাকে ও আসে, তবে অবশ্যই এই প্রকার গতিকে প্রকৃত আরোগ্যের গতি, বলিতে হইবে। অর্থাৎ প্রকৃত

আরোগ্যের গতি ভিতর হইতে বাহিরে, **কেন না,** পীড়াটীর গতি বাহির হইতে ভিতরের দিকে। অতএব যদি দেখা যায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের ফলে ঔষধের ক্রিয়াটী আগে মনে প্রকাশ পাইয়া ক্রমে বাহিরের দিকে আসিতেছে, তবে প্রকৃত আরোগ্যের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট সূচনা, অবশ্যই বলিতে হইবে। যখন প্রথম বিশৃঙ্খলা, দেহে উৎপন্ন হইয়া কুচিকিৎসা বা অচিকিৎসার ফলে দেহ হইতে মনে প্রেরিত হইয়া প্রাচীন পীড়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, তখন যদি ঔষধ প্রয়োগের ফল স্বরূপে অগ্রেই মনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ শৃঙ্খলাটী বাহিরের দিকে প্রধাবিত হইতে থাকে, তবে ইহাকে প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা না বলিয়া কি বলা যাইতে পারে? **এই গতিটী বিশেষ মনোযোগের জিনিষ।** আরোগ্য বা রোগলক্ষণের অপসারণ অথবা তিরোভাবটী মানবের দেহ বা মনের যে কোনও স্থানে আরম্ভ হইলেও হইবে না এবং তাহার গতি যে দিকে ইচ্ছা হইলেও চলিবে না। প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা যেমন অগ্রেই মানসিক স্বচ্ছন্দতা, সেই স্বচ্ছন্দতা বা শৃঙ্খলার গতিটীও তেমনিই, ভিতর হইতে বাহিরে হওয়া চাই—তবেই সেটী আরোগ্য সূচনা, নতুবা নহে। এইজন্যই হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ার জন্য ঔষধ দিবার পরে যদি রোগীর বাত লক্ষণ আসে, তবে জানিতে হয় যে, এটী আরোগ্যের গতি, কেননা, প্রথমে হৃদ্-যন্ত্রে শৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়া রোগ লক্ষণ **বাহিরের দিকে** আসিতেছে। কিন্তু বাতের রোগীতে প্রলেপাদির বাহ্য প্রয়োগের ফলে, বাতরোগের কষ্ট সারিয়া হৃৎপ্রদেশে কষ্ট অনুভব হইলে, ইহা আরোগ্যের গতি নয়, ইহা **পীড়ার গতি,** ইহাতে বিশৃঙ্খলা আরও ভিতরের দিকে ধাবিত হইয়া ক্রমেই জটীলতা আনয়ন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। **প্রকৃত আরোগ্যের গতি ভিতর হইতে বাহিরের দিকে** হইয়া থাকে, এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, পুনরায় লেখা হইল, ইহাতে পুনরুক্তি

দোষ হইলেও ইহার ফল বড় ভাল, কেননা বিশেষভাবে এই সকল তত্ত্ব ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে গিয়া যদি পুনরুক্তি হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। যাহা হউক, আমরা যদি এই গতিটীর উপর বেশ লক্ষ্য রাখি, তবে দেখিতে পাইব যে, এই গতিটী ভিতর হইতে বাহিরে হইবার কারণ একমাত্র এই যে, **রোগের গতি বাহির হইতে ভিতরে ; অর্থাৎ রোগ ও আরোগ্যের গতি পরস্পর বিপরীত দিকে**—এটী বেশ মনে রাখা চাই। আবার, এই গতিটী লক্ষ্য করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে, দেহ হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার পথে ক্রমান্বয়ে যে যে যন্ত্র আক্রান্ত হইয়াছিল, আরোগ্য হইবার সময়ও ঠিক তাহার **বিপরীত** ভাবে সেই সেই যন্ত্র, অন্ততঃ বাহ্যাভ্যন্তর হিসাবে অনুরূপ যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, চর্ম্মরোগ লুপ্ত হইয়া যদি প্রথমে বাত, পরে হৃৎ-রোগ, সর্ব্বশেষে তাণ্ডব রোগ হইয়া থাকে, তবে আরোগ্যের সময় প্রথমেই তাণ্ডব রোগ উপশম হইয়া হৃদয়ে, বা তাহার প্রায় অনুরূপ আভ্যন্তর যন্ত্র, যথা যকৃতে, রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়, ক্রমে বাতরোগ দেখা দিয়া একেবারে বাহ্যদেহে চর্ম্মরোগ বিকাশ পায়। যে কোনও চিকিৎসক বিশেষ প্রণিধান করিয়া চিকিৎসা করেন, তিনিই এই তত্ত্ব পরিদর্শন করিতে পারেন। অতএব ঔষধ প্রয়োগের ফলে যদি আমরা দেখিতে পাই যে, আরামের গতি ভিতর হইতে বাহিরে, মন হইতে ক্রমান্বয়ে দেহের দিকে, বা মস্তিষ্ক বা তদনুরূপ আভ্যন্তর যন্ত্রাদি হইতে ক্রমে বাহ্য যন্ত্রের দিকে, ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম হইতে নাতি-সূক্ষ্ম ও স্থূলের দিকে, উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে, শিরোদেশ হইতে হস্তপদাদির দিকে, অর্থাৎ পীড়া গতির ঠিক বিপরিত দিকে, প্রধাবিত, তবে আমরা এই গতিকে প্রকৃত আরোগ্যের সূচনা বলিয়া স্থির করিতে পারিব।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, হাম বা বসন্ত রোগীর উদ্ভেদগুলি ভাল

করিয়া বাহির না হইলে, অথবা সামান্য কতকগুলি বাহির হইয়া "লাট" খাইলে, কি ভয়ানক অবস্থা হয়। এ অবস্থায় যদি সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের ফলে, সেগুলি ভিতর হইতে বাহিরে আসে, তবেই তাহা আরোগ্যের সূচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পাবে। আর যদি তাহা না হইয়া রোগশক্তির গতি ভিতরের দিকে হয়, তবে উদ্ভেদগুলি বাহির হইতে পারে ন, এবং তাহার ফলে আভ্যন্তর যন্ত্রগুলি আক্রান্ত হইয়া অনেক সময় রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে। অনেকে আরও দেখিয়া থাকিবেন যে, উদ্ভেদগুলি আগে শরীরের উর্দ্ধদিকে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে আসিতে থাকিলে তাহা আরোগ্যপথের সূচনা, তদ্বিপরীতে রোগীর অত্যন্ত কষ্টকর লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। যেখানে এই সকল রোগীর নিউমোনিয়া বা রক্তামাশায় পীড়া হয়, সেখানেই জানিতে হইবে যে, ঐ হাম বা বসন্ত রোগীর ঠিক সুচিকিৎসা হয় নাই। এলোপ্যাথিক চিকিৎসক মহোদয়গণ কহিয়া থাকেন যে, এই রোগের নিউমোনিয়া ও রক্তামাশয় এই দুইটী **সিকোএলি** (sequelæ) অর্থাৎ হাম বা বসন্ত রোগের শেষে যেন এই দুইটী রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়,—ইহারা কেবল অচিকিৎসার ফলেই দেখা দিয়া থাকে। আরোগ্যের উপর্য্যুক্ত গতিটী লক্ষ করিয়া চিকিৎসা করিলে আমাদের রোগীতে কোনও "**সিকোএলি**" আসিবে না। হাম প্রভৃতি পীড়ার ক্ষেত্রেও যে নিয়ম, প্রাচীন পীড়ার ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম। রোগান্তর হওয়া,—সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব্ববর্ত্তী রোগলক্ষণ-সমষ্টির সুচিকিৎসা না হওয়ার ফলমাত্র, স্থির জানিতে হইবে।

হৃদ্-যন্ত্রের পীড়ার চিকিৎসা করিতে গিয়া আমি দেখিয়াছি যে, বাত বা অন্য কোনও বাহ্য রোগলক্ষণ দেখা না দিয়া হৃদ্রোগ কখনই সারে না। যখনই যেখানেই দেখিয়াছি যে, ঔষধ দিবার ফলে রোগীর বাত বা চর্ম্মরোগ দেখা দিতেছে, তখনই সেখানেই লক্ষ্য করিয়াছি

যে, হৃদ্‌রোগের সেই পরিমাণে উপশম হইয়াছে। আরোগ্যের সূচনা যে এই প্রকার বাহিরের দিকে, ইহা মনে রাখিলে অনেক সময় ভাবী আরোগ্যের আশা করা যায় ও রোগীকেও আশ্বাস দেওয়া যায়। স্ত্রীলোকের প্রদর, বহুদিন স্থায়ী শূলব্যাথা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাকালে ঐ গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, রোগশক্তিটী ক্রমেই ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিয়া শেষে রোগীকে সুস্থ করে।

আমরা জানিতে পারিলাম যে, আমাদের রোগীকে ঔষধ দিবার পর কিরূপ দেখিলে তাহাকে আরোগ্যের সূচনা বলিব, কিরূপ দেখিলে আমরা জানিতে পারিব যে, ঔষধ সুফল আরম্ভ করিয়াছে এবং শীঘ্রই নির্ম্মল নিরাময় আনয়ন করিবে। প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ ও পূর্ব্ব সূচনাদি কিরূপ, তাহাও জানিতে পারিলাম। অতঃপর প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসাবিষয়ক আবশ্যকীয় কথা লিখিত হইতেছে। রোগী পরীক্ষা ও তাহার লক্ষণ সংগ্রহ ; ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ বিধান ; এবং ঔষধ প্রয়োগের পর ভাবীফল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিব।

প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা।

২য় ভাগ—চিকিৎসা প্রকরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রোগী পরীক্ষা ও লক্ষণ সংগ্রহ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে বলে এবং তাহার সূচনা সর্ব্বপ্রথমে কি পাওয়া যায়, সে সকল কথা স্থূলতঃ কতক পরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। ইহার পর যথাস্থানে এই সূচনা ও নিদর্শনাদির কথা আরও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করিতে হইবে। এক্ষণে **রোগীর পরীক্ষা, ও তাহার লক্ষণাদি কিরূপে সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ** করিতে হয়, সেই বিষয় লিখিত হইবে।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বলা আছে—"আদৌ রোগং পরীক্ষেত," আমাদের হোমিওপ্যাথিতে "রোগ" পরীক্ষার কথা হইতে পারে না, আমাদের ব্যবস্থা—"আদৌ রোগীং পরীক্ষেত"। আমাদের "রোগী" পরীক্ষাই ব্যবস্থা—"Treat the patient, and not the disease." প্রাচীনপীড়ার চিকিৎসার পূর্ব্বে, রোগীপরীক্ষা অতীব সুকঠিন, এবং সমগ্র মেটেরিয়া মেডিকাখানির ভাল ভাল এন্টিসোরিক, এন্টিসিফিলিটিক এবং এন্টিসাইকোটিক ঔষধগুলির প্রত্যেকের লক্ষণসমষ্টি বা চিত্র সর্ব্বদা যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে, এরূপভাবে মেটিরিয়া মেডিকাখানি পড়া চাই, নতুবা প্রাচীন

পীড়ার চিকিৎসায় সাহসী হওয়া ধৃষ্টতামাত্র। রোগী পরীক্ষা বলিলেই হইবে না, ইহা অনেকদিনের অভ্যাস, উত্তমরূপে শাস্ত্রাধ্যয়ন, কার্য্যে ধীরতা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে,— "ব্যস্তবাগীসের" দ্বারা এ কার্য্য হইবার নয়। ব্যবসার খাতিরে নিত্য ৮৷১০টী প্রাচীন পীড়ার রোগীর ঔষধ নির্ব্বাচন করিব, এরূপ আশাও করিতে নাই। আমার নিজের ক্ষমতায় ২৷৩টীর অধিক রোগীর চিকিৎসার ভার একদিনে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, এজন্য চিকিৎসক, প্রাচীন পীড়ায়, রোগীর চিকিৎসার পরিশ্রমিক দুইগুণ, তিন গুণ বা চারিগুণ করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তি নাই,—কিন্তু আসল কথা, বিশেষ ধৈর্য্য ও চিন্তাসহকারে এ রোগী পরীক্ষা করিতে হয়। নূতন পীড়া, যথা, নিউমোনিয়া, রেমিটেণ্ট জ্বর, ইত্যাদির চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে অপেক্ষাকৃত সহজ, কেন না ইহাদের রোগীর লক্ষণ সকল পরিস্ফুট ও বাহিরে বিকশিত, এবং রোগীও তাহার সুস্থাবস্থার তুলনায় তাহার কষ্ট ও অসুবিধাগুলি বেশ বুঝিতে পারে ও চিকিৎসককে জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন পীড়ায় তাহা নহে। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার সময় দেখিয়াছি যে, যে লক্ষণটীর উপর হয়ত নির্ব্বাচন বিশেষভাবে নির্ভর করে, সেই লক্ষণটীই রোগী অতি অনাবশ্যকীয় কথা বলিয়া মনে করিয়া চিকিৎসককে জানাইতে চাহে না; অথবা মনে করে, এ লক্ষণ ত স্বাভাবিক, ইহা রোগলক্ষণই নয়। আর্সেনিকের প্রাচীন রোগী, জলে অরুচি বা পিপাসার একান্ত অভাব, এ লক্ষণ কখনও আবশ্যক বলিয়া মনে করে না, মার্কুরিয়াসের অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, গ্রাফাইটীসের কোষ্ঠ বদ্ধ, ইত্যাদি লক্ষণ সকল, রোগীর নিকট প্রাপ্ত হওয়া সুদূরপরাহত। তাহা ছাড়া, প্রাচীন পীড়ায় কোনও কোনও লক্ষণ ও যাতনা বহুদিন অন্তর অন্তর দেখা দেয়, একটী রোগীতে এরূপ অনেকগুলি লক্ষণ থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ সকল লক্ষণ একটী সমষ্টির ভিতর আসিবে,

কি বিভিন্ন সমষ্টির মধ্যে আসিবে, ইহা রোগী ঠিক করে না, স্মরণও করে না, আবশ্যকীয় বলিয়াই মনে করে না। আবার কতকগুলি লক্ষণ পর্য্যায়শীলতার সহিত দেখা দেয়, যেমন বর্ষাকালে রক্তামাশয়,—শীতকালে বাত, বা শীতকালে প্রতিশ্যায়,— বর্ষাকালে শিরঃপীড়া, অথবা গ্রীষ্মকালে কোষ্ঠবদ্ধ, বর্ষাকালে বাতের বেদনা—ইত্যাদি পর্য্যায়যুক্ত লক্ষণের মধ্যে যে, কোনও সম্বন্ধ আছে, ইহা রোগী মনে করে না, বরং প্রত্যেকটীকে বিভিন্ন রোগ বলিয়া তাহার নিশ্চিত ধারণা থাকায় চিকিৎসকের নিকট জ্ঞাপন করার আবশ্যকতা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রাচীন পীড়ার রোগীর, রোগের যাতনা দীর্ঘকাল ভোগ করিতে করিতে নিজের ও চিকিৎসার উপর, একটা বিরক্তি আসে, কাজেই অনেক সময়ে, সকল কথা বার বার প্রত্যেক চিকিৎসকের নিকট বলিতে বিরক্ত বোধ করে। এ সকল ত আছেই, তাহার উপর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রভাবে কে—রোগলক্ষণ, কে—ভেষজলক্ষণ, ইহা স্থির করা এক প্রকার দুরূহ হইয়া উঠে। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় নানা বিঘ্ন ও বাধা, কেবলই এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইলে, একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। এখানে কেবলমাত্র একটী আভাস মাত্র দেওয়া হইল, বিবেচক ও সুধী চিকিৎসকগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিবেন, ইহাই বক্তব্য।

প্রারম্ভে, আর একটী আবশ্যকীয় কথা লেখা একান্ত কর্ত্তব্য। কোনও চিকিৎসকই যেন প্রাচীন পীড়ার রোগীর লক্ষণাবলি লিপিবদ্ধ না করিয়া চিকিৎসা করিতে সাহসী না হয়েন। ইহা অপেক্ষা আবশ্যকীয় কথা আর কিছুই নাই। প্রত্যেক রোগীর জন্য এক একটী স্বতন্ত্র কাগজ ব্যবহার না করিয়া, একখানি মোট খাতা এই কার্য্যে ব্যবহারের জন্য রাখা ভাল, তাহাতে অনেক সুবিধা হয়। খাতাখানি খুলিয়া বাম ধারের পৃষ্ঠায় লক্ষণগুলি লিখিতে হয় ও ডানধারের পৃষ্ঠাটী ফাঁক রাখিতে হয়।

বেশ ফাঁক ফাঁক করিয়া একটি একটি লক্ষণে এক একটী লাইন বা যে কয় লাইন প্রয়োজন হয়, তাহা লিখিয়া, শেষ লাইন ছাড়িয়া দিতে হয়। ঋষিপ্রবর হ্যানিমানের উপদেশানুসারে লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ হইলে অনেক কাজ করা হয় এবং চিকৎসকের ভবিষ্যতের পরিশ্রম অনেক কম হয় ও কার্য্যও সুগম হইয়া থাকে, এ কথা স্থির জানিয়া রাখা উচিত। লিপবদ্ধ করিতে অলস হইলে চিকিৎসায় সুফল ফলিবার আশা অতি কম। অনেকে একথার সার্থকতা অবধান করিতে পারেন না, তাঁহাদিগেধ্র প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহাদের স্মরণ শক্তি যতই তীক্ষ্ণ হউক না কেন, তাঁহারা যেন লিপিবদ্ধ করিতে অলস না হন। যে সকল রোগী দূর হইতে পত্রের দ্বারা তাঁহাদের রোগলক্ষণ লিখিয়া চিকিৎসা চাহেন, তাঁহারা এ বিষয়ে এত উদাসীন ও অলস যে, তাঁহারা যা তা করিয়া একখানি অতি জীর্ণ অপরিষ্কার কাগজে "আটে পিঠে ললাটে" টানা টানা লিখিয়া ও ৩।৪ বার "পুনশ্চ" দিয়া অস্পষ্টভাবে কি কতকগুলি ছাই মাটি লিখিয়া পাঠান, আবার তাহার সঙ্গে অনুরোধ যে, ফেরৎ ডাকেই একটী "প্রেস্‌ক্রিপ্‌সেন্‌" পাঠাইতে হইবে। সে যাহা হউক, অপরিষ্কারভাবে, ফাঁক ফাঁক লেখা না থাকিলে বা টানা অস্পষ্ট লেখা হইলে যে, আমাদিগকে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুমান করিতে পারিবেন না। প্রাচীন পীড়ার ঔষধ নির্ব্বাচন করা জ্যামিতির একটী একটী অনুশীলনীর সমাধানের ন্যায় কঠিন। একথা সাধারণে জানে না, এবং বুঝাইতে পারাও কষ্টকর। প্রাচীন পীড়ায় রোগ লক্ষণ সকল কি ভাবে লিখিত হয়, তাহা হ্যানিম্যান্ বেশ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, তবুও ইংরাজী অনভিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয়দের কাজে লাগিবে মনে করিয়া, আমরা নিম্নে লিখিতেছি।

রোগীর রোগ লক্ষণ **লিপিবদ্ধ** করিতে যাইবার সময় একটী "রোগ" পরীক্ষা করিতে যাইতেছি, এ ধারণা যেন না থাকে। একটী

"রোগী" পরীক্ষা করিতে যাইতেছি, ইহাই যেন মনে থাকে। দ্বিতীয় কথা, কোন ঔষধবিশেষের উপর, বা কতকগুলি ঔষধবিশেষের উপর চিকিৎসকের **পক্ষপাতিত্ব** না থাকে। একোনাইট্ হইতে জিঙ্ক্ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঔষধই নিজের নিজের ক্ষেত্রে সমান উপযোগী এবং একের কার্য্য অপরে করিতে অসমর্থ, ইহা যেন বেশ মনে থাকে। কোনও ঔষধ বিশেষের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া এবং **রোগী** পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইতেছি, ইহা ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মঙ্গলময়কে স্মরণ করিয়া লক্ষণ সমষ্টি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

রোগী পরীক্ষার সময়ে, এটী আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের **প্রয়োজন** কি? আমাদের উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে আমরা রোগী পরীক্ষা করিতে যাইতেছি? আমাদের উদ্দেশ্য,—**রোগীর একটী চিত্র পাওয়া**। কোনও ঔষধবিশেষ অধ্যয়ন করিবার সময় যেমন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে যে, ঔষধটীর একটী চিত্র নিজের মনোমধ্যে বেশ করিয়া অঙ্কিত করিতে হইবে, ঠিক সেই প্রকার যখন কোনও রোগী পরীক্ষা করিতে হয়, তখন ঐ **রোগীর একটী প্রকৃষ্ট চিত্র** নিজের হৃদয়পটে অঙ্কিত করাই উদ্দেশ্য, ইহা যেন সর্ব্বদা আমাদের মনে জাগরূক থাকে। একখানি বাঁধা খাতার বামধারের পৃষ্ঠার উপরিভাগে রোগীর নাম, স্ত্রী কি পুরুষ, বয়স, জাতি, কর্ম্ম বা ব্যবসায় লিখিতে হইবে এবং তারিখটী ঐ পাতায় বাম কোণে লিখিলে ভাল হয়। এই সকল লিখিবার পরেই রোগীকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য—"তোমার কষ্ট কি, কি? তোমার সুস্থাবস্থার সহিত এখনকার অবস্থা তুলনা করিলে, তোমার কি কি যাতনা, কষ্ট, অসুবিধা, তাহা বল, চিকিৎসককে রোগীর যাহা যাহা বলা প্রয়োজন মনে কর, তাহা আস্তে আস্তে বলিতে থাক, আমি যেন লিখিয়া যাইতে পারি।" রোগী তখন নিজের যে যে কষ্ট বা যাতনার কথা কহিবে, **তাহার ভাষাতেই**, এক একটী লাইনে, সেগুলি বেশ ফাঁক ফাঁক

করিয়া লিখিয়া লইতে হয়। প্রথম, রোগীকে তাহার কষ্টের কথা **নিজের মুখে, বলিতে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন,**—এ কথাটী সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। বলিয়া যাইবার সময় তাহাকে কোনও বাধা দিতে নাই, তবে যদি বাজে কথা বলে, তবেই বাজে কথা ছাড়িয়া আসল কথা.—তাহার রোগের সম্বন্ধে কথা, বলিবার জন্য উপদেশ দিতে হয়,—এ ছাড়া অন্য কোনও প্রকার বাধা দেওয়া উচিত নয়। রোগীর ভাষা যত ভাল হউক বা যতই মন্দ হউক, **তাহার নিজের ভাষাতেই** লিখিতে হয়। রোগী ইংরাজী বা বাংলা বা হিন্দী যাহাতেই বলিবে, সেই ভাষাতেই অবিকল লিখিয়া যাওয়াই সঙ্গত। মনে করুন, তাহার যাহা যাহা বলিবার, সকলই বলা হইল, তখন ঐ লক্ষণগুলির নীচে লিখিয়া রাখিতে হইবে যে, ঐ সকল কথা বলিবার সময় রোগীর মনের ভাব কিরূপ, বলিতে বলিতে তাহার হাবভাব মেজাজ ইত্যাদি যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য, তাহা লিখিতে হইবে। কেহ হয়ত লক্ষণাদি বলিতে বলিতে কান্দে, কেহ হয়ত ২।৪টী কথা বলে আর একবার করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, কেহ হয়ত নৈরাশ্যের সহিত বলে যে, "আর কি জন্য এ সকল কথা লেখা, চিকিৎসায় কোনও ফল হইবার আশা আমি করি না", অথবা বাঁচিবার অত্যন্ত অভিলাষ জ্ঞাপন করে, অথবা মৃদুস্বরে বলে যে, "আমি আর এ সকল সহ্য করিতে পারিব না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব", ইত্যাদি। এগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এমন কি, রোগী কিরূপ অঙ্গভঙ্গি করে, তাহাও নজর রাখিতে হয়।

অতঃপর যে যে লক্ষণ লেখা হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ দিকে, সংলগ্ন ভাবে, দক্ষিণ ধারের পাতায়, **ঐ ঐ লক্ষণের সম্বন্ধে বিশেষ কথা** লিখিতে হয়। মনে করুন একটী লক্ষণ আছে—"বড় মাথাধরে।" ঐ মাথাধরা লক্ষণটী সম্বন্ধে **বিশেষ কথা,** অর্থাৎ কখন ধরে, কখন আরম্ভ

হয়, কখন ছাড়ে, কিসে, কি ভাবে, শয়নে কি উপবেশনে, কি ঘুরিয়া বেড়াইলে, ইত্যাদি কি কি আচরণে মাথাধরার হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এ সকল কথা রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিতে হইবে। **এই প্রকার প্রত্যেক লক্ষণটীর বিশেষত্ব বেশ করিয়া জানিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হয়।** যখন এই বিশেষত্ব লেখা শেষ হইয়া গেল, তখন রোগীর পরিচর্য্যাকারী বা পিতামাতা প্রভৃতির নিকট রোগীর **মেজাজ, প্রকৃতিগত লক্ষণাদি,** যতদূর পারা যায়, লিখিয়া লইতে হয়। এ সকল কথা রোগীব নিকট ভাল পাওয়া যায় না, কেননা নিজের প্রকৃতির দোষগুণ অনেক সময় লোকে নিজে ধরিতে পারে না, অথবা ধরিতে পারিলেও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না। এ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে জানিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ইহার পর রোগীর **ইচ্ছা অনিচ্ছা,** কি কি করিতে, কি ভাবে থাকিতে, কি কি জিনিষ খাইতে, ভালবাসে, অথবা একেবারে আদৌ ইচ্ছা করে না, সাধারণতঃ ঠাণ্ডায় অভিলাষ, কি গরমে থাকিবার ইচ্ছা, শরীরের অংশ বিশেষে, ঠাণ্ডায় গরমে ইচ্ছার তারতম্য থাকিলে, (অর্থাৎ হয় ত মাথায় ঠাণ্ডা জল চায়, কিন্তু বুক সর্ব্বদা গরম রাখিতে চায়), সে সকল কথা বেশ করিয়া জানিয়া, লিখিতে হইবে। রোগী অনেক সময় বলে—"দুধ খাওয়া ত দূরের কথা, দেখিলে বমি আসে," "মাংস সামান্য খেলে ভয়ানক অসুখ হয়," ইত্যাদি **বিশেষ ইচ্ছা বা বিশেষ অনিচ্ছার** কথা, লিখিয়া রাখিতে হয়। আবার হয়ত রোগী ঠাণ্ডা বা গরম **ইচ্ছা করে,** কিন্তু তাহাতে তাহার **রোগলক্ষণ সকল বাড়ে,** যদি এরূপ অবস্থা থাকে, তবে তাহাও জানিতে হয়। রোগী কোন পার্শ্বে শুইতে ভালবাসে, ইহাও জানা চাই। এই **বিশেষত্বগুলি,** যতই তন্ন তন্ন করিয়া লেখা হয়, ততই ভাল। অনেকবার, অনেক রোগী দেখিলে তবে অভ্যাস জন্মে। একটী কথা যেন মনে থাকে,—রোগী ঠাণ্ডা চায় কি গরম চায়, ঘরের ভিতর

থাকিতে ভালবাসে, কি মুক্ত বায়ুতে থাকিতে ভালবাসে,—তৎসঙ্গে, তাহার অঙ্গবিশেষে এই ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় কি না, অর্থাৎ সাধারণতঃ হয়ত ঠাণ্ডা ভালবাসে, কিন্তু যাতনার সময় হয়ত শীত করে এবং সে সময় সে গরম ভালবাসে ও যাতনার স্থানে গরম লাগাইতে চায়, ইত্যাদি কথা, যতই পরিপুষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইবে, ততই রোগীর চিত্রটী হৃদয়ে ভাল করিয়া প্রতিবিম্বিত হইবে।

উপরোক্ত ভাবে লেখা শেষ হইলে পর, যদি রোগীর কোনও কোনও রোগলক্ষণ **পর্য্যায়ক্রমে** প্রকাশ পায়, তাহা জানিয়া লিখিতে হয়, ও সেই লক্ষণ সকলের ইতিবৃত্তান্ত, বিশেষত্ব ও হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি যত্ন করিয়া লিখিতে হইবে।

ইহার পরে, রোগীর **শরীরযন্ত্রগুলির কার্য্যগত ও আকারগত পরিবর্ত্তনাদি** পরীক্ষা করিয়া লিখিতে হয়। ঐ সকল যন্ত্রে যদি কোনও যাতনা ইত্যাদি থাকে, তাহাও জানিতে হয়। যন্ত্রগুলির দ্বারা শরীরের যে **কার্য্য** সাধিত হয়, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইলে, এবং তাহাদের **আকারের** হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে, তাহাও পরীক্ষা করা ও লেখার প্রয়োজন। এই সঙ্গে মল ও মূত্রের অবস্থা, উদরাময় থাকিলে মলত্যাগের সংখ্যা, মলের আকার, বর্ণ, প্রকৃতি, গন্ধ ইত্যাদি, ও কোন্ অবস্থায় বা কোন্ সময়ে ইহাদের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাহা লিখিয়া লইতে হয়।

এ পর্য্যন্ত রোগী পরীক্ষার বিষয় যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহা নূতন পীড়া ও পুরাতন বা প্রাচীন পীড়া উভয় প্রকার পীড়াতেই প্রয়োজনীয়, তবে নূতন রোগীতে এত বহুল ভাবে লিখিবার প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। কিন্তু প্রাচীন পীড়ায়, এ সকল ছাড়া আরও একটী অতিশয় আবশ্যকীয় অংশ আছে, যাহার বিষয় না লিখিলে কিছুই হইল না। নূতন পীড়া ও প্রাচীন পীড়ার বিভিন্নতা কি, তাহা লিখিবার সময় ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে; সোরা, সাইকোসিস্, ও সিফিলিস্, ইহাদের একটী বা দুটী বা তিনটীই

প্রাচীন পীড়ার রোগীতে' থাকে। যে রোগী পরীক্ষা করা হইতেছে, তাহার শরীরে ইহাদের মধ্যে কি কি দোষ আছে, তাহা অতি অবশ্যই জানা চাই। **এই দোষ শরীরে বর্ত্তমান থাকাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন পীড়ার বিশেষত্ব,**—একথা অনেকবার বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান রোগীতে, ইহাদের মধ্যে কোন্ দোষ বা কোন্ কোন্ দোষ রহিয়াছে, তাহা জানা চাই। এজন্য রোগীর জন্মাবধি **ইতিহাস,** কি কি পীড়া ইতিপূর্ব্বে হইয়াছিল, কিরূপ চিকিৎসা হইয়াছিল, পিতৃপক্ষের ও মাতৃপক্ষের কোনও প্রাচীন পীড়া আছে বা ছিল কি না, মৃত পুরুষেরা কি রোগে মারা গিয়াছেন, তাঁহাদের শরীরে ঐ সকল দোষ বর্ত্তমান ছিল কি না, রোগীর নিজের ঐ সকল দোষ থাকার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে কি না, অর্থাৎ তাহার নিজের উপার্জ্জিত দোষ ঘটিয়াছে কি না,—ইত্যাদি যতদূর পারা যায়, জানিতে হইবে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, রোগীর নিজের পূর্ব্ব ইতিহাস বেশ পাওয়া যায় না। তাহার পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের ইতিহাস প্রায়ই পাওয়া যায় না। রোগীর নিজের, সোরা, সাইকোসিস্, সিফিলিস্ দোষ উপার্জ্জিত থাকিলে তাহাও অনেক সময় প্রকাশ করিতে চায় না, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় নূতন চিকিৎসকদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। যাঁহারা এই কার্য্যে একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের যে অসুবিধা না হয়, তাহা বলিতেছি না, তবে অপেক্ষাকৃত কম। যাহা হউক যদি সেরূপ ইতিহাস না পাওয়া যায়, এবং রোগীও নিজের ইতিহাস অপ্রকাশ রাখিতে চায়, সে স্থলে কি করা কর্ত্তব্য? সেই অবস্থায়, পূর্ব্বলিখিত লক্ষণাবলির ভিতর হইতেই যতটা আভাস পাওয়া যায়, তাহাই লইতে হয়। সোরা, সাইকোসিস্, ও সিফিলিস, **ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চিত্র আছে।** অর্থাৎ শরীরে সোরাদোষ থাকিলে কতকগুলি লক্ষণ শরীরে

মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, সেই প্রকার সাইকোসিস্ ও সিফিলি... প্রত্যেকের কতকগুলি স্বতন্ত্র চিহ্ন বা লক্ষণ আছে,—সেইগুলি ধরিয়া উহাদের কোন্‌টী কোন্‌টী রোগীর শরীরে বর্ত্তমান আছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান করিলে জানিতে পারা যায়। সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিসের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া, এবং বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের উপর ও বিশেষ বিশেষ ধাতুর উপর ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সে সকল প্রণিধান করিলে আপনার রোগীতে কোন্ কোন্ দোষ বর্ত্তমান আছে, তাহা জানিতে পারা যায়। মনে করুন, সিফিলিস্ দোষ মানব দেহের রক্ত ও অস্থির উপর যেরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, এরূপ ক্রিয়া অন্য ধাতুর উপর করে না, আবার সাইকোসিস্, মিউকাস্ ঝিল্লীর উপর যেরূপ ক্রিয়া করে, সেরূপ ক্রিয়া অন্য ধাতুর উপর করে না,—এই প্রকার সোরা। আবার যদি কোনও ধাতুকে সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ উভয়েই দূষিত করে বা ঐ ধাতুর উপর উভয় দোষেরই ক্রিয়া প্রকাশ হয়, সে স্থলেও দেখা যায় যে, প্রত্যেকের ক্রিয়ার বিভিন্নতা আছে। মূত্রযন্ত্রকে সোরা ও সাইকোসিস্ দূষিত করে, কিন্তু যে ভাবে সোরা দূষিত করে, সাইকোসিস্ সে ভাবে করে না। এই প্রকারে প্রত্যেক দোষ, প্রত্যেক যন্ত্র, প্রত্যেক ধাতুর উপর বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়া করে। এমন কি, মানুষের নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, মুখমণ্ডল ইত্যাদি গঠনের উপরেও সোরার, সাইকোসিসের ও সিফিলিসের পৃথক পৃথক ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টি চিকিৎসকের নিকট এড়াইবার উপায় নাই। পূর্ব্বপুরুষের বা নিজের সিফিলিস্ দোষ বর্ত্তমান না থাকিলে অতিরিক্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্মস্রাব অসম্ভব, ঐ প্রকার সাইকোসিস্ বর্ত্তমান না থাকিলে সর্দ্দিস্রাব অসম্ভব। এই ভাবে সোরা, সাইকোসিসের ও সিফিলিসের প্রত্যেকের চরিত্র অধ্যয়ন, অনুচিন্তন ও রোগীশরীরে সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন কার্য্য যে কি মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ, তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

যাহা হউক, রোগীর লক্ষণ সকল অনুধ্যান করিলে, সোরা প্রভৃতি দোষের বর্ত্তমানতা ও ক্রিয়াবৈচিত্র বিষয়ে, অনেক আভাস পাওয়া যায়। এই আভাসের সাহায্যেই যতদূর পারা যায় তাহাই করিতে হয়, নতুবা উপায়ান্তর নাই। সোরা সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ ইহাদের পৃথক পৃথক চিত্র, পাঠকবর্গের আবশ্যক বোধে, পরে লিখিত হইবে।

মহাত্মা হ্যানিম্যান্ উপদেশ দিয়াছেন যে, রোগীর পরীক্ষার সময় তাহাকে যদি কোনও প্রশ্ন করিতে হয়, তবে এমন ভাবে প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়, যাহার উত্তর কেবল মাত্র "হাঁ" কিম্বা "না," হইতে পারে। এই উপদেশ অতি সারগর্ভ। এমন ভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে যেন রোগী প্রশ্নটীর উত্তর সে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ভাষায় দিতে বাধ্য হয়। যে প্রশ্নের উত্তর কেবল "হাঁ" অথবা "না," অথবা যে প্রশ্নের ভাষা এরূপ যে, রোগীর উত্তর দিবার জন্য নিজের ভাষা বা কথা খুঁজিতে হয় না, ঠিক যেন প্রশ্নের ভাষা হইতে সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই উত্তর গঠিত হইতে পারে, এরূপ প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়। যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে "তোমার মনটা অস্থির হয় কি?" ইহার উত্তরে রোগী নিশ্চই হাঁ কি না বলিয়া বসিবে। আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত "তোমার মানসিক অবস্থা কিরূপ? এই প্রশ্নে রোগী উত্তর দিবার ভাষার কোনও সাহায্য পাইবে না, সে নিজের ভাষায় তাহার যথাযথ মাননিক অবস্থা জ্ঞাপন করিবে। যদি জিজ্ঞাসা করেন যে "তোমার প্রস্রাব একটু লালবর্ণের অর্থাৎ কড়া হয় কি?" ইহাতে রোগী হয় ত মনে করিবে যে "কড়া হয়"—বলাই বোধ হয় সঙ্গত, অথবা বোধ হয় এরূপ রোগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ লোকের কড়া প্রস্রাব হওয়াই স্বাভাবিক, এরূপ ধারণায় হয়ত রোগী উত্তর দিয়া ফেলে—"আজ্ঞে হাঁ, কড়া প্রস্রাব হয়।" রোগী সকলেই শিক্ষিত নয়,—মূর্খ ও অশিক্ষিত রোগী অনেক সময়ে মনে করে যে, "হাঁ" উত্তর দিলেই হয়ত চিকিৎসক সন্তুষ্ট হইবেন।

এ সকল কারণে, ও ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য কারণে, প্রশ্ন করার সম্বন্ধে একটু বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

আর এক কথা, রোগী পরীক্ষা কালে যেন মনে থাকে যে, **অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, প্রায়ই দেখা যায় না,** এ প্রকার লক্ষণ বড়ই প্রয়োজনীয়। লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ করিবার সময় এ প্রকার লক্ষণ পাইলে, বা লক্ষ্য করিলে, ইহার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সঙ্গত ও লিপিবদ্ধ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এ বিষয় পরে আরও আলোচনা করিতে হইবে, সেজন্য এখানে উল্লেখমাত্র করিলাম।

অতঃপর আপনার লিখিত লক্ষণাবলি নিজে একবার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিবেন, এবং যদি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে চিত্রটী সম্পূর্ণ হয়, তবে তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, এবং উত্তরও লিখিয়া লইবেন। এ পর্য্যন্ত হওয়ার পর, চিকিৎসক রোগীকে উপদেশ দিবেন,—যদি কোনও ঔষধ এ পর্য্যন্ত ব্যবহার চলিতেছিল, তাহা যেন বন্ধ করা হয় এবং বন্ধ করার পর ৫।৭ দিনের মধ্যে যদি লক্ষণের কোনও ইতরবিশেষ লক্ষ্য করে, তবে যেন চিকিৎসককে সংবাদ দেওয়া হয়। আর যদি অনেক দিন হইতে ঔষধ ব্যবহার বন্ধ ছিল,—তাহা হইলে ত কোনও কথাই নাই।

এক্ষণে আপনি যে সকল লক্ষণাবলি লিখিয়া লইয়াছেন—তাহাদের মধ্যে **যদি কেবল সাধারণ লক্ষণগুলি মাত্র থাকে, তবে ঔষধ নির্ব্বাচন সম্ভব নয়।** বিশেষ লক্ষণ না থাকিলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। কেবল **কতকগুলি ব্যারামের নামে** কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। কেবল রক্তামাশয় বলিলে, অন্ততঃ ৪৫টী ঔষধ আপনার মনে আসিবে, ইহাদের প্রত্যেকেরই রক্তামাশয় আছে। কেবল জ্বর বলিলে আপনি কি করিবেন? একোনাইট্ হইতে জিঙ্কাম্ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই জ্বর আছে। কাজেই যে লক্ষণাবলির মধ্যে এই

প্রকার সাধারণ লক্ষণ, বা পীড়ার কতকগুলি নাম মাত্র আছে, সে লক্ষণাবলি হইতে ঔষধ ঠিক করা প্রায় অসম্ভব। অনেক সময় রোগী বলে "আর কি লক্ষণ বলিব, মহাশয়, মধ্যে মধ্যে মাথা ধরে, ইহার উপায় করুন"। এই মাথা ধরা একটী **সাধারণ** লক্ষণ মাত্র, ইহার **বিশেষ লক্ষণ** না পাইলে আপনি কি করিতে পারেন? এরূপ অবস্থায় কোনও ঔষধ নির্ব্বাচন করা যায় না, এ কথা স্পষ্ট বলাই ভাল। নতুবা যা'তা কোন একটী ঔষধ আন্দাজে দিলে, রোগীর, চিকিৎসকের ও শেষে, হোমিওপ্যাথির অনিষ্ট হয়। আপনার লক্ষণাবলি এরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা চাই, যে **আপনি ব্যতীত অন্য যে কোনও হোমিওপ্যাথ আপনার রেকর্ড দেখিয়া যেন নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হন। তাহা ছাড়া, রোগী পরীক্ষার সময়, অর্থাৎ ঐ সকল লক্ষণাবলি লিপিবদ্ধ করিবার সময়েই যেন ঔষধ নির্ব্বাচন হইয়া যায়,**—মেটিরিয়া মেডিকাতে অতি উত্তম জ্ঞান না থাকিলে তাহা হয় না। নতুবা, বাড়ীতে গিয়া, মেটিরিয়া মেডিকার সব ঔষধগুলি খুলিয়া খুলিয়া তুলনার দ্বারা নির্ব্বাচন করিলে, কেবল "হাতাড়া" বা "হাতড়ান" হয়,লোকে সে চিকিৎসককে "হাতুড়েই" বলে। তবে যদি লক্ষণ সমষ্টি বার বার অনুধ্যান করিয়া দুটী কি তিনটী ঔষধের মধ্যে একটী হইবে, কিন্তু কোন্‌টী হইবে ইহা ঠিক করিতে না পারেন, তবে আপনি পুনরায় রোগীর বাড়ীতে যাইতে পারেন ও এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহাতে উহাদের মধ্যে একটী স্থিরীকৃত হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহার প্রকৃত কৃতিত্ব আছে, তিনি লিপিবদ্ধ করিবার সময়েই নির্ব্বাচন কার্য্য করিয়া লন। রোগী পরীক্ষার সময় দুই চারিটী লক্ষণ বলিলেই, আপনার মনে ঔষধের একটী group আসিয়া পরিবে, এবং সেই group বা দলের মধ্যে কোন্‌টী আপনার রোগীতে লাগিবে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া যাওয়া উচিত।

রোগী পরীক্ষা হইয়া গেলে, এবং লক্ষণসমষ্টি বেশ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইবার পর, নির্ব্বাচনকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হয়। আপনার রেকর্ডটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে, নির্ব্বাচন করা অতি সহজ, বরং আনন্দপ্রদ। উত্তমরূপে লিখিত রেকর্ডের লক্ষণাবলি হইতে পৃথক পৃথক ভাবে যত চিকিৎসকই নির্ব্বাচন করুন না কেন, **একটী মাত্র ঔষধই** নির্ব্বাচিত হইবে,—এবং প্রত্যেকেই সেই একটী ঔষধই নির্ব্বাচন করিবেন। চিকিৎসকের মনে মেটিরিয়া মেডিকার কতকগুলি ঔষধের চিত্র অঙ্কিত থাকে, রেকর্ডটী পাঠ করিলেই রোগীচিত্র, ঐ সকল ঔষধের চিত্রগুলির মধ্যে একটীর সহিত মিল হইয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয়, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রোগীচিত্র পাওয়া বড় কঠিন,—প্রায়ই পাওয়া যায় না। এজন্য নির্ব্বাচন কার্য্য বড়ই সুকঠিন। যাহা হউক, নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে একটু সাবধান হইতে হয় যে, লক্ষণাবলির মধ্যে পূর্ব্ব ব্যবহৃত ঔষধের লক্ষণ (যদি থাকে) এবং প্রাচীন রোগীর সম্প্রতি কোনও নূতন পীড়া হইলে তাহার লক্ষণ, **এই দুই প্রকার লক্ষণ পৃথক করিয়া, সর্ব্বদাই স্থায়ী লক্ষণগুলি লইয়া নির্ব্বাচন করিতে হয়,**—ইহা যেন মনে থাকে। আবার অনেক সময় সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিসের মধ্যে, একটীর অধিক দোষ, রোগীশরীরে বর্ত্তমান থাকে,—এ অবস্থায় কি করিতে হয়, এবং নির্ব্বাচন কার্য্য কি নিয়মে করিতে হয়, তাহাই আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লক্ষণাবলির বিশ্লেষণ। (১)

রোগী পরীক্ষার রেকর্ড অর্থাৎ লিপি প্রস্তুত হইলে পর, দেখিতে হইবে যে, **কি প্রয়োজনে** আমরা রোগী পরীক্ষা করিলাম এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে কি না। আমাদের প্রয়োজন,—**রোগীর** একটী সম্পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট **চিত্র** পাওয়া,—এখন দেখিতে হইবে যে, সেই প্রয়োজন মত লিপিখানি হইল কিনা। রোগীর **চিত্র** না হইয়া কেবলমাত্র কতকগুলি **রোগের নাম** পাইলে, অথবা সেই সেই নামের রোগের কতকগুলি **সাধারণ লক্ষণ** পাইলে কোন ফল নাই, **রোগীর** এবং প্রত্যেক রোগলক্ষণের **বিশেষত্ব** না পাইলে, আমাদের পক্ষে ঔষধ নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব, কোনও নামযুক্ত রোগের **সাধারণ** লক্ষণগুলিমাত্র পাইলে ১০।১২।১৫টী ঔষধ মনে আসিবে, কেন না ঐ সবগুলি ঔষধেই ঐ ঐ লক্ষণগুলি আছে, কিন্তু **বিশেষত্ব** না পাইলে তাহাদের মধ্যে **একটিকে** কিরূপে নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়? অতএব **রোগীরও বিশেষত্ব** চাই এবং **রোগলক্ষণ সকলেরও বিশেষত্ব** চাই,—এটী যেন মনে থাকে। অনেকে বলেন যে, সম্পূর্ণ রেকর্ড প্রায়ই পাওয়া যায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে সম্পূর্ণ রেকর্ড পাওয়া অনেক সময়েই বড় কঠিন। তবে, ইহার কারণ প্রায়ই দুইটী,—১ম. রোগীর অনবধান, অবহেলা এবং দীর্ঘদিন রোগ যাতনা ভোগ করিয়া তাহার কতকটা বিরক্তি এবং কতকটা ধারণা যে, তাহার রোগ লক্ষণের বিশেষত্বগুলি তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; দ্বিতীয় কারণ, চিকিৎসকের মেটিরিয়া মেডিকায় অসম্পূর্ণ জ্ঞান। যদি এই

দুইটী কারণ না থাকে, এবং তাহা না থাকা সত্ত্বেও কোনও প্রকার বিশেষত্ব পাওয়া না যায়, তবে সে অবস্থায় নির্ব্বাচনকার্য্য হইবে না অন্য উপায় কি আছে? কিন্তু এস্থলে একটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—রোগীর অনবধানতা বা চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা জন্য বিশেষত্বের অভাব হইতেছে; অথবা প্রকৃতই বিশেষত্ব নাই? যেখানে প্রকৃতই বিশেষত্বের একান্ত অভাব, সেখানে আপনার নির্ব্বাচন হইবে না, ও শতকরা অন্ততঃ ৮০।৯০টী এরূপ ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা অতিশয় শোচনীয় জানিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে অপ্রিয় কথা না বলিয়া ইহাই বলা উচিত যে, "আমার দ্বারা হইবে না, অন্য কোনও প্রবীণতর চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া যতশীঘ্র পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে পারেন, ততই মঙ্গল,—কেন না, এরূপ রোগী হাতে লইলে কেবলমাত্র অযশের ভাগী হইতে হয়। আর যেখানে রোগীর অবহেলা বা চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার অভাবে, বিশেষত্ব পাওয়া যাইতেছে না, সেখানে আরও পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা প্রয়োজন। পর্য্যবেক্ষণ, রোগীর প্রতি,—এবং গবেষণা, মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে যে শ্রেণীর ঔষধগুলি আপনার মানসপটে উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে যে বিশেষত্ব যে যে ঔষধে আছে, তাহা উত্তম করিয়া অভ্যাস করা ও মনে রাখা। যদি ঐ শ্রেণীর ঔষধসমূহের বিশেষত্বগুলি আপনি মনে রাখিয়া আর একবার রোগী পরীক্ষা করিতে বসেন, তবে নিশ্চয়ই দেখিবেন, যে রোগীর হাবভাব, কার্য্যকলাপ, অভ্যাসাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় আপনি অনেক সন্ধান পাইবেন,—যদি তাহাও না পান, তবে ৫।৬টী কি ৮।১০টী ঔষধের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি ঐ রোগীতে আছে কি না, একথা রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাহির করিতে হইবে। যদিও সাধারণ ক্ষেত্রে, রোগীকে এরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিতে নাই, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে না করিলে উপায়ন্তর নাই,—ইহাতে ঔষধ

নির্ব্বাচনের অনেক সহায়তা হইবে। আমি নিজের অভিজ্ঞতার ফল ব্যতীত একটী কথাও লিখিতেছি না,—আমি নিজের চিকিৎসাকার্য্যে যেরূপ যেরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছি ও যাহা যাহা অবলম্বন করিয়া ঐ সকল অসুবিধা খণ্ডন করিয়াছি, তাহাই সাধারণতঃ লোক-কল্যাণ জন্য লিখিতেছি। আসল কথা,—**প্রত্যেক রোগীর ও রোগ-লক্ষণের বিশেষত্ব চাই, নতুবা হইবে না।** রোগের **নাম,** রোগের **ফল, সাধারণ** লক্ষণ, দশ দশ পাতা হইলেও কোনও কাজে আসিবে না, **রোগীর এবং রোগলক্ষণের বিশেষত্ব** পাঁচটী পাইলেও কাজের হইবে, অন্ততঃ আপনাকে নির্ব্বাচন করিবার পথে কতক সাহায্য করিতে পারিবে।

আর এক কথা, রোগী ও তাহার রোগলক্ষণ সকলের বিশেষত্বগুলি লিপিবদ্ধ করা হইলেই অবশ্য অনেক কাজ হইল বটে, কিন্তু এখনও নির্ব্বাচন করিবার মত প্রস্তুত হওয়া হইল না,—আরও আবশ্যক আছে। পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, রোগীর চিত্র প্রাপ্ত হওয়াই রোগীলিপির উদ্দেশ্য। যে সকল লক্ষণাবলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার ভিতর **রোগীচিত্র ব্যতীত অন্য লক্ষণও** থাকিতে পারে। যেমন একটী বৃক্ষের গায়ে কোনও আগাছা, লতা প্রভৃতিও থাকিতে পারে, ঐ আগাছা বা লতার মূল একেবারে স্বতন্ত্র, আসল বৃক্ষের মূলের সহিত ঐ আগাছা বা লতার মূলের কোনও সম্বন্ধ নাই,—কিন্তু লোকে দূর হইতে মনে করে যে, সর্ব্ব সমেত একটীমাত্র বৃক্ষ, সেইরূপ রোগীলিপিখানি পাঠ করিলে, অন্যে মনে করিতে পারে যে, লিখিত লক্ষণগুলির সমষ্টিতে একটী রোগীচিত্র পাওয়া গিয়াছে, ও প্রত্যেক লক্ষণটীই ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়,;—কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসকের বড়ই সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, কেন না, রোগীলিপিখানিতে লিখিত লক্ষণাবলি উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিলে এরূপ লক্ষণ পাওয়া যায়, **যাহা মূল রোগের সহিত**

আদৌ সম্বন্ধহীন। এ প্রকার লক্ষণ চিনিবার ও ধরিবার উপায় কি? কিরূপে জানা যাইবে যে, কোনও লক্ষণবিশেষটী রোগীর মূল রোগের সহিত অসংশ্লিষ্ট? অবশ্যই জানিবার উপায় আছে, তবে তাহা চিকিৎসকের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপর একান্ত নির্ভর করে। যাহা হউক, কি প্রকারে ঐ প্রকার বাজে লক্ষণ সকল চিনিতে পারা যায়, তাহা জানা অতীব আবশ্যক। রোগীর জন্মাবধি ইতিহাস যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা হইতেই জানা যায়, কিরূপে, কি ভাবে, কখন হইতে প্রাচীন রোগের বীজস্বরূপ সোরা দোষটী,—ঐ রোগীতে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, শাখান্বিত হইয়া আজ একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। আমরা রোগীলিপি হইতে ইহা অবশ্যই জানিতে পারিব যে, আজ যে বৃক্ষটীকে, অর্থাৎ তাহার বিকশিত ও বিপুলায়তন মূর্ত্তিটীকে, "বর্ত্তমান রোগ লক্ষণাবলীর" মধ্যে উত্তমরূপে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছি,—সেই মূর্ত্তিটী **প্রথম হইতে কেমন ভাবে ও কি গতিতে, বীজভাব হইতে এখনকার গঠন ও অবয়ব প্রাপ্ত হইল,**—রোগীর ইতিহাস আমাদিগকে এ বিষয় সাহায্য করিবে ও বলিয়া দিবে। বৃক্ষটী অবশ্যই বীজাবস্থা হইতে **ক্রম-বর্দ্ধমান** হইয়া আজিকার পরিণত মূর্ত্তিতে আসিয়াছে। রোগীর শরীরে যে সময় সর্ব্বপ্রথম বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন হইতে এ পর্য্যন্ত, ক্রমেই বীজ হইতে অঙ্কুর, তাহা হইতে পল্লব, তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা ইত্যাদি বিস্তৃত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে,—বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ২।৪টী লক্ষণ **ঐ প্রকার ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা মধ্যে কোনও সময়ে কোনও কারণে আসিয়া রোগীর দেহে আবির্ভাব হইয়াছে,** এবং রোগদুষ্ট দেহের **উর্ব্বরতা**-প্রযুক্ত তিরোভাব না হইয়া থাকিয়াই গিয়াছে। এই লক্ষণগুলি কিরূপে, কি কারণে আসে? আসিবার কারণ পরে লিখিতেছি,

—কিন্তু এই বাজে লক্ষণগুলি নির্ব্বাচন কার্য্যের সহায় না হইয়া বরং অন্তরায়, একথা চিকিৎসকের মনে রাখিতে হইবে। **নির্ব্বাচনের সময় এগুলি বাদ দিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়**; ফলতঃ, সুনির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়ায় যখন রোগী উন্নতি লাভ করিবে, তখন তাহারা উপযুক্ত **ক্ষেত্রের অভাবে** আপনিই তিরোধান করিবে,—সন্দেহ নাই। আমি তাহা বহু রোগীতে পাইয়াছি ও রোগীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আপনিই অপসারিত হইতে দেখিয়াছি,—ইহাদের জন্য নূতন ঔষধ কখনও নির্ব্বাচন করিতে হয় নাই। এখানে এইপ্রকার বাজে লক্ষণগুলি আসিবার হেতু অবশ্যই জানা চাই। প্রধান কারণ—**এলোপ্যাথিক চিকিৎসা।** এলোপ্যাথিক চিকিৎসাতে রোগীকে আরোগ্য করিবার শক্তি না থাকিলেও নূতন রোগলক্ষণ সকল আনবার শক্তি যথেষ্ট আছে। এলোপ্যাথদিগের ধারণা যে, কোনও যন্ত্র বিশেষের দোষে অন্য যন্ত্র পীড়িত হইয়াছে, তাঁহারা বলেন যে, "লিভারের দোষে এই রোগ হইয়াছে", কিম্বা "কিডনীর দোষে এই রোগ হইয়াছে", ইত্যাদি, এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ঐ প্রকারে যে যন্ত্রকে অপরাধী বলিয়া বা রোগের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করেন, সেই যন্ত্রের উপরই তাঁহাদের অধিক দৃষ্টি জন্য ক্রমাগত ঔষধের উপর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ঐ যন্ত্রটীর প্রথমে কার্য্যগত, শেষ আকারগত, পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলেন,—ইহা অবশ্যই অনেকেই দেখিয়াছেন। যদি এই খানেই যবনিকা পতন হইত, তাহা হইলেও অনেক সুবিধা হইত,—কিন্তু তাহা হইবার নয়। যখন তাঁহারা এক রোগ আরাম করিতে গিয়া আর একটী রোগ আনিলেন, তখনও নিস্তার নাই। যদি লিভারের দোষে জ্বর হইয়াছে, তবে অবশ্যই জোলাপ দিতে হইবে ও লিভার যাহাতে অধিক পিত্ত নিঃসরণ করে, তাহা করিতেই হইবে, ইহাতে যদি আমাশয় দেখা দিল, তবে আমাশয় রোগেরও ঐ "সুপ্রথায়"

সুচিকিৎসা চলিতে থাকিবে। এইরূপে দেখা যায় যে, তাঁহারা নিজেরাই কতকগুলি ব্যাধিলক্ষণের সৃষ্টি করেন, আবার নিজেদেরই সৃষ্ট ব্যাধির চিকিৎসার্থ বা অপসারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে যদি ঐ রোগী আমাদের চিকিৎসাধীনে আসে,—তবে আমরা তাহার এরূপ লক্ষণ কতকগুলি পাইব যে, **সেগুলি এলোপ্যাথির দ্বারা আনা, সেগুলি মূল প্রাচীন পীড়ার সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়।** পূর্ব্ব কথিত বাজে লক্ষণ আসিবার আরও একটী কারণ আছে,—সেটী **নূতন পীড়া**। প্রাচীন পীড়ার দেহে নূতন পীড়া আসলে পুরাতন পীড়ার লক্ষণগুলি চাপা পড়িয়া যায়, কিছুদিন চাপা পড়িয়া থাকিয়া নূতন পীড়াটী সারিলে, আবার—**তাহারা পূর্ব্বাভ্যস্তভাবে দেখা দেয়।** নূতন পীড়া সারিতে না সারিতে রোগীলিপি তৈয়ারী করিলে, অনেক সময় প্রাচীন লক্ষণের সহিতই নূতন পীড়ার লক্ষণগুলি সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়, কেননা কিছুদিন অপেক্ষা করিলেই ঐ লক্ষণগুলি লোপ পায়, এবং প্রাচীন পীডার স্থায়ী লক্ষণ গুলি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। পুরাতন পীডার লক্ষণের সহিত নূতন পীড়ার লক্ষণ কখনই মিশ্রিত হইতে পারে না, এবং যে লক্ষণ মিশ্রিত হইতে পারে না,—তাহাদের চিকিৎসাও একত্রে হইতে পারে না। প্রাচীন পীড়ার লক্ষণ সকল কেবল পরস্পর মিশ্রন হেতু জটীলতাযুক্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়,—তাহার ফলে মেশামেশী ভাব নষ্ট হইয়া তাহারা পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, ও পরিশেষে আরোগ্য হয়। নূতন পীড়ার লক্ষণ থাকিলে তাহা বাদ দিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। উল্লিখিত দুইটী ক্ষেত্র ব্যতীত আরও ক্ষেত্র আছে,—অনেক সময় প্রাচীন পীড়াই ২টী কি ৩টী রোগচিত্র পর্য্যায়যুক্ত ভাবে রোগীতে দেখা দেয়। এটী ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিলে, বোধ হয় সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। মনে করুন, কোনও একটী প্রাচীন

পীড়ার রোগীর বহুদিন হইতে অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে জ্বরলক্ষণও আছে। তাহার জ্বর বড় অদ্ভুদ্ প্রকারের। সে ১ম দিন নির্ম্মল ভাল থাকে, ২য় দিন জ্বর হয়, ৩য় দিন জ্বর হইলেও ২য় দিনের জ্বরের অপেক্ষা অনেক কম, ৪র্থ দিন ভাল থাকে, এই ভাবে পর্য্যায় চলিতেছে,—ইহাকে চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর বলে। দুইদিন ভাল থাকা ও একদিন জ্বর, আবার দুই দিন ভাল থাকা ও একদিন জ্বর, ইহাকে চাতুর্থক বলে। এই চাতুর্থক জ্বরকেই আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "অস্থিমজ্জাগত" বলে, আবার চাতুর্থকের বিপর্য্যয় অর্থাৎ দুইদিন জ্বর ও একদিন ভাল থাকা,—এই জ্বর "অস্থিমজ্জাগত" অপেক্ষা আরও জটিলতর জানিতে হইবে। এই চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন যে প্রাচীন পীড়ার দুইটী বা তিনটী রোগচিত্র একই সময়ে কোনও রোগীকে কিরূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বরে দেখিবেন, দুই দিনের জ্বর **পৃথক্ পৃথক লক্ষণযুক্ত**। প্রথম দিনের জ্বরের লক্ষণ এক প্রকারের, আবার দ্বিতীয় দিনের জ্বরলক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। এ অবস্থায়,—**যে দিনের জ্বরটী বেশী, সেই দিনের জ্বর লক্ষণই আমাদের প্রাচীন পীড়ার রোগীচিত্রের মধ্যে লইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে,** কম জ্বরের লক্ষণ কোনও কাজের নয়। বড় জ্বরটী যাইলে, কম জ্বরটী আপনিই যাইবে। এই প্রকার পর্য্যায়যুক্ত জ্বর বিভিন্ন বিভিন্ন লক্ষণে, বিভিন্ন পর্য্যায়ে, বিভিন্ন দিনে, আসিয়া থাকে। প্রথম দিন এক লক্ষণ, দ্বিতীয় দিন অন্য লক্ষণ, তাহার পর দুই দিন বেশ ভাল, কিন্তু উদরাময়যুক্ত,—এরূপও দেখা যায়। আবার, শরীরের এক অঙ্গে এক প্রকার লক্ষণযুক্ত জ্বর, অপরাঙ্গে অন্য লক্ষণযুক্ত জ্বর, যেন "হর গৌরী" ভাবে থাকিতে দেখা যায়। প্রাচীন রোগবীজ একটীর অধিক সংখ্যায় শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে, জটীলতার ও দুষ্ট লক্ষণের অভাব থাকে না। উপরে যে দু' তিনটী কারণ লিখিত হইল,

ইহা ছাড়া অন্য কারণেও প্রক্ষিপ্ত লক্ষণ সকল রোগীচিত্রে পাওয়া যায়—তবে নির্ব্বাচন কার্য্যে তাহাদের মূল্য অতি অল্প বা একেবারেই নাই,—এটী যেন মনে থাকে।

যদি আরও একটী কথা মনে রাখা যায়, তবে উপরে যাহা আলোচিত হইল,—তাহা আরও পরিষ্কার ভাবে বোধগম্য হইবে। আমাদের প্রয়োজন,—**নির্ম্মল, অবিমিশ্র, অকৃত্রিম চিত্রানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন,**—এইরূপ চিত্র হইলেই নির্ব্বাচন কার্য্যের সুবিধা হয়, নতুবা গোলযোগ ঘটে। রোগী-চিত্র যেরূপ পাইবেন, আমাদিগকে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তাহার উপর আমাদের হাত নাই, তবে তাহার ভিতর কোন্ কোন্ লক্ষণ মূল বৃক্ষের কাণ্ড ও শাখা এবং কোন্ কোন্ লক্ষণ আগাছা, ইহা প্রণিধান দ্বারা বাহির করিয়া কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে হইবে,—ইহাই আসলকথা। যদি তাহাই হয়, তবে নিম্নলিখিত ভাবে রোগীচিত্রটী পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। আমরা যখন কোনও নূতন পীড়ার চিকিৎসা করিতে যাই, তখন রোগীর লক্ষণাদি সংগ্রহ করিয়া মনে মনে হয়ত স্থির সিদ্ধান্ত করি যে, ইহা ব্রাইওনিয়ার রোগী। কিরূপে তাহা স্থির করি? আমাদের স্থির করিবার কারণ এই যে, মেটেরিয়া মেডিকাতে ব্রাইওনিয়ার প্রুভিংএ যেরূপ যেরূপ লক্ষণ ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়াছে, ও যে যে অঙ্গে বা যন্ত্রে লক্ষণ সকল যে ভাবে বিকাশ পাইয়াছে, আমাদের রোগীতেও তাহাই দেখা যাইতেছে,—কাজেই ব্রাইওনিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু তৎসঙ্গেও দেখা যায় যে ব্রাইওনিয়ার লক্ষণসমষ্টি ছাড়া আরও অবান্তর ২।১টী লক্ষণ আমাদের নূতন পীড়ার রোগীতে রহিয়াছে,—এ অবস্থায় আমরা কি করিয়া থাকি? এ অবস্থায় আমরা ঐ ২।১টী লক্ষণের উপর,—উপস্থিত মনোযোগ না দিয়া ব্রাইওনিয়াই প্রয়োগ করি,—ইহাতে রোগী সুস্থ হয়, এবং ঐ ২।১টী লক্ষণ আপনা আপনিই অপসারিত হইয়া থাকে। তবে যদি

তাহারা না যায়, তবে ব্রাইওনিয়ার লক্ষণ সকল অপসারিত অর্থাৎ আরোগ্য হইলে, আবার তখনকার লক্ষণসমষ্টির মত অন্য ঔষধও প্রয়োজন হইতে পারে ও প্রয়োগ করা হয়, এইরূপে নূতন পীড়ায় ১।২।৩টী, কি আরও অধিক সংখ্যক ঔষধ লাগিতে পারে, তবে আমাদের রোগী নিরাময় হয়। প্রাচীন পীড়াতেও তাহাই নিয়ম। প্রাচীন পীড়ার রোগীকে আজ যে ঔষধ দিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, দশবৎসর পূর্ব্বে তাহার রোগ লক্ষণ সংগ্রহ করিলে সেই ঔষধই প্রয়োজন হইত, এমন কি, যখন ঐ রোগীদেহে সর্ব্বপ্রথম বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছিল, তখনও ঐ ঔষধই দিতে হইত। যত দিন যাইতেছে, **ততই ঐ একটী ঔষধেরই প্রুভিং হইতেছে মাত্র;—ততই মূল বৃক্ষটীর নূতন নূতন শাখা প্রশাখার সঞ্চার ও বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র।** অতএব যদি উত্তমরূপে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা দেখা যায়, তবে রোগীচিত্রে কোনও একটী গভীর কার্য্যকারী ঔষধের বহুদিন ধরিয়া প্রকাণ্ড প্রুভিং দেখিতে পাওয়া যাইবে। নূতন পীড়ার ব্রাইওনিয়া, জেল্‌স্‌ বা মার্কুরিয়াসের ৩।৪।৫ কি ৭ দিন ধরিয়া একটী প্রুভিংএর লক্ষণাবলি দেখিয়া যেমন একটী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয় ও বাজে ২।১টী লক্ষণকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাচন করিতে হয়, প্রাচীন পীড়াতেও ঠিক তেমনই ঔষধ নির্ব্বাচনের প্রণালী, জানিতে হইবে। যদি সর্ব্বপ্রথম, রোগীর আর্সেনিকের চর্ম্মরোগ চাপা পড়িয়া প্রাচীন পীড়ার লক্ষণাবলি আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে এতাবৎকাল বরাবরই সে ব্যক্তি আর্সেনিকের রোগী, আজও আর্সেনিক নির্ব্বাচিত হইবে, দশ বৎসর পূর্ব্বেও আর্সেনিকই নির্ব্বাচিত হইত, আরও দশ বৎসর পরে রোগী যদি জীবিত থাকে, তবে আর্সেনিকই নির্ব্বাচিত হইবে। অন্যান্য রোগবীজের সহিত সংমিশ্রনে অবশ্যই জটীলতা বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু আর্সেনিক ব্যতীত অপর কোনও ঔষধে তাহার রোগারোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, যিনি কোনও একটী প্রাচীন পীড়ার

রোগীচিত্রের লিপিতে, প্রথম হইতে একাল পর্য্যন্ত কোনও একটী ঔষধের প্রুভিংএর চিত্র দেখিতে পান, তিনিই যথার্থদর্শী, এবং তিনিই তাহার জটীলতার গ্রন্থি খুলিতে পারেন, অন্যে পারেন না।

তবে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক অবস্থা,—(কেবল যে রোগীর পক্ষে, তাহা নহে, চিকিৎসকের পক্ষেও বটে),—যাহা যাহা আছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটী, বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। প্রথমটী,—**যেখানে একটীর অধিক রোগবীজ**—সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস,—রোগীদেহে বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয়টী,—যে সকল প্রাচীন পীড়ার রোগী ২।৪ **মাস অন্তর অন্তর চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়ায়**, তাহাদের চিকিৎসা ও ঔষধ নির্ব্বাচন। আমি এই দুইটী অবস্থায় কতকগুলি ক্ষেত্রে যে কি কষ্টে পড়িয়াছিলাম, ও অনেক ক্ষেত্রেই অনেক চিকিৎসককে যে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হইবে। যাহা হউক, একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লক্ষণাবলির বিশ্লেষণ। (২)

লিখিত রোগলক্ষণ সকলকে বিশ্লেষণাদি করিয়া কিরূপে নির্ব্বাচন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হয়, তাহা লিখিবার পূর্ব্বে, যে সকল রোগী চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়ায়, কোনও স্থানে স্থায়ীভাবে চিকিৎসা করায় না, তাহাদের বিষয় আগেই ২।৪টী কথায় শেষ করা কর্ত্তব্য, মনে করি। এ সকল রোগীর বিশেষ কোনও উপকার করিতে পারা বড়ই কঠিন। ইহাদের লক্ষণাবলি অতিশয় বিশৃঙ্খলাযুক্ত ও অস্পষ্ট। এই প্রকার রোগীদের বিশৃঙ্খলার ভিতর আবার অনেক তারতম্য দেখা যায়। দুইটী রোগীর বিশৃঙ্খলা এক প্রকারের থাকে না। কাহারও লক্ষণাবলী লুপ্ত, কাহারও এক পীড়ার স্থানে অন্য পীড়া আনীত, কাহারও বা অ'রোগ্যের পথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ইত্যাদি অনেক প্রকার গোলোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করুন, কেহ দীর্ঘকাল এল্লোপ্যাথিতে থাকিয়া, আপনার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিল, তাহার যাবতীয় রোগলক্ষণ সকল চাপা পড়িয়াছে, কেবল কতকগুলি অস্পষ্ট লক্ষণ, যথা মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, অনিদ্রা, আহারে অনিচ্ছা, ইত্যাদি ২।৪টী অবশিষ্ট আছে, অর্থাৎ রোগলক্ষণ সকলকে জোর করিয়া তাড়ান হইয়াছে মাত্র, কিন্তু রোগী আরাম পায় নাই,—এরূপ ক্ষেত্রে, লুপ্ত রোগলক্ষণ সকলকে বাহিরে না আনিলে অন্য উপায় নাই, অথচ তাহা করিবার মত লক্ষণাবলি আপনি পাইবেন না, এবং রোগীও তাহা করাইতে একান্ত অনিচ্ছুক। যেহেতু, তাহার ধারণা, সে ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ে "আরোগ্য" পাইয়াছে, কেবল ২।৪টী মানসিক অস্বস্থির জন্যই আসা। এরূপ অবস্থায় আবার যদি পূর্ব্ব লক্ষণ

সকল ফিরিয়া আনিবার কথা সে ব্যক্তি শুনে, তবে তাহার পছন্দমত কার্য্য হইবে না, কাজেই আপনার যুক্তি শুনিবে না। সে ব্যক্তি প্রকৃত আরোগ্য কাহাকে কহে, জানে না। এ অবস্থায় আপনি কি করিবেন? আবার মনে করুন, বাতের বেদনায়, এলোপ্যাথি কি অন্য কোনও চিকিৎসার ফলে, অহার বাতজন্য যাতনা আর নাই, কিন্তু হৃদ্‌পিণ্ডে বেদনা, ধড়ফড়ানি ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ আসায় আপনার নিকট আসিয়া, তাহার বর্ত্তমান কষ্ট নিবারণ করাইতে চায়। এক্ষেত্রেই বা, পুনরায় বাতের বেদনা ফিরিয়া না আসিলে, আপনি কি করিতে পারেন? আবার মনে করুন, কোনও রোগী কুইনাইন আদি সাহায্যে জ্বরটী তাড়াইয়া পথ্যাদির পর, আপনার নিকট আসিয়া কহিল যে, আর যাহাতে জ্বরটী না আসে, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে। কেহ বা ১০.৫টী ইন্‌জেক্‌সন লইয়া, এখন স্থায়ী উপকারের জন্য আপনার শরণাপন্ন হইল। এ সকল অবস্থা বড়ই গোলমেলে,—পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে একে ত উপায় নাই, তাহার উপর, রোগী তাহাতে রাজী নয়। এলোপ্যাথি ইত্যাদি চিকিৎসায় তাহারা মাসের পর মাস অতিবাহিত করিয়াছে, অজস্র টাকা খরচ করিয়াছে,—কিন্তু হোমিওপ্যাথের নিকট আসিয়াই এক মাত্রাতেই ফল চাই, এবং একবারের অধিক, রোগীকে পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিলে, ধারণা করিবে যে, আপনি কেবল তাহাকে ঠকাইয়া পয়সা লইবার মতলব করিয়াছেন! "এক মাত্রায় আরাম না হইলে আর হোমিওপ্যাথি কি?" অথবা প্রস্রাব, শ্লেষ্মা, রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করাইয়া তাহার রিপোর্টগুলি ফেলিয়া দিল ও কহিল, এই দেখিয়া আপনি বিধান করুন। ইহাদিগকে লইয়া এত বিপন্ন হইতে হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। আবার ইহাদের অপেক্ষা আরও জটীলতর অবস্থার রোগী পাওয়া যায়। মনে করুন, ইতিপূর্ব্বে কোনও উপযুক্ত হোমিওপ্যাথের নিকট চিকিৎসা, কেবল

মাত্র আংশিকভাবে, কয়াইয়া আপনার নিকট আসিয়াছে; কেননা "রোগ সারিবে কোথায়, না, আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণ যাহা আজ অনেক দিন ছিল না, তাহাও দেখা দিয়াছে, আমার ঐ প্রকার চিকিৎসা প্রয়োজন নাই।" অর্থাৎ প্রকৃত হোমিওপ্যাথির নিয়মে সুনির্ব্বাচিত ঔষধের উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ হইবার ফলে, তাহার লুপ্ত লক্ষণ সকল যেমন পরিস্ফুট হইয়া বাহির হইতেছে, ও ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব লক্ষণ সকল দেখা দিতেছে, অমনি রোগী ভীত হইয়া চিকিৎসককে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাইয়া আপনার নিকট উপস্থিত। আপনি যদি এ সকল জানিতে পারেন, তাহা হইলেও কতক মঙ্গল, আপনাকে হয়ত কোনও কথাই প্রকাশ করিল না,—তখন আপনি কি করিবেন? এ অবস্থায় পূর্ব্ব চিকিৎসকের রোগীলিপি এবং নির্ব্বাচিত ঔষধের নাম, শক্তি, প্রয়োগের তারিখ, ইত্যাদি না পাইলে কোনও উপকার সম্ভব নয়। পূর্ব্ব চিকিৎসকের দ্বারা সুনির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়ায় রোগীর রোগ লক্ষণ সকলের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অথবা হয়ত লক্ষণ সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে,—এ অবস্থায় ঔষধ দেওয়া বড়ই বিবেচনা ও চিন্তা সাপেক্ষ। এই সকল ব্যতীত আরও অনেক প্রকারের অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং এস্থলে চিকিৎসকের বিশেষ ধৈর্য্য, গবেষণা, ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। নানা কারণে আমাদিগের দেশে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার উন্নতি হইতেছে না, কারণ, প্রধানতঃ—শিক্ষা, ধৈর্য্য এবং বিশ্বাসের অভাব।

অতঃপর, রোগীলিপির লিখিত লক্ষণ সকলের মধ্যে উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করিয়া নির্ব্বাচনকার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। লক্ষণ সকলের মূল্যের তারতম্য আছে, অর্থাৎ, নির্ব্বাচনকার্য্যে সকল লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সমান নয়। লক্ষণসকল নানাভাবে বিভাগ করা যায়। নির্ব্বাচনকার্য্যের জন্য, প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, রোগী যাহা যাহা নিজে অনুভব করে,—আত্মানুভূত। দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসক বা

অন্যে যাহা যাহা রোগীদের ভিতর দেখে, শুনে ও অনুভব করে,—**পরানুভূত**। আত্মানুভূত লক্ষণের মধ্যে আবার দুই প্রকারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়, অর্থাৎ যে যে লক্ষণ, **ব্যক্তিগত** ভাবে, রোগী বোধ করে,—যথা, "আমি খোলা বাতাসে শয়ন করিতে ভালবাসি," "আমার পিপাসা বোধ হইতেছে" ইত্যাদি লক্ষণ,—রোগীর **সর্ব্বদেহগত**, কোনও স্থানবিশেষে আবদ্ধ নয়, কেননা রোগী নিজে বোধ করে। আবার আত্মানুভূত লক্ষণের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লক্ষণ আছে, যাহা, রোগী অনুভব করিলেও ঐ অনুভবটি তাহার দেহের **স্থানবিশেষে** আবদ্ধ, যথা, রোগী, মনে করুন, তাহার প্লীহার স্থানে সূচীবেধমত যাতনা অনুভব করিতেছে। এখানে অনুভব কার্য্যটী প্লীহাস্থানে নির্দ্দিষ্ট ও আবদ্ধ। কাজেই এই প্রকার লক্ষণ মানসিক বা আত্মানুভূত হইলেও, সর্ব্বাঙ্গগত নয়। আত্মানুভূত লক্ষণের মধ্যে যে সকল লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গগত, তাহাদের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সাধারণ কথায়, **মানসিক** লক্ষণের উপর নির্ব্বাচন কার্য্যের জন্য বিশেষ মনোযোগ করিতে হয়। তন্মধ্যে, সার্ব্বদৈহিক লক্ষণ, সর্ব্বপ্রথম; দেহস্থ স্থানবিশেষে অনুভূত লক্ষণ, দ্বিতীয়, এবং পরানুভূত লক্ষণ সকল সর্ব্বশেষে স্থান পাইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত তরুণ পীড়ার ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রাচীন পীড়ার নির্ব্বাচন করিবার প্রণালী একই, কাজেই বিস্তারিত লিখিবার ততটা প্রয়োজন নাই। কেবল ২।১টা কথা লিখিয়া, প্রাচীন পীড়ার ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার যে একটী বিশেষ বা পৃথক্ নিয়ম আছে তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। রোগীলিপির লিখিত লক্ষণ সমষ্টিই, তরুণ বা প্রাচীন, উভয় প্রকার পীড়ারই, ঔষধ নির্ব্বাচনের ভিত্তি,—কিন্তু **"লক্ষণ সমষ্টি"র অর্থ**, তরুণ পীড়ায় এক প্রকার এবং প্রাচীন পীড়ায় অন্য প্রকার। যে লক্ষণ সমষ্টি ধরিয়া তরুণ পীড়ায় ঔষধ নির্ব্বাচন হয়, প্রাচীন পীড়ায় তাহা হয় না। প্রাচীন পীড়ায় নির্ব্বাচন জন্য লক্ষণ সমষ্টির অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ কথাটি সর্ব্বাদৌ হৃদয়ে উত্তমরূপে

অঙ্কিত করিয়া রাখিতে হইবে। এস্থলে তরুণ ও প্রাচীন পীড়ার **পার্থক্যটি** মনে আনা উচিত। তরুণ পীড়া কিছুদিন পরে আপনিই আরোগ্য হইয়া থাকে, অবশ্য রোগশক্তি অত্যন্ত ভীষণ হইলে রোগীকে মৃত্যুমুখে আনে। ফলতঃ অতি ভীষণ না হইলে তরুণ পীড়ার আরোগ্য হইবার **প্রবণতা** থাকে। কিন্তু প্রাচীন পীড়ায় তাহা নয়, প্রাচীন পীড়ার আপনিই আরোগ্য হইবার **প্রবণতা** নাই। নানাভাবে নানালক্ষণে, নানাযন্ত্রে, নানাসময়ে, শরীরে থাকে ও মধ্যে মধ্যে দেখা দেয়, আপনিই কখনই আরোগ্য হয় না। তাহাকে আরোগ্য করিতে **সূক্ষ্মশক্তির** ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা প্রাচীন পীড়া চিরজীবনের সঙ্গী হয়,—একথা পূর্ব্বে অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। কেন প্রাচীন পীড়ার আরোগ্যপ্রবণতা নাই ? যেহেতু সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ এই সকল প্রাচীন দোষ, প্রাচীন পীড়ায়, রোগী শরীরে থাকে ও তাহাদের প্রত্যেকেরই স্বভাবই এই প্রকার। ইহার বিশেষত্বই এই প্রকার, অর্থাৎ প্রাচীন পীড়ামাত্রেই ঐ ঐ দোষ বর্ত্তমান থাকে, এবং সেইজন্যই স্বাভাবিকভাবে আরোগ্যপ্রবণতা, যাহা তরুণ পীড়ায় দেখা যায়, প্রাচীন পীড়ায় তাহা থাকে না। প্রাচীন পীড়ায় রোগীলিপি হইতেই জানিতে পারা যায় যে, একটী রোগীতে কি কি দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে যে, সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিসের প্রত্যেকটীর লক্ষণাবলি অতি সুন্দরভাবে মনে রাখিতে হয়। **প্রত্যেক দোষেরই বিশেষত্ব আছে**, অর্থাৎ কোনও দোষ কোনও যন্ত্রকে বিশেষভাবে আক্রমণ করে। সেই সকল বিশেষত্ব ও প্রত্যেক দোষের অবস্থিতির পরিচায়ক লক্ষণগুলি ভাল করিয়া মনে রাখিলে, রোগীলিপি হইতে বেশ জানিতে পারা যায়, **কোনও একটী ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দোষ রহিয়াছে।** রোগীর ইতিহাসে, একথা না পাইলেও, রোগীর শরীরস্থ লক্ষণে নিশ্চয়ই

জানা যায়, কেন না, দোষ সকলের "ছাপ", দেহ ও দেহস্থ যন্ত্রাদিতে থাকিবেই থাকিবে। সুপ্ত সোরার লক্ষণ, হ্যানিম্যান তাঁহার "Chronic Diseases', নামক পুস্তকে, সবিস্তার লিখিয়াছেন—এই প্রকার সাইকোসিস ও সিফিলিসের লক্ষণসকল, জানিতে হয়। সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফলিসের লক্ষণ সকল জানা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসাই হইতে পারে না। কেন? আপনি যদি কলেরা বা ম্যালেরিয়া জ্বর, বা বসন্তের **সাধারণ** লক্ষণসকল না জানেন, তবে ঐ ঐ রোগ চিকিৎসা করিবেন কিরূপে? কলেরার **সাধারণ** লক্ষণগুলি জানা থাকিলে, তবে কোন্ কোন্ ঔষধে ঐ প্রকার লক্ষণ পাওয়া যায় তাহা জানিবেন, তাহার পর, আপনার রোগীর **বিশেষত্ব** দেখিয়া ঐ ঐ ঔষধের মধ্যে **বিশেষ** ঔষধটী নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, নতুবা আপনার দ্বারা কলেরা চিকিৎসা হইতে পারে না। সেইরূপ সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ দোষের **সাধারণ** লক্ষণ অর্থাৎ **রূপগুলি** জানা না থাকলে, প্রাচীন পীড়া, অর্থাৎ সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস নামক দোষযুক্ত রোগীদের চিকিৎসা কিরূপে করিবার কল্পনা করিতে পারেন? সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলতম দেহ পর্য্যন্ত, সকল স্থানেই ঐ সকল দোষের কার্য্য রহিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে কোন্ লক্ষণ কোন্ দোষ হইতে উদ্ভূত, আপনার তাহা না জানিলে উপায় কি? এই প্রকার পরিশ্রম ও সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয় বলিয়াই জগতে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার উন্নতি শীঘ্র হইতেছে না। চিকিৎসকদিগের পক্ষেও যেমন গভীর জ্ঞান ও মনোযোগ প্রয়োজন, রোগীদেরও তেমনি ধৈর্য্য ও ব্যয় করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করা বিশেষ আবশ্যক। যাহা হউক, ঔষধ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে প্রধান যথা,—

১মতঃ, এই যে, **আপনার রোগীতে কোন্ কোন্ দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—তাহা জানা।** প্রত্যেক

দোষের সুপ্ত ও বিকশিত লক্ষণাবলি যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে, সেগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তাহার পর, যেখানে কেবল সোরা দোষ থাকে, সেখানে কোনও গোলযোগ থাকে না। যেখানে লক্ষণসমষ্টি হইতে জানা গিয়াছে যে, এই রোগীতে একমাত্র সোরা আছে, সেখানে ঐ সকল লক্ষণসমষ্টি সাদৃশ্যানুসারে একটী এন্টিসোরিক ঔষধ নির্ব্বাচন করিলেই হইল। এস্থলে তরুণ রোগের ঔষধ নির্ব্বাচনের সহিত একমাত্র বিভিন্নতা এই যে, তরুণ রোগে একোনাইট, বেলেডোনা, ইগ্নেসিয়া বা নাক্সভমিকা প্রভৃতি যে কোনও ঔষধ লক্ষণসাদৃশ্যানুসারে নির্ব্বাচন করা চলে, এখানে তাহা চলে না, একটী এন্টিসোরিক ঔষধ স্থির করিতে হয়, এই পর্য্যন্ত। নির্ব্বাচন কার্য্যে আর অন্য কোনও বিভিন্নতা নাই। কিন্তু যেখানে সোরা ব্যতীত আরও একটী বা তিনটী দোষই বর্ত্তমান, সেখানেই জটিলতা, ও একটি **বিশেষ প্রথা** অবলম্বন ব্যতীত নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে পারে না। সেই বিশেষ প্রথাটি কি? তাহা জানিবার পূর্ব্বে আগে ২।১টা পূর্ব্বকথার অনুবৃত্তি করিতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন পীড়ার ১ম নির্ব্বাচন এবং ঔষধ প্রয়োগ।

বাহিরে যে সকল "রোগ" দেখিতে পাওয়া যায়, যথা,—বাত, হাঁপানি, একজিমা, জ্বর, উদরাময় ইত্যাদি, যে গুলি "রোগ" নামে অভিহিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, সে গুলি কেহই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন "রোগ" নয়, তাহারা প্রত্যেকেই সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ অথবা তাহাদের মিশ্রনের ফলমাত্র। ঐ ঐ "রোগ" যখন মানব দেহে দেখা দেয়, তখন জানিতে হয় যে, ইহাদের মধ্যে কেহই স্বতন্ত্র নয়,—সোরা প্রভৃতি দোষ সকল শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া ক্রমাগত নানা নামের ও নানা রূপের পীড়া সকল প্রসব করিতেছে। তাহা ছাড়া, উহারা এই প্রকারেই চিরদিন ধরিয়া প্রসব করিতে থাকিবে, যতদিন না উপযুক্ত ভাবে সমলক্ষণসূত্রে নির্ব্বাচিত উচ্চশক্তির ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা ঐ ঐ মূল দোষের একান্ত নিরাকরণ হয়। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে একটী উই ঢিপিকে যতবারই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা হউক না কেন, আবার কিছুদিন পরে, সেইখানে উইঢিপি তৈয়ার হইয়া উঠে,—এজন্য লোকে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া সেই উই ঢিপিকে অনেক গভীরভাবে তলদেশ পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলে, এবং তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, একটী খুব বড় উই ক্রমাগত ছোট ছোট উই সকল প্রসব করিতেছে,—প্রসব করাই তাহার কার্য্য, এবং যতদিন না সেই বড় উইটীকে বাহির করিয়া মারিয়া ফেলা হয়, ততদিন উই ঢিপি হওয়া কোনও প্রকারেই বন্ধ হয় না। মানব-দেহে সোরা নামক একটী **রোগপ্রসবধর্ম্মী** দোষ আছে, তাহার

কার্য্য,—কেবল নানা নামের ও নানা রূপের রোগ প্রসব করা। যে কাল পর্য্যন্ত ঐ সোরাকে সমূলে বিনষ্ট না করা হয়, ততদিন এক একটী নামের ও এক একটী রূপের তথাকথিত রোগের চিকিৎসা কোন কাজেরই নয়। আবার, সোরাই,—সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ নামক দুইটী দোষের আগমনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে, কেননা যে দেহে সোরা নাই, সেই দেহে ঐ দুইটী দোষ আসিতে পারেনা। এই সামান্য দুই একটী পূর্ব্বকথা স্মরণ থাকিলে তবে বর্ত্তমান আলোচনার সুবিধা হইবে বলিয়া এখানে উহাদের অনুবৃত্তি করিতে হইল।

মানবের জীবননদীর স্রোতটী নির্ম্মল জীবনীশক্তির দ্বারা ক্রমাগত প্রবাহিত থাকিবারই ব্যবস্থা। যদি সুন্দর ও সুস্থভাবে জীবনীশক্তির কার্য্য চলিতে থাকে, তাহা হইলে শরীরস্থ রস, রক্ত, মাংসাদি ধাতুর যথারীতি পোষণ ও স্বাভাবিক ভাবে গঠনাদির কার্য্যও চলিতে থাকে, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি জীবনী শক্তির বিরোধী আর একটী স্বতন্ত্র শক্তি আসিয়া বাধা দেয়, তবে স্রোতটী স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইতে পায় না এবং যথানিয়মে পোষণ গঠনাদি ব্যাপারও চলিতে পারে না। তখন জীবনীশক্তি আর নিজের আয়ত্তে বা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে না, কেননা তাহাকে আর একটী শক্তির অধীনে কার্য্য করিতে হইতেছে। জীবন নদীর স্রোত অবশ্য বহিতেছে, কিন্তু স্রোতটী দূষিত হইয়া বহিতেছে, পোষণ কার্য্য অবশ্যই চলিতেছে—কিন্তু যে স্থানে যতটুকু প্রয়োজন, তাহা না দিয়া কোথাও কম বা কোথাও তদপেক্ষা বেশী দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে কোনও ধাতুর অত্যন্ত কম পুষ্টি ও অন্য কোনও ধাতুর অত্যধিক পুষ্টি হইতেছে; গঠন কার্য্য অবশ্যই হইতেছে, তবে স্বাভাবিক ও সু-গঠন না হইয়া অস্বাভাবিক ও কু-গঠন হইতেছে, যেমন টিউমার, ক্যান্‌সার, স্ফোটক, অর্ব্বুদ, প্রভৃতি। জীবনীশক্তির দ্বারা পরিচালিত জীবননদীর নির্ম্মল স্রোতটী আর বজায় নাই,

—বজায় থাকিলে ঐরূপ হইত না। উপরোক্ত বিরোধী শক্তিটী আরও অন্য দুইটী বিরোধী শক্তির আগমনের পথ প্রশস্ত করে, এবং যে দেহদুর্গটীতে মানবের বাস, সেটীকে একেবারে বাসের অযোগ্য করিয়া ফেলে। এক্ষণে, ঐ দূষিত স্রোতটীকে নির্ম্মল করাই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বিরোধী শক্তিগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলেই স্বাভাবিক জীবনীশক্তি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে এবং সুনির্ম্মল স্রোতটী বহমান হইতে থাকায়, জীবনের কার্য্য ও উদ্দেশ্য সুস্থভাবে চলিতে থাকিবে।

রোগীর রোগলক্ষণসমষ্টি হইতে যদি জানা যায় যে, রোগীর দেহে সোরা ব্যতীত আরও অন্য দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবে ঐ দোষ সকলের নিরাকরণ অর্থাৎ সমূল উৎপাটন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই;—এবং তাহা করিতে হইলে উচ্চশক্তির ঔষধ, সমলক্ষণসূত্রে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে নির্ব্বাচন করিবার প্রথা একটু বেশ প্রণিধান-যোগ্য। যদি সোরা ব্যতীত আরও একটী, বা তিনটী দোষই রোগীশরীরে বর্ত্তমান থাকে, তবে কেবল মাত্র সাধারণভাবে লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্য দেখিলে চলিবে না। সর্ব্বাগ্রে লক্ষণসমষ্টির ভিতর হইতে যে যে লক্ষণের দ্বারা **সোরার** অবস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, সেই লক্ষণগুলির একটী স্বতন্ত্র **সমষ্টি** করিতে হইবে, এইরূপে যে যে লক্ষণের দ্বারা **সাইকোসিস্** দোষের অবস্থান সূচিত হয়, সেগুলি আর একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে রাখিতে হয়, এবং যে যে লক্ষণগুলি **সিফিলিস্** দোষের বলিয়া জানা যায়, সেগুলি ঐ প্রকারে পৃথক করিয়া লইতে হয়। অথবা যদি কেবল সোরা ও আর একটীমাত্র দোষ থাকে, তবে ঐ দুইটী দোষের প্রত্যেকের লক্ষণগুলির একটী করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী করিতে হয়। অতঃপর দেখিতে হইবে, রোগীর শরীরে যে যে দোষ আছে, তাহার মধ্যে কোন্ দোষের লক্ষণগুলির **প্রাধান্য**, অর্থাৎ রোগীর বর্ত্তমান অবস্থায় প্রধান

কষ্ট কোন্ দোষের লক্ষণাবলি হইতে হইতেছে। যদি দেখা যায় যে, সিফিলিসের লক্ষণাবলি হইতেই রোগীর প্রধান যাতনা চলিতেছে, তখন সিফিলিসের যে যে লক্ষণ স্বতন্ত্র সাজান হইয়াছে, সেই লক্ষণগুলির অধিকাংশ যে এণ্টিসিফিলিটিক্ ঔষধের মধ্যে থাকিবে, সেই এণ্টি-সিফিলিটিক্ ঔষধই নির্ব্বাচিত হইবে। আসল কথা, **যে দোষের লক্ষণাবলির প্রাধান্য, তাহার উপরেই প্রথম আঘাত করিতে হইবে।** রোগীদেহে দোষ সকল **একেবারে, একই সময়ে, সকলেই উদ্দীপ্ত বা জাগরিত থাকে না,** একটী মাত্র জাগরিত থাকে, বাকিগুলি, ঐ সময়ের জন্য নিদ্রিত বা সুপ্ত থাকে। যেটি জাগরিত থাকে, সেটীই কার্য্যকরী হইয়া রোগীকে কষ্ট দিতে থাকে, আবার হয়ত সামান্য কোনও উত্তেজক কারণ উপস্থিত হইলেই জাগরিত দোষটী সুপ্ত হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্তদিগের মধ্যে কোনও একটী জাগরিত হয়। কোন্টী জাগরিত হয়? **ঐ উত্তেজক কারণ যেটীকে জাগরিত করিবার মত ক্ষমতাশালী হয়,** সেইটীই জাগরিত হয়। **ফলতঃ এটী নিশ্চিত ও স্বাভাবিক যে, এক সময়ে, কেবল মাত্র একটী দোষই জাগরিত থাকে ও কার্য্য করে, অপরটী বা অপরগুলি, সে অবস্থায় সুপ্ত থাকে।** যে দোষটী জাগরিত থাকিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় রোগীকে কষ্ট দিতেছে, তাহারই **লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্য অনুসারে সেই দোষঘ্ন ঔষধগুলির মধ্যে একটীকে নির্ব্বাচন করিতে হইবে,—ইহাই নিয়ম।** দেখা যায়, কোনও রোগী হয়ত দৃশ্যতঃ বেশ ভালই ছিল, কেবল ২।১টা খোস্ চুলকানি মাত্র দেহের এখানে ওখানে ছিল, এমন সময় হঠাৎ ঝড় বাতাস হইয়া বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া যাওয়ায়, রোগীর ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ ও প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব নির্গত হইতে লাগিল। ইহার অর্থ এই যে, হঠাৎ ঝড় বাতাসে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া ঠাণ্ডা পড়িলে

সাইকোসিসের বৃদ্ধি হয়, কাজেই এই রোগীর এই প্রকার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ অবস্থায় হয়ত চিকিৎসক তাহাকে ডাল্‌কেমারা কি ঐ প্রকার কোনও ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিবেন। এই প্রকারে দেখা যায়, রোগী এক প্রকার ভালই ছিলেন, হঠাৎ ঋতুর পরিবর্ত্তনে কার্ত্তিক মাসে তাহার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইল, এবং তাহার পরই তাহার টিউবারকিউলার লক্ষণ সমস্ত দেখা দিল। এখানে আমি ২।১টী সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলাম, কিন্তু প্রত্যেক ধীর চিকিৎসক তাঁহার ডায়েরীর রোগী-লিপিতে এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইবেন। যাহা হউক, **নিয়ম এই যে, বর্ত্তমানাবস্থায় উদ্দীপ্ত, জাগরিত এবং কার্য্যকারী দোষেরই লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্যানুসারে, ঐ দোষঘ্ন ঔষধের মধ্যে একটি ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।** যথাস্থানে রোগী-তত্ত্বের দ্বারা এই নির্ব্বাচন কার্য্যের প্রণালী আরও স্ফুটতর হইবে।

নির্ব্বাচন কার্য্য হইলে পর, নির্ব্বাচিত ঔষধের **উচ্চ শক্তি** প্রয়োগ করিতে হইবে। কত উচ্চ শক্তি দিতে হইবে, সে বিষয়ে স্থির নিয়ম বাঁধা সম্ভব নয়, কেননা, তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কোনও ক্ষেত্রে, ৩০ শক্তিই প্রথমতঃ যথেষ্ট উর্দ্ধ, আবার অন্য কোনও ক্ষেত্রে, হয়ত, ১০০০ শক্তিও অতি নিম্ন, যেহেতু, বোধ হয়, সেখানে ১০ সহস্র শক্তিই প্রথমেই প্রযুজ্য। শক্তিতত্ত্বের আলোচনা পৃথকভাবে করাই সঙ্গত। এখানে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, উচ্চ শক্তির ঔষধ প্রথমেই দিতে হইবে। কেন? কি **উদ্দেশ্যে** প্রথমেই উচ্চ শক্তির ঔষধ দিতে হইবে? এ বিষয় যদিও ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, তবুও এখানে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন পীড়ার ক্ষেত্রে, প্রায়ই অনেক দিন হইতে, রোগ লক্ষণকে চাপা দেওয়া, অনেক প্রকার চিকিৎসা করা হইয়া থাকে, ইতিহাস হইতে ইহা পাওয়া যায়; তাহা

ছাড়া, যে দোষ বা যে দোষ হইতে প্রাচীন পীড়ার উদ্ভব, সেই দোষ বা সেই সেই দোষের সহিত জীবনীশক্তির বহুদিনের বন্ধন জন্য গ্রন্থি পড়িয়া যায়, কাজেই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য থাকে যে, লুপ্ত, গুপ্ত ও চাপাপড়া সমস্ত জিনিষই যেন প্রকাশিত এবং পুনরাবির্ভূত হয়। এই পুনরাবির্ভাব, লুপ্ত লক্ষণের প্রকাশ এবং দোষ সকলের গ্রন্থি খোলা উদ্দেশ্য থাকিলে, তাহা নিম্ন শক্তির ঔষধের দ্বারা সাধিত হইবার নয়, উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যতীত গভীর ভাবে কার্য্য করিয়া ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে কেহই সক্ষম হয় না। কেহ কেহ হয়ত কহিবেন যে, হ্যানিমান ৩০ শক্তি অথবা কচিৎ ৬০ শক্তির দ্বারাই প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইয়া জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তবে আজকাল এত উচ্চ শক্তির প্রয়োজন কেন হয়? তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, তাঁহার সময়ে মানুষের দেহ এত বিশৃঙ্খলা ছিল না, তখন সাইকোসিস্ দোষ প্রায়ই ছিল না, সামান্য ভাবে যাহা ছিল, তাহা তিনি থুজার দ্বারা এবং নাইট্রিক এসিডের দ্বারাই চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ছাড়া, একেই তিনি "৩০ শক্তির ঔষধ দিতে হইবে" বলার পর চিকিৎসক সমাজে বিষম বিদ্রূপভাজন হইয়াছিলেন—কাজেই তিনি অতি সতর্কে ও ধীরে ধীরে উচ্চ শক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তবে তিনি আরও জীবিত থাকিলে উচ্চতর শক্তির ব্যবহারের পক্ষপাতী হইতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তির পক্ষপাতী হইতেছিলেন, ইহা তাঁহার লিখিত অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও এক কথা, তাঁহার সময়ে, আজকালকার মত এত নানা প্রকারের চিকিৎসা-বিভ্রাট জগতে ছিল না, তখনকার এলোপ্যাথিক ব্যবস্থাদি এখনকার অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল, এত "সূক্ষ্ম" ভাবে, এত "বৈজ্ঞানিক" ভাবে, সর্ব্বনাশ করিবার মত ব্যবস্থা ছিল না।

এখনকার ইঞ্জেক্‌সনাদির ব্যবস্থা এবং পেটেণ্ট ঔষধের যথেচ্ছা ব্যবহার হওয়াতে, লোকের রোগলক্ষণ সকলকে "বেমালুম" চাপা দেওয়া অতি সহজ হইয়াছে। কাজেই আজকালের নানা প্রকারের জটীলতর ও মিশ্রিত দোষযুক্ত ব্যাধির হাত হইতে রোগীকে সুস্থ করিতে হইলে উচ্চতর শক্তি ব্যতীত হয় না। এ কথাও বলিতে হইবে যে, হ্যানিম্যান এত উচ্চ শক্তির ঔষধের এরূপ অমৃতময় আস্বাদ পাইলে, তিনি তাহা সানন্দে ব্যবহার করিতেন ও আরও সুবিধার সহিত এবং আরও শীঘ্রতর কঠিন কঠিন ক্ষেত্রে ফল লাভ করিয়া জগতে আরও আশ্চর্য্যতর চিকিৎসা দেখাইতে পারিতেন। ফলতঃ তিনি শক্তির সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া যান নাই, বরং ক্রমিক উচ্চ হইতে উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তির প্রয়োজন হইবে, তাহার যথেষ্ট আভাস দিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে আর একটী কথা এখানে বলা কর্ত্তব্য মনে কবি। প্রথম নির্ব্বাচন বিশেষ বিবেচনা ও ধীরতার সহিত করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়, এমন কি, প্রায়ই, এই প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধের দ্বারা রোগীর বিশেষ কল্যাণ হইয়া থাকে, তদ্বিপরীতে তাহার অকল্যাণ হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা। হোমিওপ্যাথি ঔষধে অপকার হয় না, এ ধারণা ঠিক নয়। **যে কল্যাণ করিতে পারে, সে অকল্যাণ করিতে অবশ্যই পারে।** প্রথম নির্ব্বাচন কার্য্য অবশ্য বড়ই সুকঠিন, তাড়াতাড়ি হইবার নয়, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত।

যদি প্রাচীন পীড়ার রোগীর সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধ দিবার পূর্ব্বে দেখা যায় যে, **সে ব্যক্তি কোনও তরুণ রোগ লক্ষণে ভুগিতেছে,** অথবা তাহার প্রাচীন পীড়ার রোগলক্ষণের মধ্যে ২।১টীর তরুণ ভাবে বৃদ্ধি দেখা দিয়াছে, তবে তাহাকে সর্ব্বাদৌ ঐ নির্ব্বাচিত ঔষধ না দিয়া, অগ্রে বেলেডোনা, ইগ্নেসিয়া প্রভৃতির ন্যায় অগভীর কার্য্যকরী ঔষধ, তরুণাবস্থায় লক্ষণাদির সাদৃশ্যানুসারে নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ করিয়া

তরুণাবস্থার তীক্ষ্ণতা কমাইয়া লওয়া উচিত। হঠাৎ বন্যাটী কমিয়া গিয়া, যখন নদীর "বারমেসে" স্রোতটী বহমান হইতে থাকিবে, তখনই প্রাচীন পীড়ার জন্য নির্ব্বাচিত ঔষধ উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা প্রবল বন্যার সময় গভীর ও উচ্চশক্তির ঔষধ দিলে রোগীর অনর্থক কষ্টের বৃদ্ধি ও ঔষধের অধিকাংশ শক্তিটুকু বৃথা ব্যয়িত হইয়া যাওয়ায়, ঔষধের পূর্ণ সুফল হইতে রোগী বঞ্চিত থাকে। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় অনেক দিকে নজর রাখিতে হয়।

নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিবার এবং তাহার ফলাফল আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আর একটী কথা না বলিলে, আমাদের মনের সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। বর্ত্তমান কষ্টদায়ক লক্ষণ সমষ্টি লইয়া সমলক্ষণসূত্রেই ত সকল পীড়াতেই নির্ব্বাচন কার্য্য করিতেই হয়, কেবলমাত্র দোষটী জানা ও সেই দোষঘ্ন ঔষধ সকলের মধ্যে যাহার সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য থাকে, সেই ঔষধ নির্ব্বাচন করা, ইহাই ত বেশীর ভাগের মধ্যে করিতে হয়, জানা গেল। কেহ কেহ বলিতে পারেন, "যতক্ষণ আমি সম-লক্ষণসূত্রে ঔষধ দিব, ততক্ষণ ত হোমিওপ্যাথি অনুসারেই নির্ব্বাচন করিতেছি,—সে অবস্থায় আমি যদি দোষের নাম নাই জানি, অথবা কোন্ দোষঘ্ন ঔষধ দিতেছি তাহা না জানিয়াই যদি বর্ত্তমান কষ্টদায়ক লক্ষণ সমষ্টির সমতানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করি, তবে তাহাতে দোষ কি"? অর্থাৎ রোগীর লক্ষণসমষ্টির মধ্যে ১০।১২টী লক্ষণ বর্ত্তমান সময়ে রোগীকে কষ্ট দিতেছে, এবং মনে করুন, সেগুলি সাইকোটিক লক্ষণ, এবং শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, এণ্টিসাইকোটিক ঔষধাবলীর মধ্যে সদৃশতম ঔষধটী নির্ব্বাচন করিতে হইবে। তাঁহারা কহিবেন যে, "সম-লক্ষণসূত্রে ঔষধ দিলেই ত ঐ ঔষধই নির্ব্বাচিত হইবে, তখন সাইকোটিক লক্ষণ বলিয়া জানিবার এবং সাইকোটিক দোষঘ্ন ঔষধ হইতে একটী ঔষধ বাছিতে হইবে, এই সকল উপদেশ বৃথাড়ম্বর মাত্র।"

আমরা বলি, বৃথাড়ম্বর নয়। যে শত্রুর বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধের জন্য আয়োজন ও অস্ত্রপ্রয়োগ করিতেছেন, তাহার **প্রকৃতি জানিতে না পারিলে** বড় অসুবিধা হয়। শত্রু কোথায়, কি ভাবে, আক্রমণ করিতেছে, কোন ঘরে ঢুকিয়া কিরূপ দ্রব্য লুণ্ঠন করা শত্রুর ইচ্ছা, এ সকল না জানিয়া অন্ধকারে শত্রুর প্রতি ঢিল ছোড়ায় যে সকল অসুবিধা,—দোষের নাশ ও কোন দোষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহা না জানিয়া কেবল অন্ধকারে ঔষধ প্রয়োগ করায় সেই সকল অসুবিধা। তাহা ছাড়া, আরও অনেক কারণ আছে, তাহা ক্রমে জানা যাইবে। এখন সকল কথা বলা সম্ভব নয়, ঔষধ দিবার পর ফলাফল হইতেই প্রকৃত তত্ত্ব আপনিই অনুভূত হইবে।

উপরোক্ত ভাবে নির্ব্বাচিত ঔষধের প্রথম মাত্রা প্রয়োগ করিবার সময় চিন্তা করিতে হইবে যে, এক দিন কেবল একটী মাত্রা দেওয়াই কর্ত্তব্য, কিম্বা ঘন ঘন ঔষধ দিয়া প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে, ঔষধ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। রোগীর শারীরিক অবস্থানুসারে তাহা বিচার করিতে হইবে। হ্যানিম্যানের অর্গাননের ৬ষ্ঠ সংস্করণে লিখিত হইয়াছে, যেখানে নিত্য ঔষধ দেওয়া প্রয়োজনীয়, সেখানে প্রত্যেক দিন ঔষধটীর শক্তি কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে বেশ কার্য্যকরী হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নিত্য ঔষধ দেওয়া চলে না। কেননা রোগীর শারীরিক অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, এক মাত্রাতেই কার্য্যারম্ভ হইবার কথা, তখন সে অবস্থায় একমাত্রাই যথেষ্ট, তাহার অধিক দিলে রোগলক্ষণের ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলতঃ কিসে স্থির করিতে পারা যায় যে, এই রোগীতে এক মাত্রা দেওয়াই যথেষ্ট? হইতে পারে, যদি রোগী অত্যন্ত স্নায়বিক ধাতুর হয়, অল্পতেই ভয়, সামান্যতেই অতিশয় আহ্লাদ, সামান্য ঔষধেই ক্রিয়া ইতিপূর্ব্বে কোনও সময় লক্ষিত হইয়াছে, এরূপ স্থলে এক মাত্রাই যথেষ্ট মনে করিতে হয়। অথবা এক মাত্রা দেওয়ার পরে পরেই

হয়ন্ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল, তখনও আর তাহার পরদিন ২য় মাত্রা দিবার ব্যবস্থা নাই। বিপরীত পক্ষে, যদি দেখা যায় যে, রোগী মেদাটে ধাতুর অথচ নিতান্ত দুর্ব্বল নয়, প্রতিক্রিয়া অধিক হইলে সহ্য করিতে পারিবে, এরূপ স্থলে নিত্য এক মাত্রা করিয়া, প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত, দিতে পারা যায়। আবার যেখানে রোগীর যাতনাদি অত্যন্ত বেশী, সেখানেও প্রতিক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ ভাবে মাত্রা দিতে পারা যায়। তবে অন্য যে প্রকার অবস্থাই হউক না কেন, যেখানে রোগীর জীবনীশক্তি অত্যন্ত কম, সেখানে ঔষধের শক্তি অপেক্ষাকৃত নিম্ন হওয়া চাই, এবং প্রথম মাত্রার অধিক প্রয়োগ করিতে সাহস করা উচিত হইবে না। এ বিষয়, প্রতি ক্ষেত্রে, রোগীর সর্ব্বদিকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থির করাই সঙ্গত, তবে এ স্থলে কেবল ইঙ্গিত করা হইল মাত্র। আসল কথা, যেখানে যেমন ভাবে দেওয়া আবশ্যক, তাহা না দিলে ফল লাভ হয় না, এবং অযথা ভাবে সময় নষ্ট হয় মাত্র। মনে করুন, রোগীর প্রথম মাত্রাতে তাহার জীবনীতন্ত্রীতে কোনই ঝঙ্কার উৎপাদন করিল না, এদিকে চিকিৎসক একটী মাত্রা দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, সেইরূপ না হয়। আবার অন্য পক্ষে, এক মাত্রা কি দুই মাত্রাই যথেষ্ট, পরন্তু চিকিৎসক নিত্য এক মাত্রা করিয়া দিতে থাকিলেন, ইহাতে রোগীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। কাজেই চিকিৎসকের ধীর পর্য্যাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক এবং রোগীরও চিকিৎসককে সকল দিকে সুবিধা দেওয়া উচিত। যাহা হউক, যেন মনে থাকে যে, প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিবার জন্য এক দিন এক বার মাত্র ঔষধ দেওয়াই হউক, অথবা প্রয়োজন হইলে নিত্য এক বার করিয়া ততোধিক বার দেওয়াই হউক, **প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই ঔষধ বন্ধ হইবে**, এবং প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যতবারই ঔষধ দেওয়া হউক না কেন, **বুঝিতে হইবে যে**

একটী মাত্রা ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যতবার ঔষধ দিলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, জানিতে হইবে,—তাহার সমষ্টিতে **এক মাত্রা, কেননা জীবনী-তন্ত্রীর একটি ঝঙ্কার উৎপাদন করিবার জন্য ততবারই প্রয়োজন।**

প্রাচীন পীড়ায় রোগীকে তাহার লক্ষণসমষ্টি অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া, ঔষধ একমাত্রা প্রয়োগ করা হইলে, তাহার ফলাফল বিচার করিতে হইবে। কোনও তরুণ রোগীকে ঔষধ দিবার পর ২।৪ ঘণ্টা পরেই তাহার ফলের আভাস পাওয়া যায়, প্রাচীন পীড়ায় তাহা হয় না। প্রাচীন পীড়ায় ৪।৫ দিন হইতে ২০।২২ দিন পর্য্যন্ত, এই ফলের সূচনা পাওয়া যাইতে পারে, বলিয়া আশা করা যায়। এক্ষণে, ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে যদি ভুল হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, তাহা রোগীর লক্ষণসমষ্টি অনুসারে ঠিক হয় নাই, তাহা হইলে কি প্রকারে জানিতে পারা যায়, তাহা (১) আগেই জানা প্রয়োজন। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে ভুল হইয়া থাকে, তবে তাহার উপায় কি? অর্থাৎ ভ্রমক্রমে যদি এক ঔষধের স্থলে অন্য ঔষধ দেওয়া হইয়াছে জানিতে পারা গেল, (২) তবে তাহার সংশোধন কি প্রকারে করা যাইবে? (৩) কি কি লক্ষণে বা চিহ্ন প্রকাশ পাইবে যে, ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হয় নাই, ঠিক ঔষধই দেওয়া হইয়াছে? (৪) কি লক্ষণে জানা যায় যে, ঠিক শক্তি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে বা হয় নাই? (৫) প্রকৃত ঔষধের প্রয়োগ হইলে কি কি আশা করা কর্ত্তব্য, এবং রোগীর উপকার হইতেছে ও হইবে, কি চিহ্ন দ্বারা তাহা জানা যাইবে, এবং অতঃপর কর্ত্তব্য কি?—ইত্যাদি বিষয় সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিবার পর, তবে আবশ্যক হইলে, ২য় নির্ব্বাচনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। একে একে এই সকল প্রস্তাবিত বিষয় বিচার করা হইতেছে।

(১) ও (২),—ঔষধ নির্ব্বাচন বিষয়ে ভ্রম হওয়া এবং অযথা ঔষধ প্রয়োগ অতীব অন্যায় (বিশেষতঃ প্রাচীন পীড়ার রোগীতে), একথা পূর্ব্বে কহিয়াছি। কিন্তু মনুষ্যের ভ্রম হওয়া অতি সাধারণ, কাজেই চিরদিন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নির্ভুল নির্ব্বাচন হইবে, ইহা আশা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ ঔষধ দিবার পর হইতে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে যে, কি জানি, যদি ভুল হইয়া থাকে, তবে যতশীঘ্র সম্ভব, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় রোগীর অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারে তাঁহারা চিকিৎসককে ডাক দিবেন, এ ব্যবস্থা চলে না, চিকিৎসক সর্ব্বদা সতর্ক ও সচেষ্ট ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, এবং তিনি নিজের ঐ প্রয়োজনানুসারে রোগীকে দেখিবেন, এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত, নতুবা প্রাচীন পীড়ায় চিকিৎসা চলে না। ঔষধ দিবার অল্পদিন পরেই যদি দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখা দিতেছে, **যাহা রোগীর একাল পর্য্যন্ত কখনও অনুভব হয় নাই**, তবে জানিতে হইবে যে, **নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই**। প্রাচীন পীড়ায়, রোগীর শরীরে মধ্যে মধ্যে অথবা পর্য্যায়ক্রমে কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে ;— মনে করুন, রোগীর মধ্যে মধ্যে ঠাণ্ডা লাগে ও সর্দ্দি হয়, অথবা মনে করুন, রোগীর মধ্যে মধ্যে আমাশয় দেখা দেয়, অথবা মনে করুন, রোগীর মধ্যে মধ্যে মাথা ঘোরে, এই ভাবে কতকগুলি লক্ষণ প্রাচীন পীড়ার রোগীর মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। ফলতঃ যে লক্ষণ কখনও দেখা দেয় নাই, সেইরূপ লক্ষণ যদি দেখা দেয় ও রোগীর তাহাতে কষ্ট অনুভব হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে, নির্ব্বাচনে ভুল হইয়াছে এবং বিশেষ কষ্টজনক হইলে, তখনই তাহার প্রতিষেধক ঔষধ দিতে হইবে। পরন্তু যদি সেরূপ কিছু না হয়, অর্থাৎ বিশেষ ক্লেশজনক না হয়, তবে কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া, ঐ ভ্রান্ত ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইলে বা প্রায় শেষ হইলে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি দেখা যায়

যে, সুনির্ব্বাচিত ঔষধটী পূর্ব্ব প্রদত্ত ভুল ঔষধের প্রতিষেধক, তবে আর ভুল ঔষধের ক্রিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই,—ভুল হইয়াছে জানিবামাত্রই প্রয়োগ করা উ'চত। সুতরাং প্রাচীন পীড়ায় প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী এবং বিশেষ সাবধান থাকিতে হয়, যেন কোন প্রকারেই ভুল না হয়।
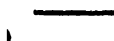
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রথম নির্ব্বাচনের ঔষধের ফল বিচার।

(৩) কি কি লক্ষণে বা চিহ্নে প্রকাশ পাইবে যে, ঔষধ নির্ব্বাচনে ভ্রম হয় নাই, ঠিক ঔষধই দেওয়া হইয়াছে? প্রাচীন পীড়ার আলোচনা করিতে করিতে একথা অনেকবার বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত আরোগ্য কোন্ পথে হইবার আশা করিতে হইবে। যদি ঔষধটি ঠিক মত নির্ব্বাচিত ও রোগীকে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে আগেই ত দেখিতে হয় যে, এ পর্য্যন্ত রোগীর যে যে লক্ষণ মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহারা ছাড়া অপর কোনও **নূতন** লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই। যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে যে ঠিক ঔষধ পড়ে নাই, অর্থাৎ নির্ব্বাচনে ভুল হইয়াছে,—এ কথা ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি। কিন্তু মনে করুন যে, তাহা হয় নাই, রোগীদেহে যে সকল লক্ষণ মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই কতকগুলি দেখা দিয়াছে ও দিতেছে। তখনই কি জানিতে হইবে যে, ঔষধ নির্ব্বাচনের কোনও ভুল হয় নাই?—না, তাহা নয়। দেখিতে হইবে যে, তৎসঙ্গে ঔষধক্রিয়াটী **প্রকৃত আরোগ্যের পথ ধরিয়াছে কি না**। প্রকৃত আরোগ্যপথ ধরা হইলে, তবেই জানিতে হইবে যে, ঔষধ ঠিক দেওয়া হইয়াছে। কি দেখিলে জানিব যে, প্রকৃত আরোগ্যের পথ ধরা হইয়াছে? রোগীর চিকিৎসার পূর্ব্বে, **সর্ব্বশেষে** যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল ও চাপা পড়িয়াছে, সেই সকল লক্ষণ,**এক্ষণে ঔষধ দেওয়ার ফলে,সর্ব্বপ্রথমে** আবির্ভাব হওয়া চাই,—এবং **ক্রমে ক্রমে পিছনদিকের** লক্ষণগুলি আবির্ভাব হইবে ও হইতে থাকিবে। মনে করুন, একটী রোগীর লিপি হইতে জানিলেন যে, সর্ব্বাদৌ তাহার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়, ও উগ্রবীর্য্য

ঔষধাদির প্রয়োগ ফলে তাহা চাপা পড়ে, তাহার কিছুদিন পরে, তাহার অজীর্ণ ও পেট ফাঁপা দেখা গেল, কবিরাজী বা অন্য কোন ঔষধের ক্রিয়ায় সে অবস্থাতেও আরোগ্য না হইয়া আবার চাপা পড়িল, পরে হৃৎপিণ্ডের অধিকতর স্পন্দন ও মাথাঘোরা ইত্যাদি আসিল, এবং সর্ব্বশেষে রোগীর দেহে শোথ দেখা দিল ও তৎসঙ্গে রোগীর চক্ষু হরিদ্রাবর্ণের, শোথের আকারও হরিদ্রাবর্ণের এবং রোগী সকল জিনিসই যেন হরিদ্রাবর্ণ মাখান বাস্তা দেখিতে লাগিল। এই লক্ষণাদি আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া রোগীকে সমলক্ষণসূত্রে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ঔষধের ক্রিয়ায়, **লক্ষণসকলের পূর্ব্বপূর্ব্ব-ক্রমে পুনরাবির্ভাব হইলে,** অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে উদরাময় দেখা দিলে, তাহার পর যে যে লক্ষণে ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছিল, সেই সেই লক্ষণে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দিলে, জানিতে হইবে যে, রোগী আরোগ্যের পথ ধরিয়াছে। আর তাহা না হইয়া যদি **এলোমেলোভাবে** অথবা **পূর্ব্বপূর্ব্ব-ক্রমে না হইয়া অনিয়মিত ভাবে** লুপ্ত লক্ষণ সকলের পুনরাবির্ভাব হয়, তবে জানিতে হইবে যে, **আরোগ্যের পথ ধরা হয় নাই**। প্রকৃত আরোগ্যের পথে, সর্ব্বশেষ লক্ষণ হইতে ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ দিকের লক্ষণের আবির্ভাব হইবে। আবার প্রকৃত আরোগ্যের অন্যান্য নিদর্শনও আছে, তাহাও মধ্যে মধ্যে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অন্যান্য নিদর্শন যথা,—আরোগ্য অর্থাৎ প্রকৃত আরোগ্যের গতি,—**ভিতর হইতে বাহিরে**, মন হইতে শরীরে, অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি হইতে বহিস্থ যন্ত্রাদির লক্ষণে, শিরোদেশ হইতে নিম্নদিকে,—পাদদেশে। এই সকল **নিদর্শন** দেখিলে জানা যায় যে, প্রকৃত আরোগ্য আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রকার **নিদর্শন ও গতির সঙ্গে** যদি দেখা যায় যে, রোগীর লক্ষণসকল **পূর্ব্বপূর্ব্ব-ক্রমে** পুনরাবির্ভাব হইতেছে ও হইয়াছে, **তবেই** জানিতে হইবে,—ঔষধ ঠিকই নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

(৪) কি কি লক্ষণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঔষধের শক্তিটী ঠিক নির্ব্বাচন হইয়াছে? ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, হোমিওপ্যাথিতে কেবল লক্ষণসমষ্টির সাদৃশ্য থাকাই যথেষ্ট নয়, রোগীর রোগশক্তির **অবস্থা বা ভূমির** সহিত ঔষধশক্তির **ভূমির** সাদৃশ্য থাকা চাই। যদি এই ভূমির সাদৃশ্য না থাকে, অর্থাৎ যে শক্তির ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্যের প্রথম ঝঙ্কার উৎপাদিত হইবে, যদি সেই শক্তির ঔষধ প্রয়োগ না হইয়া থাকে, তবে বিশেষ কোনও ফল লক্ষিত হইবে না, এবং ঔষধ না দিলে রোগী যে অবস্থায় থাকিত, ঐ অ-যথা শক্তির ঔষধ প্রয়োগেও সেই অবস্থাতেই থাকিবে। যদি স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, ঔষধ নির্ব্বাচনে কোনও ভ্রম হয় নাই, অথচ ঔষধ দিয়া যথেষ্ট সময় অপেক্ষার পরও লক্ষণাদি তদবস্থাই থাকে, তবে জানিতে হইবে যে, ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন হয় নাই, এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিম্নতর শক্তি ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে উচ্চতর শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। যাঁহাদের মেটিরিয়া মেডিকাতে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকা হেতু আত্মনির্ভরতা কম, তাঁহারা এই স্থলে, **শক্তি** পরিবর্ত্তন না করিয়া **ঔষধ** পরিবর্ত্তন করিয়া, বিষম ভুল করিয়া ফেলেন। এ প্রকার ভুল অতি ভয়ানক, কেননা সহজে সংশোধন হয় না। এই সঙ্গে, একটী কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত মনে রাখা কর্ত্তব্য। ঠিক শক্তির ঔষধ না দেওয়ায় রোগীর লক্ষণের কোনও পরিবর্ত্তন পাওয়া যাইতেছে না, অথচ আরও বিলম্বে পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশা করিয়া বসিয়া থাকা অনেক সময় নির্ব্বোধের কার্য্য হইয়া পড়ে। রোগীর অতি মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট হয়, এবং অনভিজ্ঞ ও নির্ব্বোধ চিকিৎসককেও সমাজে হাস্যাস্পদ ও হেয় হইতে হয়। ৬ষ্ঠ সংস্করণের অর্গেননের নূতন উপদেশানুসারে, সামান্য সামান্য শক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া, নিত্য বা এক দুই দিন অন্তর, উচ্চ, উচ্চতর, এমন কি, উচ্চতম শক্তিরও ঔষধ প্রয়োগ করা চলে, এবং এই নীতি অনুসারে

যে সকল চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রায়ই উপরোক্ত অবস্থায় পড়িতে হয় না। তবে যাঁহারা একদিন একবার মাত্র ঔষধ দিয়া লক্ষণ পরিবর্ত্তন ও ফলের আশা করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে শক্তি নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

(৫) সুনির্ব্বাচিত ঔষধ যথা শক্তিতে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতঃপর কি কি আশা করিতে হয়, কি কি নিদর্শনে জানা যায় যে, রোগীর উপকার হইতেছে, কি হইবে, অথবা ইহার বিপরীত ফল হইবে, এবং প্রত্যেক নিদর্শন উপস্থিত হইলে কি করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। এ সকল বিষয় অতিশয় সুক্ষ্ম এবং বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আজকালের দিনে, ধীর চিকিৎসক মিলিলেও ধৈর্য্যশীল গৃহস্থ পাওয়া বড় কঠিন, সকলেই ২।১ দিনে, ২০।২৫ বৎসরের একটী জটীল রোগীর উপকার আশা করেন। উচ্চশিক্ষিত গৃহস্থও বলিয়া থাকে যে, "২।১ দিনে বা ১টী ডোজে কাজ না হইলে আর হোমিওপ্যাথি কি ?" যাহা হউক, এ সকল বিষয়ের একটু সবিস্তার আলোচনা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। স্বল্প কথায় এ সকল তত্ত্ব পরিষ্কার হয় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১ম নির্ব্বাচনের ঔষধ দিবার পর রোগী পর্য্যবেক্ষণ।

ঔষধ সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং রোগীর রোগশক্তির ভূমির বা স্তরের সাদৃশ্যে, উপযুক্ত শক্তিতে ঔষধটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতঃপর কি আশা করা কর্ত্তব্য? দ্বিতীয় মাত্রার ঔষধ কখন্ প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং কত দিন পর্য্যন্ত হইবে না রোগী সারিবে, কি, সারিবে না, জানিবার কোন চিহ্ন বা নিদর্শন আছে কি না?—ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে আলোচনা করিতে হইবে। মধ্যে একটী কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন,—সুনির্ব্বাচিত ও যথাশক্তির ঔষধটী একমাত্রা, কি দুই মাত্রা, কি তিন মাত্রা, অথবা ততোধিক মাত্রায়, যদি ৬ষ্ঠ সংস্করণের অর্গেননের নিয়মানুসারে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, **তবে যে দিনে, যতগুলি মাত্রার পরে রোগীর রোগলক্ষণ সকলের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে, সেই দিনেই ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে**; ও জানিতে হইবে, যে এতাবৎ দিন ধরিয়া যত বার ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, **তাহার সমষ্টিতে একমাত্রা মাত্র** ঔষধ প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ যতগুলি মাত্রার পর জীবনীতন্ত্রীতে একটী ঝঙ্কার উৎপাদিত হইয়াছে, ততগুলি মাত্রাকেই মোটে **একটি মাত্র মাত্রা** বলিয়া মনে করিতে হইবে। ঝঙ্কার উৎপাদিত হইয়াছে,—কিসে জানিব? যেহেতু রোগীর রোগলক্ষণের পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহাতেই জানা গেল যে, ঔষধটী ঝঙ্কার তুলিয়াছে, এবং এক্ষণে হাতবন্ধ করিয়া কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে হইবে।

সুনির্ব্বাচিত ঔষধ উপযুক্ত শক্তিতে প্রয়োগ করিবার পর, যখনই জীবনীতন্ত্রীতে ঝঙ্কার উৎপাদন হইল, তখন কি কি **আশা করিতে হইবে?** কতকগুলি **পরিবর্ত্তন** আশা করিতে হইবে। যথা,—রোগলক্ষণ সকলের বৃদ্ধি বা উহাদের হ্রাস বা উহাদের অন্তর্ধান, অথবা উহাদের ওলট পালট অর্থাৎ পূর্ব্বের লক্ষণ পরে এবং পরের লক্ষণ পূর্ব্বে, এই প্রকার লক্ষণ সকলের শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। একে একে এগুলির আলোচনা করিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

যদি রোগলক্ষণ সকলের **বৃদ্ধি** লক্ষিত হয়, তবে **বৃদ্ধির বিশেষত্ব** লক্ষ্য করিতে হইবে। **কিসের** বৃদ্ধি. কি **ভাবের,** কি **প্রকারের** বৃদ্ধি? যাহাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইবে, এরূপ বৃদ্ধিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যদিও **রোগলক্ষণ সকলের** বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু রোগী **নিজে** অর্থাৎ **সে মানুষ হিসাবে নিজের ভিতরে আরাম** বোধ করিতেছে। এরূপ বৃদ্ধিতে রোগীর **মনে** স্ফূর্ত্তি আসে, **মানসিক অবস্থা** পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল বোধ হয়। যেখানে রোগী **নিজের ভিতরে** ভাল বোধ করে, যদিও তাহার রোগ **লক্ষণের** বা **বাহ্যিক** লক্ষণের বৃদ্ধি হয়, তাহাতে উপকারই হইতেছে, ইহা জানিতে হইবে। যদিও ২।৩ বারের স্থলে ৫।৬ বার করিয়া মলত্যাগ হইতেছে, অথবা জ্বরের তাপটা হয়ত নিত্য ৯৯° স্থলে, ৯৯°.৫ বা ১০০° হইতেছে, কিন্তু তবু যদি রোগী নিজে বলে, "আমি ভিতরে ভাল বোধ করিতেছি," অথবা তাহা না বলিলেও যদি চিকিৎসক দেখেন যে, পূর্ব্বের বিষণ্ণতার স্থলে অনেকটা প্রফুল্লতা আসিয়াছে, তবে উন্নতিই জানিতে হইবে। কিন্তু যেখানে **রোগের** বৃদ্ধি বলিতে রোগীর **অস্বচ্ছন্দতার** বৃদ্ধি হয়,—কেবল রোগ **লক্ষণের** বৃদ্ধি নয়, তৎসঙ্গে রোগীর **অস্বচ্ছন্দতারও** (যাহা প্রকৃত রোগ) বৃদ্ধি হয়, সেখানে উন্নতি বলিয়া মনে করা যায় না। প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক

বৃদ্ধিতে তাহা হইবে না, প্রকৃত **হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধিতে** রোগী নিজে অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করিবে, তাহার **ভিতরে** আরাম বোধ করিবে।

কেন এরূপ হয়? অর্থাৎ রোগীর স্বচ্ছন্দতা ও তৎসঙ্গে বাহ্য লক্ষণের বৃদ্ধি হইলে, তাহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে **হোমিওপ্যাথিক** বৃদ্ধি বলা যায় ও তাহাতে রোগীর পক্ষে এবং চিকিৎসকের পক্ষে আশাজনক এবং তৎ বিপরীতে নৈরাশ্যব্যঞ্জক, একথা যে জানিতে হইবে বলিয়া বলা হইল,—ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে,—যে ঔষধে প্রকৃত আরোগ্য করিবে, সে সর্ব্বপ্রথমেই **অতি অভ্যন্তরে** ক্রিয়া দেখাইবে এবং তাহার কার্য্যের **গতি** হইবে,—**ভিতর হইতে বাহিরের দিকে**। সর্ব্বপ্রথম যদি **ভিতরে, অতি অভ্যন্তরে**, ক্রিয়া আরম্ভ হয়, তবেই মনের উপর ঐ ফলের অভিব্যক্তি হইবে, এবং **রোগী হিসাবে**—মনের স্তরে রোগী শান্তি উপলব্ধি করিবে। তাহা না হইয়া যদি ঔষধের ক্রিয়া কেবল—**উপরে উপরে** কতকগুলি **বাহ্য লক্ষণের** উপরেই হয়, এদিকে রোগী মানসিক স্তরে কোনও প্রফুল্লতা বোধ না করে, তবেই জানিতে হইবে যে, প্রকৃত উন্নতি নয়, হোমিওপ্যাথিক উন্নতি নয়,—ইহা **আরোগ্য পথের** নিদর্শন নয়। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত আরোগ্যের **গতি কোন্ দিকে**। প্রকৃত আরোগ্যের গতি, **ভিতর হইতে বাহিরে**। সুতরাং সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের ফলে, যদি বাহ্য লক্ষণের বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়, তখন জানিতে হয় যে, ঔষধ ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং কেবলই যে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা নয়, প্রকৃত ক্রিয়া,—যে **ক্রিয়াতে আরোগ্যের সূচনা দিয়া থাকে সেই** ক্রিয়া হইতেছে, কেননা ক্রিয়ার **গতি** দেখিয়া তাহাই উপলব্ধি হইতেছে। আগেই মনের স্তরে ক্রিয়া আরম্ভ হওয়ায় চিকিৎসক

বুঝিলেন ও বুঝিবেন যে ইহা আরোগ্যের সূচনা বটে, কেননা ক্রিয়ার **গভীরতাও** আছে ও গতিটীও সুগতি বা **আরোগ্যের দিকে গতি।** এই সঙ্গে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত। রোগীর অবস্থা যদি সন্দেহ জনক হয়, অর্থাৎ তাহার চিকিৎসা বহুপূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, এবং ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর ক্রিয়ার এত **অধিক গভীরতা** উপলব্ধি হইতেছে যে, তাহাতে এখানকার অবস্থায় রোগীর ক্ষতি হইবে, অনেক দিন পূর্ব্বে যখন রোগীর যথেষ্ট জীবনীশক্তি ছিল, তখন হইলে ফল বড় সুন্দর হইত, এখন এতটা গভীর ক্রিয়া, অতএব, অতিরিক্ত বৃদ্ধি, সহ্য করিবার শক্তি নাই, এরূপ লক্ষ্য করিলে, অবিলম্বে রোগীর বাড়ীর লোককে অবগত করা ভাল। চিকিৎসক আদৌ অন্যায় করেন নাই, তিনি কি করিবেন? তিনি রোগীর অবস্থানুসারেই শক্তি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, রোগীর বাঁচিবার মত জীবনীশক্তি নাই, চিকিৎসক কি করিবেন? তবে ঔষধ দিবার পূর্ব্বেই যদি চিকিৎসক বুঝিতে পারেন যে, এ রোগীকে যে কোনও শক্তির ঔষধ দেওয়া হউক না কেন, তাহারই ফলে যে হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি দেখা দিবে, তাহা সহ্য করিবার শক্তি এ রোগীর নাই, সে অবস্থায় তাহার আত্মীয়স্বজনকে অবগত করা উচিত, এবং যদি তাঁহাদের অনুমতি হয়, তবেই ঐ ঔষধ দিতে হয়, নতুবা কেবল **প্রশমনকারী** ঔষধ দেওয়াই সঙ্গত, কেননা আরোগ্যকারী ঔষধ দিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

এ সকল স্থলে চিকিৎসকের বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সুগভীর অভিজ্ঞতা, বিশিষ্ট জ্ঞান এবং কারুণ্যপূর্ণ হৃদয় থাকা চাই। হয়ত রোগীর এরূপ অবস্থা যে, ৩০ শক্তি কিম্বা ২০০ শক্তি দিলে অনায়াসে বা কোনও প্রকারে সহ্য করিতে পারিবে, অথচ পাছে ফল খারাপ হয়, ইহা ভাবিয়া আরোগ্যকারী ঔষধ দিতে সাহস হইল না, সেটাও পারত পক্ষে যাহাতে না হয়, তাহা চিকিৎসককে দেখিতে হইবে; কেননা রোগীর হয়ত

জীবনের আশা সামান্য পরিমাণে আছে, সর্ব্ব প্রথমে ৩০ বা ২০০ শক্তি আরম্ভ করিলে, রোগী হয়ত আস্তে আস্তে সহ্য করিয়া ক্রমে বল সংগ্রহ করিতে পারিত, ও পরে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তির ঔষধের বৃদ্ধি সহ্য করিয়া আরোগ্যের দিকে আসিয়া আসিয়া প্রাণ পাইতে পারিত,—কেবল চিকিৎসকের নিজের অযশের ভয়ে তাহা হইল না,—এরূপ যেন না হয়। আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিবে,—**কিসে রোগীর কল্যাণ হয়।** আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কহিতেছি যে, ৩০ এবং ২০০ শক্তিতে প্রায়ই সেরূপ অনিষ্ট হয় না, এজন্য সন্দেহজনক অবস্থাতে আমি সর্ব্বপ্রথম ৩০ শক্তি প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিই। তাহার ফলাফল দেখিয়া, তবে ক্রমে উচ্চে উঠিতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে, এখানে একটী বিষয় অবতারণা করিতে বাধ্য হইতেছি। আমি নানাস্থানে অতিপুরাতন ও অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিকেও এই বিষম ভ্রমে পড়িতে দেখিয়া আসিতেছি। নূতন পীড়ায়, চিকিৎসকের অবিবেচনায় অতিশয় নিম্ন শক্তির ঔষধ বার বার অনেকবার প্রয়োগ করার ফলে, রোগীর যে **রোগ** বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, তাহাকেই তাঁহারা **"হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি"** নাম দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নয়। এরূপ বৃদ্ধিকে "হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি" বলা যায় না, অথবা এ বৃদ্ধি চিকিৎসকের পক্ষে নূতন পীড়ার চিকিৎসায় অভিপ্রেতও নয়। কেন না, নূতন পীড়ায় এরূপ শক্তি ঠিক করিয়া প্রয়োগ করা উচিত, যাহাতে বৃদ্ধি না হইয়া একেবারে উপশম আরম্ভ হয়। সে যাহা হউক, নূতন পীড়ায় অতি নিম্নশক্তির ঔষধ বার বার প্রয়োগের ফলে যে বৃদ্ধি দেখা দেয়, তাহা **রোগ** ও **রোগী** এই দুই হিসাবেই বৃদ্ধি, অর্থাৎ **লক্ষণাবলির বৃদ্ধির সঙ্গে রোগীর যাতনা, কষ্ট ও মানসিক লক্ষণেরও** বৃদ্ধি হয়, এবং সেই বৃদ্ধিতে সূচিত হয় যে, প্রযুক্ত ঔষধের মাত্রা **স্থূল** হইয়াছে আরও **সূক্ষ্মহওয়া উচিত ছিল,**—ইহাতে মাত্রার

স্থূলতা সূচিত হয়, আর পূর্ব্বে যে প্রকৃত **হোমিওপ্যাথিক** বৃদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা প্রাচীন পীড়ায় উচ্চশক্তির প্রয়োগের ফলে দেখা যায়, তাহাতে **রোগী আরাম বোধ করে**, কেবল কতকগুলি প্রধান প্রধান লক্ষণের সাময়িক বৃদ্ধি হয় মাত্র। তাহা ছাড়া, তাহাতে সূচিত হয় যে ঔষধ **যথেষ্ট গভীর** ভাবে ও **যথাস্তরে** কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে,—ইহাতে মাত্রার **স্থূলতা** জ্ঞাপিত হয় না। এজন্য হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রকারেরা ইহাকে "হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি" নাম দিয়াছেন, এবং নিম্নশক্তির ঔষধ নূতন পীড়ার রোগীকে বার বার দেওয়ার ফলে যে বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম "ঔষধজ বৃদ্ধি" দিয়াছেন। আমাদের একথা মনে রাখা উচিত।

প্রসঙ্গ হিসাবে এই সকল কথা আলোচনা করা হইল। অতঃপর কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্রাস, ইত্যাদি যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা, এবং পাইলে, কোথায় কি প্রকার ফলের আশা করা যাইবে, তাহা আলোচনা করিতে হইবে। ঔষধ দেওয়ার ফলে পরিবর্ত্তন নানা প্রকারের হইতে পারে। পরিবর্ত্তনের প্রকার, গতি ও শক্তি দেখিয়া **ভাবীফল** ঠিক করিতে হয়। এখানে সর্ব্বপ্রথম, বৃদ্ধির কথা আরম্ভ করা যাইতেছে।

(ক) প্রাচীন পীড়ার এণ্টিসোরিক ঔষধ দিবার ফলে দেখা গেল যে, অনেকদিন ধরিয়া লক্ষণ সকলের বৃদ্ধি চলিতে লাগিল, কিন্তু রোগীর **মানসিক লক্ষণ বা অবস্থার কোনও উন্নতি দেখা দিল না।** প্রথমেই বৃদ্ধি হইয়াছে, এ সংবাদে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অবশ্য আনন্দিতই হইবেন,—কিন্তু তিনি তৎ সঙ্গে বা অল্পদিন পরেই, **রোগীর মানসিক অবস্থার উন্নতি** হওয়া আশা করিবেন। যদি তিনি তাহা না পান, পরন্তু রোগলক্ষণ সকলের ক্রমাগত বৃদ্ধিই চলিতে থাকিল, এ অবস্থায় জানিতে হইবে যে, এ রোগীর প্রতিক্রিয়া আসিবার

আশা বড় অল্প। এ অবস্থায় জানিতে হইবে যে, **রোগী ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে।** আরও জানিতে হইবে যে,—এণ্টিসোরিক ঔষধটী যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা এত গভীর ভাবে কার্য্য করিয়াছে যে, **এ সময়** রোগীর তাহা সহ্য করিবার শক্তি নাই। আরও পূর্ব্বে যখন রোগীর জীবনীশক্তির তেজ ছিল, তখন দিলে হয়ত সুফল ফলিত। যাহা হউক, রোগী ক্রমেই ধ্বংশের পথে যাইতেছে ও যাইবে, এ বিষয় সন্দেহ নাই। এ সকল ক্ষেত্রে, **পূর্ব্বেই সাবধনতা অবলম্বন করিয়া** ৩০ শক্তি, ১০০, কি বড় জোর ২০০ শক্তির অধিক না দেওয়াই সঙ্গত। ফলতঃ, এ রোগী সারিবে না,—ইহাই **ভাবীফল।**

(খ) উপরোক্ত ক্ষেত্রে যদি আরও অনেক দিন পূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ হইত অর্থাৎ যখন জীবনীশক্তির যথেষ্ট তেজ ছিল,—অন্ততঃ এমন তেজ ছিল যে, হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি সহ্য করিয়া প্রতিক্রিয়া আনিতে পারিত, সে অবস্থায় যদি এই ঔষধ এই শক্তিতে প্রয়োগ করা হইত, তবে কি প্রকার ফল দেখা যাইত? **বৃদ্ধি এই প্রকারই হইত,** তবে তাহার পর **আস্তে আস্তে** রোগীর **রোগীহিসাবে** উন্নতির লক্ষণ সকল দেখা দিত,—এবং ক্রমে বাহ্য লক্ষণ সকলেরও হ্রাস অর্থাৎ উপশম দেখা যাইত। এ ক্ষেত্রে জানিতে হয় যে, রোগীর আশা আছে, যান্ত্রিক দোষ বা পরিবর্ত্তন এখনও এমন হয় নাই যে, আর সারিবার আশা নাই, যদিও যান্ত্রিক দোষ যথেষ্টই হইয়াছে এবং প্রায়ই না সারিবার মত হইয়া আসিতেছিল,—আর কিছুদিন গত হইলে বড় একটা আশা থাকিত না।

(গ) ঔষধ প্রয়োগের পর, আরও এক প্রকার বৃদ্ধি লক্ষিত হইতে পারে। বৃদ্ধি হইল, এবং **বেশ জোরের** সহিতই বৃদ্ধি হইল, কিন্তু **অতি অল্প সময় স্থায়ী, ও এই বৃদ্ধির অতি অল্প সময় পরেই,** রোগীর **রোগীহিসাবে** যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। এখানে

দেখা যায় যে, **রোগীর উন্নতি অনেক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে।** এমন কি, প্রায়ই, আর অন্য ঔষধের আবশ্যক হয় না। এটী বড়ই সুখজনক অবস্থা, রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের পক্ষেই আনন্দজনক এবং আশাপ্রদ। এ রোগীর **ভাবীফল,—নিশ্চিত আরোগ্য।**

উপরোক্ত যে কয়টী ক্ষেত্র আলোচিত হইল, সেগুলি ঔষধ দিবার ফলে বৃদ্ধির ক্ষেত্র। আবার এমন ক্ষেত্রও আছে, যেখানে আদৌ বৃদ্ধি না হইয়া অন্য প্রকার ঘটনা ঘটে। এক্ষণে সেগুলিই আলোচিত হইবে।

(ঘ) কোনও ক্ষেত্রে যেখানে প্রাচীন পীড়া অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই, কেবলমাত্র যন্ত্রাদির **কার্য্যগত** বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এখনও **যন্ত্রগত** বা যন্ত্রের আকারগত পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, সে স্থলে ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর **আদৌ বৃদ্ধি দেখা দেয় না,** তৎপরিবর্ত্তে **প্রথম হইতেই উপশম বোধ হইতে থাকে, ও রোগীর মানসিক এবং দৈহিক অসুবিধা, কষ্ট ও লক্ষণ সকল ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে থাকে,** এবং অবিলম্বে রোগী স্বচ্ছন্দ বোধ করে ও রোগনির্ম্মুক্ত হইয়া উঠে। এই প্রকার আরোগ্য, আমরা প্রায়ই নূতন পীড়ায় পাইয়া থাকি। যদিও সামান্য বৃদ্ধি পাইবার পর উপশম দেখা দিলে বড়ই ভাল হয় এবং চিকিৎসক তাহাই ইচ্ছা করেন, কেননা, প্রথমে সামান্য বৃদ্ধি দেখা দিয়া তাহার পর উপশম হইলে জানা যায় যে, ঔষধ গভীরভাবে কার্য্য করিয়াছে; তাহা হইলেও এ প্রকার আরোগ্য বিশেষ বাঞ্ছনীয়, কেননা তিনি ইহার দ্বারা জানিতে পারেন যে, তাঁহার ঔষধনির্ব্বাচন ত নির্ভুল বটেই, শক্তিনির্ব্বাচনও ঠিকই হইয়াছে, তাহা ছাড়া, রোগীর কোনও বৃদ্ধি লক্ষণ না আসায়, তাহার কোনও প্রকার অসুবিধা ঘটে না। এজন্য এ প্রকার আরোগ্যকে বেশ উচ্চাঙ্গের আরোগ্য বলা যাইতে পারে।

(ঙ) আবার দেখা যায় যে, **সর্ব্ব প্রথমেই উপশম** বোধ হইয়া

তাহার পর সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা দেয়। ঔষধ দিবার ২।৪ দিনের মধ্যে রোগী আনন্দের সহিত সংবাদ দিয়া থাকে যে, তাহার বিশেষ উপশম বোধ হইয়াছে,—কিন্তু আরও ৫।৭ দিন পরে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা রোগ যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে, কি জানিতে হইবে? জানিতে হইবে যে, ঔষধটী গভীর ভাবে কার্য্য করে নাই, কেবল **ভাসা ভাসা, উপরে উপরে, কার্য্য** করিয়াছে মাত্র; কেন? অনেক সময় রোগীর লক্ষণাদি ও নির্ব্বাচিত ঔষধের লক্ষণাদি তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল হইয়াছে। উপায় কি? উপায় এ ক্ষেত্রে বড় সহজ নয়। এখন, অপেক্ষা করা ব্যতীত অন্য কি করিতে পারা যায়? কিছুদিন অপেক্ষার পর দেখা যায় যে, রোগী, ঔষধ সেবন করিবার **পূর্ব্বের মতই**, লক্ষণাদি সহ উপস্থিত হয়, তখন নির্ভুল ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়। কিন্তু যদি **তদপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্তি অথবা অধিক গোলোযোগপূর্ণ ও জটীল ভাবে** লক্ষণাদি দেখা দেয়, তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়, এবং দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করিবার পরেও যদি পূর্ব্বেকার "বারমেসে" ভাব না দাঁড়ায়, তখন, সে জটীলতর অবস্থার মতই ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিত,—তবে এরূপ যেমন না ঘটে, ইহা ভাবিয়া চিকিৎসকের **বিশেষ সাবধানে প্রথমবার নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। প্রথম নির্ব্বাচনে ভ্রান্তি ঘটিলে নানা অসুবিধা হইয়া থাকে**—একথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত।

উপরোক্ত অবস্থায়, অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে, ঔষধ দিবার পর **সর্ব্বপ্রথমেই উপশম** হইয়া পুনঃ সকল লক্ষণের **বৃদ্ধি** পাইতেছে, তখন যে এরূপ সকল ক্ষেত্রেই ঔষধ নির্ব্বাচনে ভুল হইয়াছে বলা যায়, তাহা নয়। যদি পুনরায় লক্ষণাদির তুলনা ও বিচার করিবার পর দেখা যায় যে, ঔষধ নির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছে,—সেখানে প্রায়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করা সঙ্গত যে, বোধ হয়, রোগীর আরোগ্য হইবার আশা বড়ই কম। তবে

আগেই নিজের যে কোনও ভ্রম প্রমাদ হয় নাই এবং নির্ব্বাচন একেবারে অভ্রান্ত হইয়াছে, এটী নিশ্চিত ভাবে ঠিক করিতে হয়। সে বিষয়ে যদি কোনও ভ্রম না থাকে, তবে রোগীর অবস্থা সন্দেহজনক, ইহা স্থির করা প্রায়ই সঙ্গত।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ঔষধ দিবার পরে উপশম হইলেই যে সকল সময় আনন্দের কথা,—তাহা না হইতে পারে। আবার এরূপ ক্ষেত্রও ঘটে, যেখানে রোগীর লিপি ও মেটেরিয়া মেডিকা বিশেষ প্রণিধান সহিত বিচার করিয়া কোনও অতি গভীর কার্য্যকারী ঔষধ যথা,—সালফার কিম্বা সোরিনাম, কিম্বা ল্যাকোসিস বা আইওডিন্ ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় কোনও একটী নির্ব্বাচন করা হইল, এবং ঐ ঔষধটী প্রয়োগের পর দেখা গেল যে, শীঘ্রই সর্ব্বাদৌ উপশম হইল বটে, কিন্তু সেই উপশম **অধিকদিন স্থায়ী না হইয়া অতি অল্পস্থায়ী হইল, ও তাহার পরেই রোগী সকল দিকেই খারাপের পথে চলিতেছে।** যেখানে অতি গভীর কার্য্যকরী ঔষধ উচ্চতর শক্তিতে প্রয়োগ করিবার পর "**ধাঁ করিয়া**" উপশম ঘটিয়া **অতি অল্পদিন** স্থায়ী হয়, **সেখানেও রোগীর অবস্থা সন্দেহজনক**। কেন? এই জন্য সন্দেহজনক যে, ঔষধ দিবার পরই **হঠাৎ** উপশম হয় ও ঐ উপশম অতি **অল্পস্থায়ী** হইয়া বৃদ্ধি লক্ষণ আসে,—ইহার দ্বারা অনুমান করিতে হইবে যে, নির্ব্বাচনের কোনও ভ্রম নাই তবে, ঔষধের উপশম ক্রিয়া স্থায়ী না হওয়ার একমাত্র কারণ,—**রোগীর অন্তরস্থ কোনও কিছু এই কার্য্যকে নষ্ট করিতেছে।** যদি ঔষধের কার্য্যকে প্রতিষেধ বা নষ্ট করিতে পারে এরূপ কোনও জিনিষ, রোগী ইতিমধ্যে ব্যবহার না করিয়া থাকে, তবে রোগীর **দেহ মধ্যস্থ কোনও দোষ ব্যতীত,** এই ক্রিয়ার বাধা কে দিতেছে? এই দোষ, সোরা, সাইকোসিস্ বা সিফিলিস্ দোষ হইতে পারে না,—কেননা নির্ব্বাচিত ঔষধই

ইহাদিগকে কাটিয়া নিজে পথ করিবে। তবে কে বাধা দিতেছে? নিশ্চয়ই অনুমান করিতে হইবে যে, **রোগীর দেহস্থ কোনও অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র একেবারে নষ্ট হইয়াছে, অথবা এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে, আর মেরামতের উপায় নাই।** ইহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সাব্যস্ত হইতে পারে না। ফলতঃ এই প্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে আমরাই, অর্থাৎ বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্রজ্ঞেরাই, পর্য্যালোচনার দ্বারা এ সকল গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম, অন্যে আরও যদি কেহ সক্ষম, তবে যোগী—যোগবলের দ্বারা,—নতুবা কেহই সক্ষম নয়। যাহা হইক, যেখানে আগেই উপশম **দেখা** দেয়, সেখানে যদি উহা **আস্তে আস্তে ও ক্রমে ক্রমে** দেখা দেয় ও ঐ উপশম **স্থায়ী** হয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যেখানে অতি **অল্প সময় মধ্যে হঠাৎ** উপশম আসিল ও তাহা **স্থায়ী হইল না**, সেখানে উপরোক্ত মীমাংসা ব্যতীত অন্য কোনও মীমাংসা হইতে পারে না।

(চ) ঔষধ প্রয়োগের পর আবার আরও এক প্রকারের উপশম আসিতে দেখা যায়, **সে উপশম আবার অনেক দিন ধরিয়া স্থায়ীও হয়।** কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, **সে উপশম,—উপশমের মধ্যেই নয়, কেন না, তাহাতে রোগী নিজে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না,**—কেবল কতকগুলি **বাহ্যিব** লক্ষণের উপশম হয় মাত্র। যেখানে রোগের কতকগুলি লক্ষণমাত্র উপশম হইলেই "ভাল হইল" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, সেখানে **আমাদের হিসাবে** "ভাল হওয়া" হইবে না। আমাদের হিসাবে "ভাল হইতে গেলে", আগে **রোগী** স্বচ্ছন্দবোধ করা চাই, তাহার পর **ভিতর হইতে বাহিরে,** ঐ উপশমটী, ঠিক যেন "প্রবাহিত" হইয়া, রোগের লক্ষণ সকলকে উপশমিত করিবে। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় দেখা যায়, **যে কোনও প্রকারে বাহ্যিক রোগলক্ষণ সকলের**

তিরোভাবকেই "আরোগ্য" বলিয়া কথিত হয়। আমাদের "প্রকৃত আরোগ্য" কাহাকে কহে, তাহা অনেকবার আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমাদের চিকিৎসায় যখন দেখা যায় যে, গভীর কার্য্যকারী ঔষধ উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ হইবার পরে যথেষ্ট সময় ধরিয়া উপশম থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে রোগী, **রোগী হিসাবে** অর্থাৎ তাহার **মনঃস্তরে,** কোনও উপশম বোধ করে না, সেখানে জানিতে হইবে যে, **এ রোগীকে প্রকৃত আরোগ্য করা যাইবে না,** কেন না, এ স্থলে তাহার ভিতরে এমন কোনও "গলদ" আছে যে, তাহা বাহিরে আনাও বড় কঠিন, অথবা আনিতে পারিলেও রোগী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এজন্য এ অবস্থায় বাহিরে আনিবার ভরসা করা অতি অসঙ্গত ; কাজেই ইহাকে ঐ প্রকার উপশমসাহায্যে "যতদিন চলে",—এই নীতি অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। এ সকল রোগী বড় সাবধানে চিকিৎসা করিতে হয়, ও তাহার বাড়ীর লোককে বলা উচিত যে, ঐ প্রকার উপশম ব্যতীত অন্য কিছু সম্ভব নয়, তবে এলোপ্যাথির উপশম অপেক্ষা আমাদের দ্বারা এই প্রকার উপশম অনেক ভাল ও বাঞ্ছনীয়। দেখা যায় যে, এ রোগীকে যে কোনও ঔষধ, যে শক্তিতেই দেওয়া যাক্ না কেন, ফল উহার বেশী কখনই হইবে না।

এতদূর পর্য্যন্ত কি বিচার করা হইল ? বিচার করা হইল,—ঐ সকল ক্ষেত্রে, যেখানে প্রাচীন পীড়ায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে, সর্ব্বাদৌ "বৃদ্ধি" আসিলে অথবা সর্ব্বাদৌ "উপশম" আসিলে, কি প্রকার **ভাবীফল** নির্ণয় করিতে হইবে। কি প্রকার চিহ্ন, কি নিদর্শন দেখিলে, রোগীর পক্ষে ভাল বা মন্দ বা কি প্রকার ভাবীফল হইবে, তাহাদের মধ্যে যেখানে আগে বৃদ্ধি ও আগে উপশম দেখা যায়, সেই

গুলিরই বিচার করা হইল। এ সকল ব্যতীত আরও অন্য প্রকার পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়, তাহাদের বিচারও এই প্রসঙ্গেই করা উচিত। যদি কোনও কোনও কথা ইতিপূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি হইবে, তবুও প্রসঙ্গক্রমে না বলা অসঙ্গত হইবে, তাহা ছাড়া, এ সকল তত্ত্ব পুনরুক্তিতে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হয় না। যতই বার বার এ সকল আলোচনা হয়, এ সকল সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্ব ততই দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

(ছ) ঔষধ প্রয়োগের পরে বৃদ্ধিও হইল না, হ্রাসও হইল না.—কি হইল? কতকগুলি **নূতন নূতন লক্ষণ, যাহা রোগী এতাবৎকাল অনুভব করে নাই,** এরূপ কতকগুলি লক্ষণ আসিতে লাগিল। এ অবস্থায় কি জানা যায়? এ অবস্থায় জানা যায় যে, ঔষধ **নির্ব্বাচনে ভ্রম** হইয়াছে। উপায় কি? উপায়,—অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করিলে কিছুদিন পরে রোগী যদি ঠিক তাহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বের অবস্থা আসে, তখন কেবল ঔষধটী পরিবর্ত্তন করিয়া, এক্ষণে সুবিচারের সহিত নূতন করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা ও প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। আর যদি তাহা না হইয়া কতকগুলি নূতন লক্ষণ স্থায়ীভাবে রোগী দেহে থাকিয়া যায়, এবং যথেষ্ট অপেক্ষা করা সত্ত্বেও সেগুলি না যায়, তবে রোগীলিপিতে সেই নূতন লক্ষণ কয়টী সন্নিবেশিত করিয়া লইয়া, পূর্ব্বলিখিত লক্ষণ সকল ও এক্ষণে লিখিত নূতন লক্ষণ সকল, **একটী সমষ্টি করিয়া** তদনুসারে নির্ব্বাচন ও ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

(জ) আবার আরও এক প্রকার ক্ষেত্র ঘটে,—ঔষধ প্রয়োগ করিবার পর, কতকগুলি **বাহ্য লক্ষণের উপশম হইল,**—কিন্তু তৎসঙ্গে রোগীদেহের **অভ্যন্তরীণ কোনও যন্ত্র আক্রান্ত** হইল। আমি নিজের চিকিৎসায় অনেক সময় রোগীর বাড়ীর লোকের বিশেষ

অনুরোধে বা নিজেই ভ্রমক্রমে একজিমার বাহিরের লক্ষণগুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়া ঔষধ দিয়াছি এবং তাহার ফলে একজিমা কমিয়া আসার (প্রকৃত আরোগ্য নয়) সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ উদারাময় বা দারুণ নিউরেল্‌জিয়া অর্থাৎ স্নায়ুশূল দেখা দিয়াছে। জানিতে হইবে, ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া **বাহিরের** লক্ষণগুলির দিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, রোগীর **ধাতুগত লক্ষণের** প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই,—আসল কথা, **রোগীর** জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন হয় নাই,—**রোগের** জন্য হইয়াছে। ঔষধটী ক্রিয়া আরম্ভ করিলেও, নির্ব্বাচনের দোষে, ক্রিয়ার **গতিটী আরোগ্যের** গতি হইতে পারে নাই। **আরোগ্যের গতি,—ভিতর হইতে বাহিরে,—** এ ঔষধের গতি ঠিক বিপরীত দিকে হইয়াছে। বাহ্যলক্ষণে ঔষধ নির্ব্বাচন কত ভয়ানক ! ঔষধের এই প্রকার ক্রিয়াকে ইংরাজীতে মেটাষ্টেসিস্‌ (metastasis) কহে। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে উপায় কি ? উপায়—ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া প্রতিষেধক ঔষধ দিয়া নির্ব্বাচিত বা অপনির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়াকে নষ্ট করা ব্যতীত উপায় নাই। তবে তাহা করিবার পূর্ব্বে রোগীর আত্মীয় স্বজনকে সকল কথা বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে তাহারা মনে করে যে "একজিমা ত বেশ গিয়াছিল,—এ একটা **নূতন** রোগ হইয়াছে, তাহার আবার প্রতিকার করিলেই চলিবে।" তাহা ছাড়া, লোকে প্রকৃত উপকারকে অপকার বলিয়া ভাবে, এজন্য হৃদয়বান্‌ ও ধার্ম্মিক চিকিৎসককে অনর্থক লোকের বিরাগভাজন হইতে হয়। অতএব, এ সকল যাহাতে না ঘটিতে পারে, সেজন্য রোগীর আত্মীয়দের অনুমতি লইয়া কার্য্য করা ভাল। বিশেষতঃ যাহার এই প্রকার ম্যাটাষ্টেসিস্‌ হইয়াছে, তাহার ঐ একজিমা পুনরায় বাহির না হইলে আরোগ্য হইবার উপায় নাই, এ কথাও উত্তমরূমে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে, ঔষধের ক্রিয়ায় প্রকৃত আরোগ্য করিবার মত

ধারা কি প্রকার, তাহা না বলিলে অসম্পূর্ণ হইতে পারে। প্রাচীন পীড়ায় রোগীকে ঔষধ দিবার পর নিম্নলিখিত মত ঘটনা ঘটিলে জানিতে হইবে যে, প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক আরোগ্য হইবার সূচনা হইয়াছে,—অবশ্য নির্ভুল নির্ব্বাচন এবং রোগীর অসাধ্য অবস্থা না আসা,—এই দুইটী নিশ্চয়ই থাকা চাই। ঔষধ দিবার অল্পদিন পরে রোগলক্ষণাবলির সামান্য বৃদ্ধি হইবার পর উপশম, অথবা প্রথম হইতেই (বৃদ্ধি আদৌ না হইয়া) উপশম এবং এই উপশম **আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে,** আসা চাই। ঐ সামান্য বৃদ্ধির পর উপশমের সঙ্গে সঙ্গে (বা বৃদ্ধি না হইয়া যদি উপশমই আরম্ভ হয়, তবে ঐ উপশমের সঙ্গে) রোগী দেহে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল রোগলক্ষণ দেখা দিয়াছিল, সেগুলির কেবলই পুনরাবির্ভাব, অর্থাৎ এলোমেলোভাবে পুনরাবির্ভাব, হইলে চলিবে না, ঠিক **পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাবে** আসা চাই, অর্থাৎ **সর্ব্বশেষের লক্ষণ আগে আসিবে,** তাহার পর **পশ্চাৎ গতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণ গুলি একে একে আসিবে।** অবশ্যই রোগীর মানসিক অবস্থায় **উপশম আগেই** ঘটিবে এবং অত্যন্ত আভ্যন্তর যন্ত্র অর্থাৎ মন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তদপেক্ষা স্থূলতর যন্ত্রে, এবং সর্ব্বশেষে দেহে, ঔষধের ক্রিয়ার ফলে, উপশম লক্ষিত হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ভিতরে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ক্রমে তদপেক্ষা বাহ্য, ক্রমে আরও বাহ্যতর, ক্রমে আরও বাহ্যতর এবং সর্ব্বশেষে একেবারে বাহ্যতম প্রদেশে উপশম অনুভূত হইবে। বাহ্য দেহেও আবার অগ্রেই উপরে, ক্রমে নীচের দিকে, উপশমের গতি হইয়া সর্ব্বশেষে পূর্ণ উপশম লক্ষিত হইবে। এই সকল নিদর্শন বা চিহ্নের দ্বারা সূচনা পাওয়া যায় যে, যাহাকে হোমিওপ্যাথিক আদর্শ আরোগ্য কহে, তাহা আরম্ভ হইয়াছে এবং অবিলম্বে আরোগ্য সংঘটিত হইবে।

এরূপ রোগীও দেখা যায়, যাহারা এতই অসহিষ্ণু যে, তাহাদিগকে

৫০০ কি ১০০০ শক্তির ঔষধ দেওয়ার পরে ঔষধের লক্ষণ সকল ঠিক প্রুভিং করার মত তাহাদের দেহে প্রকাশ পায়, আরোগ্যের দিকে একেবারে যায় না। প্রত্যেক চিকিৎসকই এরূপ রোগী কতকগুলি পাইয়া থাকেন। ইহাদের আরোগ্য সুদূরপরাহত। ইহাদের ব্যাধি লক্ষণগুলি, অতি নিম্নশক্তি,—যথা, ৩০, কিম্বা বড় জোড় ২০০ শক্তি দিয়া, অনেক সন্তর্পণে উপশমিত করিয়া রাখিতে হয়। প্রকৃত আরোগ্য ইহাদিগের বড়ই যত্নসাধ্য। অধিকাংশ স্থলে আরোগ্যের চেষ্টাই না করা ভাল, কেননা যদি ১০এম, ৫০এম, অথবা সি-এম শক্তির ঔষধ এক মাত্রা ইহা-দিগকে প্রয়োগ করা হয়, তবে অতি সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া তাহাদের দেহে ঔষধের লক্ষণ সকল দেখা দিতে থাকিবে, তাহার আর বিরাম মিলিবে না। তবে সুখের বিষয়, এরূপ রোগীর সংখ্যা অতি কম।

আর এক শ্রেণীর রোগী আছে, তাহারা অতি দুর্ভাগ্য। তাহাদের শরীর ও মনটী বিশৃঙ্খলার একটী পূর্ণ মূর্ত্তি। তাহারা জীবনে কোনও রোগলক্ষণ হইতে কখনও প্রকৃত আরোগ্য হয় নাই। তাহাদের সাময়িক ব্যাধি সকল আমাদের বন্ধুদিগের হস্তে পড়িয়া কেবল জবরদস্তির দ্বারা চাপা পড়িয়া আসিতেছে। এখন হয়ত ৪০।৫০ বৎসর বয়স। এখন তাহাদের দেহস্থ প্রত্যেক যন্ত্রই সুস্থভাবে কাজ করা ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রোগলক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাহারা বিশিষ্ট লক্ষণ কিছুই দিতে পারেনা, কেবল বলিবে—"মধ্যে মধ্যে ইহা হয়, উহা হয়।" একটী দশ পাতা লিপি লিখিয়া লইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার মত কোনও লক্ষণই পাওয়া যায় না। উচ্চ শক্তির সালফার, রেডিয়াম্, এক্স্-রে, প্রভৃতি ঔষধ দিয়াও তাহাদের দেহে লক্ষণ পরিস্ফুট হয় না,—তাহারা এক প্রকার চিররোগী, জীবনে কোনও আনন্দ তাহারা কখনও পায় না। তাহার উপর, তাহারা এত অস্থিরপ্রকৃতি যে, তাহাদের প্রতি করুণা করিয়া চিকিৎসক বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিলেও তাহারা সময় দিতে ও

অপেক্ষা করিতে বড়ই নারাজ। এখানে ১০।২০ দিন, ওখানে ১০।২০ দিন, এরূপে নানা চিকিৎসকের নিকট ঘুরিয়া, শেষে সাব্যস্থ করে যে, তাহারা সকল প্রকার চিকিৎসকের বিদ্যা বুঝিয়াছে; চিকিৎসায় কোনও ফল হয় না।

অতঃপর কোন্ স্থলে **দ্বিতীয় মাত্রা** ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য, তাহারই আলোচনা করিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় নির্ব্বাচনে ঔষধ পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্র।

যদি **পূর্ব্ব লক্ষণসমষ্টি** পুনরায় ফিরিয়া আসিল, তবে ত পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত ঔষধই বিভিন্ন শক্তি এবং উচ্চতর শক্তিতে পুনঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ কতকগুলি **অভিনব** লক্ষণ আসিয়া পূর্ব্বলক্ষণ সমষ্টির স্থান অধিকার করিয়া বসে, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, নির্ব্বাচনটী অভ্রান্ত হয় নাই,—ঠিক ঔষধ দেওয়া হয় নাই। অনেক সময় পূর্ব্ব প্রদত্ত ঔষধের লক্ষণগুলিই স্পষ্টাকারে দেখা দেয়;—অর্থাৎ রোগীর রোগান্তরে ক্রিয়া করিতে অপারক হইয়া, ঔষধটী যেন রোগীর শরীরে প্রুভিং হইতেছে। এ অবস্থায় নিশ্চয়ই জানিতে হইবে যে, নির্ব্বাচনের দোষ হইয়াছে এবং তাহার ফলে রোগীর রোগশক্তি অন্য দিকে চালিত হইয়াছে মাত্র, রোগীর উপকার ত হয়ই নাই, বরং বিপরীত পক্ষে, অনিষ্টই করা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে, রোগীর রোগলক্ষণের দুইটী সমষ্টিকে একটী সমষ্টি করিতে হইবে, অর্থাৎ ঔষধ দিবার পূর্ব্বে যে লক্ষণসমষ্টি ছিল, এবং নির্ব্বাচনের দোষে যে সকল নূতন লক্ষণের আবির্ভাব হইয়াছে, এই গুলিকে একত্র করিয়া, দ্বিতীয় নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এস্থলে ঔষধ সুনির্ব্বাচিত হইলে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব ঔষধ কখনও আর প্রয়োজন হয় না,—অন্য একটী ঔষধই নির্ব্বাচিত হয় ও হওয়াই উচিত। কাজেই এরূপ স্থলে বিভিন্ন ঔষধই দেওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব প্রদত্ত ঔষধ অনিষ্টই করিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ না করিলে উপায়ান্তর নাই।

কিন্তু উপরোক্ত স্থলে, একটি বিষয় বিশেষভাবে ও অতি মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাহা কি? **রোগীর ব্যক্তি-**

গত অবস্থাটীর পর্য্যবেক্ষণ। লক্ষণসমষ্টি পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যদি দেখা যায় যে, যদিও লক্ষণগুলি অভিনব, অর্থাৎ যাহা রোগী এ পর্য্যন্ত কখনও অনুভব করে নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রোগী নিজে অন্তরে অন্তরে অনেক উন্নতি বোধ করিতেছে, তবে যতদিন ঐরূপ অনুভূতি থাকিবে, ততদিন কখনও ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে নাই। এখানে, অপেক্ষা করা ব্যতীত উপায় নাই। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলেই, হয়ত, পূর্ব্ব সমষ্টি ফিরিয়া আসিবে, অথবা লক্ষণের অভিনব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগার স্বচ্ছন্দভাবের অন্তর্দ্ধান হইবে। যদি রোগীর স্বচ্ছন্দভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং পূর্ব্ব লক্ষণ সমষ্টি ফিরিয়া না আসে, তবে ঔষধ পরিবর্ত্তন ব্যতীত উপায় কি? এস্থলে যতদিন রোগী স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে থাকে, ততদিন অপেক্ষা করাই সঙ্গত, অন্ততঃ রোগীপক্ষে ক্ষতি-জনক কখনও নয়। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে, রোগী নিজে ক্রমেই ভাল বোধ করিতেছে, তবে অপেক্ষা করিতে বিরত হওয়া উচিত নয়,—এটী মনে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কেন না, অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, রোগী যাহাকে অভিনব লক্ষণ বলিয়া কহিতেছে, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনব নয়, সেগুলি পূর্ব্বে পূর্ব্বে রোগীশরীরে আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু রোগীর তাহা মনে নাই। হয়ত অতি বাল্যকালে ঐ সকল লক্ষণ ছিল, এবং কোনও প্রকার কুচিকিৎসা বা অচিকিৎসার প্রভাবে সেগুলি লুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—রোগী তাহা আদৌ স্মরণ করিতে পারে নাই। এজন্য যখনই দেখা যায় যে, রোগী নিজে নিজে তাঁহার অন্তরে অন্তরে বেশ স্বচ্ছন্দভাব অনুভব করিতেছে অথচ অভিনব লক্ষণ সকল আবির্ভাব হইতেছে, সেখানে প্রতীক্ষা করাই কর্ত্তব্য। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় প্রতীক্ষা করাটী অনেক সময়ই প্রয়োজন, কোনও স্থলে সামান্য সন্দেহ উপস্থিত হইলে, প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে,

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কি প্রতীক্ষা করিতে হইবে? যে সমষ্টি অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ হইয়াছে,—তাহার **পুনরাবর্ত্তন**। যদি নিতান্তই না আসে, এবং রোগীও স্বচ্ছন্দানুভব করিতেছে না, তখন **ঔষধ পরিবর্ত্তন** ব্যতীত উপায় কি?

প্রাচীন পীড়ার রোগীর জন্য, ১ম নির্ব্বাচনের পর ২য় নির্ব্বাচনের সময়, **ঔষধটীর পরিবর্ত্তন** করিবার আরও ক্ষেত্র আছে। মনে করুন, আপনার একটী শূলরোগী আছে, যাহার মধ্যে মধ্যে ১০।১২ দিন অন্তর অন্তর শূল বেদনা দেখা দিয়া থাকে, এবং তাহাকে প্রাচীন পীড়ার নিয়মে চিকিৎসা করিতে গিয়া, তাহার লক্ষণসমষ্টি একত্র করিয়া দেখিলেন যে, বেলেডোনা, কিম্বা কলোসিন্থ, অথবা ম্যাগ্‌নেসিয়া ফস, ইত্যাদি স্বল্প কার্য্যকরী ঔষধেরই মধ্যে একটী, ঐ রোগীর সাদৃশ্যানুসারে, নির্ব্বাচন হয়। আপনি প্রয়োগ করিলেন, প্রত্যেকবার শূল ব্যথার পরে ৩।৪টী মাত্রা দিলেন, আবার হয়ত শক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া ২।৩ মাত্রা দিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, শূল ব্যথাটী যায়,—আবার আসে, যায়,—আবার আসে, তখন কে যেন ভিতর হইতে আপনাকে কহিয়া দিবে যে, "তোমার রোগীকে এই স্বল্প কার্যকরী ঔষধের কার্য্যপূরক কোনও এন্টিসোরিক, এন্টিসাইকোটিক বা এন্টিসিফিলিটিক ঔষধ দেওয়ার প্রয়োজন, এবং লক্ষণ সকলের বিচার করিয়া তাহাদের সাদৃশ্যানুসারে একটী ঐ প্রকার বা ঐ জাতীয় ঔষধ দাও না কেন।" আপনি যদি বেলেডোনা দিয়াছিলেন, তবে হয়ত, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব দিতে হইবে, যদি কোলোসিন্থ দিয়াছিলেন, তবে হয়ত, কেলি কার্ব্ব দিতে হইবে, অথবা যদি ম্যাগ্‌নেসিয়া ফস্ দিয়াছিলেন, তবে হয়ত আর্সেনিকাম এলবাম্ দিতে হইবে। আমি কেবলমাত্র এখানে উদাহরণ স্বরূপ ২।৩টী ঔষধের কথা লিখিলাম। আসল তত্ত্ব হইতেছে, স্বল্পকার্য্যকরী ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইলে, তাহাদের কার্য্য পরিপূরক

ঔষধের প্রয়োগ করিতে হইবে। আপনি যদি বলেন যে, এ ক্ষেত্রে একেবারেই ত গভীর কার্য্যকারী ঔষধের প্রয়োগ করিলেই হইত? না, তাহা হয় না, তাহা করিতেও নাই, কেননা একেবারে গভীর কার্য্যকরী ঔষধের প্রয়োগে অনেক সময় অতিশয় বৃদ্ধিলক্ষণ আনিয়া রোগীর জীবন বিপন্ন করিয়া ফেলে। সর্ব্বপ্রথম, লঘু কার্য্যকরী ঔষধের দ্বারা, যেন রোগ-শক্তির তীক্ষ্ণতাটীকে একটু ক্ষীণবল করিয়া লইতে হয়, তাহার ২।৩টী শক্তিও অনেক সময় দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। কিসের পরীক্ষা? পরীক্ষা এই যে, ঐ ঔষধেরই শক্তি পরিবর্ত্তনে হয়ত রোগী সারিয়াও যাইতে পারে। এবশ্য একথা সত্য ও সঙ্গত যে, উহাদের কাহারও দ্বারা সারিলেও গভীর কার্য্যকরী ঔষধের প্রয়োগ করিতেই হইবে, তবুও, উহাদের যতদূর কার্য্য করিবার শক্তি আছে, সেই শক্তির দ্বারা কার্য্যটী যথাসম্ভব শেষ করিয়া লওযাই একান্ত কর্ত্তব্য। যাহা হউক, ২য় নির্ব্বাচনে, যেখানে ঔষধটাই **পরিবর্ত্তন** করিতে হয়, এই বর্ত্তমান ক্ষেত্রটী তাহারই মধ্যে একটী প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া মনে রাখিতে হয়।

আরও এক প্রকারের রোগী পাওয়া যায়, যাহাদের লক্ষণসমষ্টির এমনই প্রকৃতি যে, একটী ঔষধের ক্রিয়া শেষ হইলে আরও ১টী বা ২টী বা, ক্ষেত্র বিশেষে, ৩টী ঔষধের ক্রমান্বয়ে চক্রগতির ন্যায় প্রয়োগ প্রয়োজন হয়। যেমন সিপিয়ার পর সালফার, আবার সিপিয়া, অবার তাহার পর সালফার, এইরূপে হয়ত, ২।৩।৪ বার চক্রগতিতে প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন নাক্স, সালফার ও ক্যাল্‌কেরিয়া; যেমন, নাক্স, সালফার, ক্যাল্‌কেরিয়া ও লাইকো,—ইত্যাদি ক্ষেত্রে, প্রতিবারই বিভিন্ন পরিপূরক এবং চক্রগতি বিশিষ্ট ঔষধগুলি দিবার মত লক্ষণসমষ্টি উপস্থিত হয়। আমার নিজের চিকিৎসার মধ্যে, হালিসহরের কোনও একটী রোগীনীর প্রায় দুই বৎসর, এইরূপ ৩টী ঔষধের চক্রগতি প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিবার ক্ষেত্র ঘটে। এমনই একটী অদ্ভুত যোগসূত্র, এমনই একটী

অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব যে, জীবনীশক্তির উপর ঔষধের ক্রিয়ার ফলে, একটীর পর একটী, তাহার পর আর একটী, ঔষধের লক্ষণ সকল যেন ঠিক চক্রের ন্যায় উপস্থিত হইয়া প্রমাণ করে যে, হোমিওপ্যাথিই প্রকৃত আরোগ্যকারী চিকিৎসা শাস্ত্র, এবং সমলক্ষণসূত্রেই প্রকৃত ও স্বাভাবিক আরোগ্যসূত্র।

অন্য আরও একটী ক্ষেত্র আছে, যেখানে, পূর্ব্ব প্রদত্ত ঔষধ নিশ্চয়ই **পরিবর্ত্তন** করিতে হয়। মনে করুন, আপনার একটী প্রাচীন পীড়ার রোগীতে সোরা, সাইকোসিস্, ও সিফিলিস্ এই তিনটীই বর্ত্তমান। আপনি লক্ষণসমষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া দেখিলেন যে, উপস্থিত সাইকোসিসেরই লক্ষণপ্রাধান্য রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আপনি লক্ষণ সাদৃশ্যানুসারে কোনও একটী এণ্টিসাইকোটিকের প্রয়োগ করিলেন, তাহার ফলে, হয়ত, ৩।৪টী উচ্চ ও উচ্চতর শক্তি দেওয়ার পরে, আপনার রোগীর সোরা দোষটী অতি প্রবলবেগে "মাথা নাড়া দিয়া" উঠিল ও নানা প্রকারের লক্ষণ উদ্ভূত হইয়া আপনাকে জানাইয়া দিল, "যদিও সাইকোসিস ধ্বংস করিবার জন্য প্রতীকার করিতেছেন, কিন্তু আমিও আছি।" এক্ষণে, আপনাকে কি করিতে হইবে? আপনাকে চিকিৎসার তত্ত্বানুসারে, এক্ষণে আবার **বর্ত্তমান লক্ষণসাদৃশ্যে** একটী এণ্টিসোরিক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে পুনরায়, হয়ত, সিফিলিস, তাহার পর আবার হয়ত, সোরা, আবার সাইকোসিস্, কি অপর কেহ তাহার **প্রাধান্য** বিস্তার করিয়া লক্ষণ প্রকাশিত করিয়া থাকে, এবং তদনুসারে সেই সেই ঔষধ দিতে হয়। অতএব, ১ম নির্ব্বাচিত ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য ঔষধ দিবার নানা প্রকারের ক্ষেত্র হইতে পারে, আমি এখানে, যতদূর সম্ভব, কতকগুলি ক্ষেত্র বর্ণনা করিলাম।

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার মধ্যে, ধৈর্য্য, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ এবং সন্দেহ হইলেই প্রতীক্ষা,—এই কয়টী গুণ থাকা অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন পীড়ার চিসিৎসার বিশেষত্ব কি?

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার **বিশেষত্ব**, অনেকগুলি। একে একে সেগুলির আলোচনা করিলেই ভাল হয়। সেগুলি কি? **সময়, ধৈর্য্য,** শক্তি অর্থাৎ ঔষধের **শক্তি এবং ঔষধ নির্ব্বাচন,** এবং ঔষধের **ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ**। এগুলির মধ্যে ধৈর্য্যই সর্ব্বপ্রধান,—রোগীপক্ষে এবং চিকিৎসকপক্ষে।

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় অনেক বাধা। ক্রমিক লোকশিক্ষার দ্বারা সে সকল বাধাকে নিবারণ না করিতে পারিলে, হোমিওপ্যাথির প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসারূপ অমৃত, ভাণ্ডারেই রহিয়া যাইবে, দুষ্টলোক আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইবে না। লোকে জানে যে, কোনও একটী পীড়া হইলে, তাহাকে আরাম করিতে, না হয়, ১০।১৫।২০ দিন লাগিতে পারে। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায়, যে কত অধিক সময় লাগে, কেন লাগে, সে কথা লোককে বুঝাইয়া না দিলে, তাহারা কিরূপে অপেক্ষা করিবে? এলোপ্যাথি ও অন্যান্য প্যাথিতে এত গভীরভাবে চিকিৎসার কোনও বিধান নাই, কাজেই লোকে অভ্যস্ত নয়। আমি প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার পূর্ব্বেই প্রত্যেক রোগীকে সর্ব্বাগ্রে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই, এবং যদি দেখি,—তাহার ধৈর্য্যের মন নয়, তবে আমি আদৌ আরম্ভই করি না। ইহাতে দৃশ্যতঃ ক্ষতি হইলেও অন্যদিকে অনেক সুবিধা হয়। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসকের অর্থের দিকে আদৌ সুবিধা হয় না, এবং প্রকৃত জনকল্যাণ যাহার উদ্দেশ্য নয়, তাহার দ্বারা এ চিকিৎসা হয় না। এ চিকিৎসায় কেবল **পরিশ্রম ও শেষে**

আত্মানন্দই লাভ। তবে এরূপ বিবেচক রোগী অনেক পাওয়া যায়, যাঁহারা আমাদের পরিশ্রম দেখিয়া তদনুসারে সাহায্য করেন। যাহা হউক, উভয় পক্ষেই বিশেষ ধৈর্য্য প্রয়োজন।

এ চিকিৎসায় এত সময় ও এত ধৈর্য্যের কেন প্রয়োজন হয়? সর্ব্বপ্রথম রোগীর **লিপিপ্রস্তুত** কার্য্য। এটী অতি কঠিন। রোগীর লিপি কি ভাবে করিবে, তাহা হ্যানিম্যান বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। আসল কথা, তাহার যাবতীয় লক্ষণ সংগ্রহের দ্বারা **একটী উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কন চাই**। শিল্পী কতকগুলি রেখামাত্রের দ্বারা লোকের চিত্রের কাঠামটী প্রস্তুত করে। শিল্পীর ভাষা,—রেখাগুলি; কেননা রেখাগুলির সাহায্যে ঐ চিত্রটী, লোকটীকে নির্দ্দেশ করে। চিত্রকর, কতকগুলি বর্ণ ও ছায়ার দ্বারা, লোকের চিত্রটী পরিপুষ্ট ও সুন্দর করে, তাহার ভাষা,—ঐ বর্ণ ও ছায়া। আমাদের রোগীচিত্র অঙ্কণের ভাষা, কেবল—লক্ষণসমষ্টি। এই তিন জনেরই আর একটী গুণ থাকা চাই, সেটী কি? সেটীকে ইংরাজীতে আর্ট বলে, আমি সে গুণটীকে কৃতিত্ব বলি। ফলতঃ সেটী কি, তাহা এক কথায় বোঝান বড় শক্ত। অর্থাৎ শিল্পীর যদি সে গুণটী না থাকে, তবে তাহার চিত্র-কাঠামটী, একটী মানুষের চিত্র হইতে পারে, কিন্তু যে **মানুষটীর** চিত্র-কাঠামটী করা তাহার উদ্দেশ্য, সে মানুষটীকে নির্দ্দেশ করিবে না। চিত্র-করের যদি সেটী না থাকে, তবে তাহার চিত্রটী, একটী **সাধারণ মানুষের** সুন্দর চিত্র হইতে পারে, কিন্তু **যাহার চিত্রাঙ্কটি তাহার উদ্দেশ্য**, সেই মানুষটীকে বুঝাইবে না। আমাদেরও যদি সে গুণটী না থাকে, তবে একটী রোগীচিত্র হইতে পারে, **কিন্তু যে রোগীটীর চিত্রাঙ্কণ আমাদের উদ্দেশ্য, সে রোগীটীর** চিত্র করা হইবে না। কোনও হাঁপানি রোগীর সাধারণ লক্ষণগুলি কেবল লিখিয়া লইলে একটী **সাধারণ** হাঁপানি রোগীর চিত্র হইবে, কিন্তু যে **রোগীটী** আমার

নিকট চিকিৎসার্থ আসিয়াছে, তাহার **বিশেষত্বটী** না ধরিতে পারিলে, **ঐ রোগীর** চিত্রাঙ্কণ হইবে না। **এ বিশেষত্বটী ধরাই কৃতিত্ব—এইটীই ওস্তাদী।** যাহার চিত্র হইবে, চিত্রকর যদি তাহার নাকের উপর তিলটী বসাইতে ভুলিয়া যায়, তবে তাহার চিত্র কেমন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিবে? কেননা ঐ তিলটীই **ঐ ব্যক্তির বিশেষত্ব।** তেমনই, আমাদের উল্লিখিত হাঁপানি রোগীর বিশেষত্ব না থাকিলে যখন চিকিৎসা চলিবে না, যেহেতু ঔষধ নির্ব্বাচনই হইবে না, তখন বিশেষত্বটী বাহির করাই কৃতিত্ব। নতুবা হয়ত ১০ পাতা ধরিয়া লক্ষণ লেখা হইল, **অথচ কোনও বিশেষত্ব নাই,** অর্থাৎ এই রোগীকে চিকিৎসা করিবার মত উপকরণ পাওয়া গেল না। এখানে বিশেষত্ব বাহির করিবার জন্য অনেক সময়, অনেক ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম প্রয়োজন হয়।

ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য **বিশেষত্ব** নিশ্চয়ই চাই। সেজন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন, তাহা চিকিৎসককে লইতে হইবে. এবং রোগীকেও দিতে হইবে। তাহার পর, **শক্তি নির্ব্বাচন** সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, যদিও ঔষধটীর ঠিকভাবে নির্ব্বাচন করা অগ্রেই চাই। কিন্তু তাই বলিয়া শক্তি নির্ব্বাচন যে অল্প মনোযোগের কার্য্য, তাহা কখনও ধারণা করা সঙ্গত নয়। আমি অনেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখিয়াছি, তাঁহারা ১টী, কি বড় জোর, ২টী শক্তি রাখেন। আমি জানি না, তাঁহারা কিরূপে ২।১টী শক্তির দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক যথার্থ হোমিওপ্যাথের ৩০, ২০০, ১০০০, ১০,০০০, ৫০,০০০, সি-এম্ পর্য্যন্ত অন্ততঃ প্রয়োজন, ক্ষেত্রেবিশেষে আরও উচ্চতর শক্তির আবশ্যক হয়। এমন কি, যিনি আদৌ 'প্রাচীন পীড়া' চিকিৎসা করিবেন না, বলিয়া একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন (অবশ্য সেরূপ প্রতিজ্ঞা চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব), তাঁহাকেও, ৩০, ২০০, ১০০০, পর্য্যন্ত

অন্ততঃ রাখিতেই হয়, এবং আবশ্যকমত উচ্চতর শক্তি আনাইতে হয়।

যাহা হউক, ঔষধ নির্ব্বাচনের পর শক্তি নির্ব্বাচনের কোনও প্রথা বা নিয়ম আছে কিনা। সকলেই বলিয়া থাকেন যে সেরূপ প্রথা বা নিয়ম নাই। কিন্তু তাহা বলিলে চলে না; সাধারণ চিকিৎসকগণ যাঁহারা অতি অল্পদিন মাত্র এই কায্য করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে পথ দেখাইবার মত কতকটা আভাস দেওয়া অবশ্যই চলে। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে শক্তি নির্ব্বাচনের তত্ত্বটী আপনিই অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। অবশ্য বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিতে পারে না। মনে করুন, কতকগুলি লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া যদি ৩০ জন প্রকৃত হোমিওপ্যাথকে নির্ব্বাচনের জন্য দেওয়া হয়, তবে ঔষধ নির্ব্বাচন, সকলেই হয়ত একটীই করিতে পারিবেন, কেননা ঔষধ নির্ব্বাচনের বাঁধাবাধি নিয়ম আছে, কিন্তু তাঁহারাই শক্তিনির্ব্বাচনটী প্রায়ই পৃথক পৃথক করিয়া বসিবেন এবং তাহাই সম্ভব। যাহা হউক, আমি নবীনপন্থীদিগের সুবিধার জন্য এস্থলে কতকটা ঈঙ্গিত দিতেছি।

(১) যেখানে রোগীর শারীরিক বা মানসিক **অসহিষ্ণুতা** লক্ষিত হইবে, যেমন সামান্য কারণেই রোগীব মানসিক চাঞ্চল্য হয়, সামান্য কারণেই বোগীর অসুখ হয়, সামান্য ঠাণ্ডায় বা সামান্য বাতাসে, বা সামান্য রৌদ্রে রোগীর শিরঃপীড়া হয়, সর্দ্দি হয় ইত্যাদি—এরূপ রোগীর জন্য, কি তরুণ বা কি পুরাতন রোগের প্রথমেই, নিম্নশক্তি দেওয়া নিশ্চয়ই সঙ্গত; এবং তরুণ রোগে—৬, ১২, ৩০ই নিম্ন এবং পুবাতন রোগে ৩০, ২০০, ১০০০ শক্তিই নিম্ন।

(২) যেখানে তাহা নয়, অর্থাৎ রোগীর অসহিষ্ণুতার লক্ষণ নাই, সেখানে তরুণে, ৩০ শক্তির নিম্নে ব্যবহার না করাই সঙ্গত, এবং ২০০ শক্তির উর্দ্ধে না উঠাই ভাল। প্রথমে ৩০ হইতে ২০০ শক্তির ঔষধ দিয়া

ক্রমে আবশ্যক মত উঠিতে পারা যায়,—কিন্তু প্রাচীনে ২০০ শক্তির নীচে নামিতে নাই এবং ১০০০ এর উর্দ্ধে উঠিতে নাই। প্রথমে ঐ প্রকার দিয়া আবশ্যক বোধে উর্দ্ধে উঠিলে ক্ষতি নাই।

(৩) প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ক্রিয়া প্রায়ই ২০০ শক্তির নিম্নে হয় না, যদিও আমি ক্বচিৎ ৩০ শক্তিতেও দেখিয়াছি, ফলতঃ ২০০ শক্তির নিম্নে তাহা আশা করিতে নাই। এজন্য সুবিধা পাইলে এবং কোনও বাধা না থাকিলে, প্রথমেই ২০০ শক্তি দেওয়া ভাল।

(৪) অতি দুর্ব্বল রোগীর ক্ষেত্রে, যাহার জীবনীশক্তি বড় দুর্ব্বল অথবা অন্তিম অবস্থার মত, সেখানে বিশেষ সাবধানে ৬।১২ শক্তির মধ্যেই প্রথম প্রয়োগ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধে, অতি সাবধানে উর্দ্ধে, উঠিতে হয়।

(৫) যেখানে দেখা যায় যে, কোনও একটী স্রাব বা কোনও একটী চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়াছে, লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহাকে পুনরায় বাহির না করিতে পারিলে রোগীর আরোগ্য আসিবে না, সেখানে ৬।১২ শক্তি কোনও কাজেরই নয়, ৩০ শক্তির কমে, হইতেই পারে না,—২০০ শক্তিতে আশা করিতে পারা যায়। কিন্তু প্রাচীন হইলে, যথা গনোরিয়া স্রাব প্রভৃতি যদি পুনরায় আনিতে হয়, তবে ২০০ শক্তি অতি নিম্ন, ১০০০ শক্তি হইতে আশা করিতে পারা যায়। এক্ষেত্রে প্রায়ই যতদিন পূর্ব্বে উহা লুপ্ত হইয়াছে, সেই অনুপাতে শক্তিটী নির্ব্বাচন করিতে হয়।

(৬) যেখানে রোগী অসাধ্য, সুতরাং কেবল উপশমই উদ্দেশ্য, সেখানে উচ্চ শক্তি, এমন কি, অনেক সময় ৩০ শক্তিতেও যাইতে নাই,—৬।১২ই সেখানে প্রযুজ্য।

(৭) পিতামাতার দোষ সন্তানে যাহাতে না বর্ত্তে, এই উদ্দেশ্য জননীদিগের গর্ভকালে যে ঔষধ দিতে হয়, তাহা গর্ভিনীর শারীরিক অবস্থায় যদি বাধা না থাকে, তবে সি-এম ক্রমের নিম্নে না দেওয়াই সঙ্গত।

নবম পরিচ্ছেদ।

২য় নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র বিচার ও নিরূপণ।

প্রাচীন পীড়ায় রোগীকে সুনির্ব্বাচিত ঔষধের ১ম মাত্রা দেওয়া হইয়াছে, তাহার পর ২য় মাত্রা ঔষধ, কখন, কি প্রকার ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে দিতে হইবে, তাহা জানা চাই। অনর্থক রোগীর বা তাহার আত্মীয় স্বজনের তাড়াতাড়িতে, ২য় মাত্রা ঔষধ দেওয়াতে এরূপ ক্ষতি হইতে দেখিয়াছি যে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। আবার অনেক সময় চিকিৎসকেরও ধৈর্য্যের অভাব ঘটে। বিশেষ কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, **ক্ষেত্র না পাইলে** যেন ২য় মাত্রার ঔষধ প্রয়োগ না করা হয়। ২য় মাত্রা ঔষধ প্রয়োগের প্রকৃত কারণ উপস্থিত না হইলে কখনও প্রয়োগ কর্ত্তব্য নয়. তাহাতে উপকার ত হয়ই না, বরং অপকারই হইয়া থাকে। তবে এখানে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই ২য় মাত্রা ঔষধ দিবার ক্ষেত্র, কেবল যাঁহারা প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, যাঁহারা সুনিয়মে ১ম নির্ব্বাচন করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের ঐ সুনির্ব্বাচিত ঔষধের ফলে রোগীদেহে ঝঙ্কার উৎপাদিত হইয়াছে, ফল চলিতেছে, তাঁহারাই পাইবার আশা করিতে পারেন, অন্যে পারেন না। যাঁহারা নিজেদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাগত রোগীদের প্রাচীন পীড়ার এক একটি সুবৃহৎ বর্দ্ধমান বৃক্ষের কেবল দুই একটী পল্লব মাত্র ছিঁড়িয়া, রোগীদিগের বিস্ময় জন্মাইবার ও তাহার দ্বারাই নিজের অর্থাগমের সুলভ পন্থা স্থির করিয়াছেন, এবং এই ভাবেই চিকিৎসা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট "২য় মাত্রা" বা তৎসংক্রান্ত এই সকল সাবধানবাক্য ও উপদেশ, কেবল অর্থহীন বাচালতা মাত্র,

তাঁহাদের নিকট এই সকল কথার কোনও মূল্যই নাই। প্রাচীন পীড়ার রোগী হইলেই (আজকাল ত প্রাচীন পীড়াশূন্য মানব দেখিতে পাওয়া যায় না) যে তাহার চিকিৎসাও "প্রাচীন পীডার চিকিৎসা" হইবে, তাহার কোনও কারণ নাই। মনে করুন, একটী হাঁপানী রোগী আসিয়া কহিল—"মহাশয়, রাত্রি ২।৩টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমার অতিশয় শ্বাসকষ্ট ও সামান্য সামান্য কাশি হয়, ইহার প্রতিকার করিতে হইবে, তবে, মহাশয়, আমি এখানে ৭।৮ দিনের বেশী আপনার চিকিৎসাধীনে থাকিতে পারিবনা, ইহার মধ্যে আপনাকে দয়া করিয়া ইহার প্রতিকার করিতে হইবে।" এ ক্ষেত্রে আপনি তাহার অন্যান্য ২।৪টী লক্ষণাদি লইয়া, কেলি বাই, বা আর্সেনিক, কি অন্য কোনও ঔষধ ঠিক করিয়া ৩০শ শক্তিতে দিলেন, রোগীও ৩।৪ দিনের মধ্যেই উপশম বোধ করিল, এবং ৮।১০ দিনের মধ্যেই তাহার সে ভাবটি হয়ত সারিয়া গেল। এই চিকিৎসাকে আপনি "প্রাচীন পীডার চিকিৎসা" বলিতে পারেন না; অথবা ঐ রোগী আপনার নিকট প্রকৃত প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার্থ আসিলে, আপনি যদি নিম্নতর শক্তি দিয়া কেবল উপশমকারী চিকিৎসা করেন, তবে এ রোগী প্রাচীন পীড়ার বিস্তৃত চিকিৎসার যোগ্য হইলেও আপনার এ প্রকার চিকিৎসাকে কখনই প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা বলা যাইতে পারে না, এবং ইহার পক্ষে ২য় মাত্রা, ৩য় মাত্রা ইত্যাদি বাক্য কেবল অর্থহীন আড়ম্বর, ইহাই জানিতে হইবে। এই রোগীকে চিকিৎসা করিতে হইলে, তাহার রোগীলিপি করিবার পর, তাহাকে তাহার শরীরে প্রকৃত অবস্থা, কি প্রকার চিকিৎসা হইলে কিরূপ ফল হইবে, চিকিৎসা বিশেষের সময় ও খরচ কি প্রকার লাগিবে, তাহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর সে ব্যক্তি যদি কহে যে, তাহার উপস্থিত কষ্টকর লক্ষণটী বা লক্ষণগুলি কেবল অপসারিত করিয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য, তবে তাহাই করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে

প্রকৃত চিকিৎসাই করা কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য, কেননা অনেকের ধারণা যে হোমিওপ্যাথি একটী মাত্রা খাইলেই চতুর্ব্বর্গের ফল মিলে। তাহা ছাড়া, এলোপ্যাথি চিকিৎসাপ্রথা হইতে লোকে শিখিয়াছে, ১০।১৫ দিন ঔষধ খাওয়াকেই চিকিৎসা কহে, এবং আরও জানিয়াছে যে, হাঁপানি, পুরাতন কাশি, অর্শঃ, ভগন্দর, শোথ পুরাতন উদরাময় ইত্যাদি আদৌ সারে না, কেবল পথ্যাপথ্যের নিয়মে যাপ্য থাকে মাত্র। আসল কথা, আপনি প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার নিয়মে, উচ্চ শক্তির দ্বারা, স্থায়ীভাবে, রোগী হিসাবে, রোগীকে আরোগ্য করিবার প্রথায় চিকিৎসা করিলে, তবেই তাহার নাম **প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা,** নতুবা রোগী প্রাচীন পীডার হইলেই যে তাহার চিকিৎসাও প্রাচীন পীড়াব চিকিৎসা, ইহা বলা যায় না। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা অনেক সময়ব্যাপী, এক বৎসর হইতে, অনেক সময়, ছয় সাত বৎসরও প্রয়োজন হইতে পারে। সুযোগ্য চিকিৎসক ডাঃ কেণ্ট একটী কোরিয়া রোগীকে ১১ বৎসরকাল চিকিৎসা করিয়া তবে নিরাময় করিতে পারিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, ক্রমোন্নতি পাইলে রোগী অধৈর্য্য প্রকাশ করে না, তবে কতকগুলি রোগী স্বাভাবিকই একটু অধীর, তাহাদিগকেও বশে আনা কঠিন হয় না।

আরও একটী কথা, যেখানে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা প্রয়োজনীয়, অথচ রোগী তাহা চায় না, সেখানে কখনও উচ্চশক্তি দেওয়া উচিত নয়,—৬, ১২, অথবা ৩০ শক্তির উপরে না যাওয়াই ভাল। কেননা, অনর্থক জীবনী শক্তিকে দুর্ব্বল করা অসঙ্গত। তাহা ছাড়া, অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনও কোনও রোগীকে সামান্য উচ্চ শক্তি, এমন কি, ৩০ বা ২০০ দিলেও তাহার লুপ্ত লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং যে সকল রোগী তাহা চায় না, তাহাদের নিকট চিকিৎসককে বড়ই অপ্রিয় হইতে হয়।

প্রাচীন পীড়ার প্রকৃত আরোগ্যকামী রোগীদিগকে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। যে ব্যক্তি রোগীহিসাবে নির্ম্মলভাবে তাঁহার

শরীরস্থ সমস্ত দোষের নিরাকরণ করিয়া আরোগ্য হইতে চাহেন, তিনি সর্ব্ব প্রথমেই একটী কোনও বিশেষ পারদর্শী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া বরাবর যেন তাঁহার চিকিৎসাধীনেই থাকেন। সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগের পর, বা আরও কিছুদিনের পর, তিনি যদি আর একটী চিকিৎসকের নিকট যান, তবে তাঁহার পক্ষেও বিপদ এবং দ্বিতীয় চিকিৎসকেরও বিশেষ অসুবিধা। ইহার কারণ, পূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে ও ইহার পরে যাহা যাহা লিখিত হইবে, তাহার দ্বারাই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে, এখানে কেবল এই সাবধানবাক্যটি উল্লেখ করা হইল মাত্র।

প্রথম সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করিবার ফলে একটি **পরিবর্ত্তন** আশা করিতে হইবে। যদি প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধটী সুনিয়মে ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক সূত্রে প্রযুক্ত হইয়া রোগীদেহে ঝঙ্কার উৎপাদন করিয়াছে, তবে কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে। এই পরিবর্ত্তন স্থায়ীভাব ধারণ করিবার পূর্ব্বে একটী যেন **গোলযোগ** উৎপন্ন হয়। যে সকল প্রকৃষ্ট লক্ষণের উপর ঔষধ নির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আসা, আবার যাওয়া, পুনরায় আসা, আবার যাওয়া, কোনও দিন কোনও কোনও লক্ষণের বৃদ্ধি, আবার হয়ত দুই এক দিন ঐ সকল লক্ষণের হ্রাস, ইত্যাদি এলোমেলো, ওলটপালট ভাবে লক্ষণগুলির আসা যাওয়ার দৃশ্য উপস্থিত হয়, এবং এইরূপ কিছুদিন থাকিয়া তাহার পর ঐ পরিবর্ত্তনটী স্থায়ী ও শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে। যতদিন ঐ গোল-মাল চলিতে থাকে, ততদিন চিকিৎসক কোনও ঔষধ দিবেন না, তিনি কেবল পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, এবং রোগী দূরস্থিত হইলে রোগীর স্বহস্তে লিখিত পত্রের দ্বারা তাহার অবস্থা ও লক্ষণের লিপি পাইবার ব্যবস্থা করিবেন। **ফলতঃ এই গোলোযোগের সময় কোনও ঔষধ দেওয়া বা, এমন কি, দিবার চিন্তা**

করাও নিষেধ। এই অবস্থা অতিশয় গোলমাল ও মিশ্রভাবযুক্ত। এ অবস্থায় কেবল পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও কর্ত্তব্য নাই। যখন ঐ সকল মিশ্রভাব, গোলমেলে অবস্থা গিয়া একটী শান্ত, স্থায়ী পরিবর্ত্তিত অবস্থা আসিবে, কেবল তখনই ২য় নির্ব্বাচনের সময় আসিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু বেশ মনে রাখিতে হইবে যে, এই স্থায়ভাব আসিবার পূর্ব্বেই রোগীর অনুরোধে বা তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বা চিকিৎসকের নিজের ধৈর্য্যাল্পতা বশতঃ যদি ঔষধ প্রয়োগ হয়, তবে চিকিৎসাটী নষ্ট হইবে। ঐ গোলযোগের সময় কেবল পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য, একথা ভুলিয়া যেন কদাচই ঔষধ প্রয়োগ না হয়। যদি আপনার ধৈর্য্য না থাকে, তবে আপনি প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার ন্যায় জনকল্যাণকারী ও অমৃতময়ী চিকিৎসার অধিকারী নহেন এবং অনধিকারী হইয়া হোমিওপ্যাথির ও লোকের সর্ব্বনাশ করিবার পথে চলিবেন না। রোগীর ও তাহার আত্মীয় স্বজনের যথেষ্ট নির্ভর না থাকিলে আমাদের এ চিকিৎসা অবলম্বন করা কখনও কর্ত্তব্য নয়। যাঁহারা বড় লোক অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি, তাঁহাদের বাড়ীতে কঠিন জাতীয় তরুণ পীড়া, যথা টাইফয়েড্ জ্বর, অথবা মেনিঞ্জাইটিস্ ইত্যাদি চিকিৎসা করিতে গিয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হয়, কেন না আপনার চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক আসা যাওয়া করিবেনই করিবেন এবং অনেক সময় গৃহস্থ অযথা চাঞ্চল্য দেখাইয়া আপনাকে বিব্রত করিয়া তুলিবে। ধনীর গৃহে প্রাচীন চিকিৎসা প্রায়ই অসম্ভব।

এক্ষণে, উপরোক্ত পরিবর্ত্তন যখন স্থায়ীভাব ধারণ করিল, অর্থাৎ লক্ষণ সকলের আসা, যাওয়া, কমা, বাড়া ইত্যাদি তরঙ্গায়িত অবস্থার শেষ হইল, তখন স্থিরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। কেন? আপনি কি উদ্দেশ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন? কি লক্ষ্য রাখিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার

ব্যবস্থা? আপনার লক্ষ্য থাকা উচিত, **কবে প্রথমকার লক্ষণগুলি ফিরিয়া আসিবে, কবে, কতদিনে আপনি যে যে প্রকৃষ্ট লক্ষণগুলির উপর ঔষধ নির্ব্বাচ করিয়া সর্ব্ব প্রথম মাত্রা দিয়াছেন, সেই লক্ষণগুলি ফিরিয়া পাইবেন।** যদি আপনি প্রথম মাত্রা যথানিয়মে হোমিওপ্যাথি সূত্রে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, যদি তাহার পর অন্য কোনও ঔষধের অযথা প্রয়োগ ফলে উহার ক্রিয়াকে বাধা না দিয়াছেন, এবং যদি যথেষ্ট সময় অপেক্ষা করিয়া ঐ ক্রিয়াকে ক্রমাগত রোগীদেহে, সাংসারিক কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহিণীর ন্যায়, সুশৃঙ্খলা সুবন্দোবস্ত অর্থাৎ "গোছাগুছি" করিবার অবসর দিয়া থাকেন, তবে প্রথমকার লক্ষণগুলি নিশ্চয়ই ফিরিবে—সে বিষয় আদৌ সন্দেহ নাই। অতএব কেবলই যে তরঙ্গায়িত ভাব, আসা যাওয়া, কমাবাড়ার ভাব গিয়া সুশান্ত ভাব আসিলেই হইল, তাহা নয়। **পরন্তু, যখন প্রাথমিক লক্ষণ সকল আবার দেখা দিবে, তবেই ও তখনই আপনার রোগীর জন্য ২য় নির্ব্বাচন প্রয়োজন, এবং আর অপেক্ষা করিবার কোন আবশ্যক নাই।** এই প্রাথমিক লক্ষণ সকলের পুনরাবির্ভাব হইলেই জানিতে হইবে, চিকিৎসা বেশ চলিতেছে, **সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচন অতি বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক** হইয়াছে, এবং **যথা সময় অপেক্ষাও করা হইয়াছে।** প্রাথমিক লক্ষণ সকল পুনরাবির্ভাবের সংবাদ যে কতদূর গভীর আনন্দ আনয়ন করে, সে আনন্দ যে কত নির্ম্মল, তাহা সুচিকিৎসক মাত্রেই অনুভব করেন, বুঝাইয়া লেখা যায় না। প্রাথমিক লক্ষণের পুনরাবর্ত্তন, ক্ষেত্রবিশেষে, দুই মাস পরেও হইতে পারে,' ক্ষেত্রবিশেষে আবার এক বৎসরেরও পরে হইতে পারে,—ইহার কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেওয়া চলে না। সময়ের তারতম্য কিসের উপর নির্ভর করে? রোগীর বল, বয়স,

রোগের প্রাচীনতা, ঔষধের শক্তি, রোগীদেহের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ফলতঃ এ সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার উপায় নাই। আমার চিকিৎসায় আমি এ বিষয়ে কিছু একটা স্থির করিবার মত পাই নাই। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে সময়ের বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধের মাত্রা দিয়া অপেক্ষা করিবার উপদেশ ত বুঝা গেল, কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করিবার পরেও যদি কোন পরিবর্ত্তন না পাওয়া যায়, তবে ত রোগীর সময় বৃথা অতিবাহিত হইতে লাগিল, এদিকে ঔষধের হয়ত কোনও ক্রিয়াই শরীরের উপর উৎপাদন হয় নাই, হইতেছেও না, অথচ নিত্যই আশা হইতেছে যে, ঔষধের ক্রিয়া এবার লক্ষিত হইবে। ইহার উত্তর কতকটা ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি, পুনশ্চ লিখিতেও আপত্তি নাই, কেননা এ সকল তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে তবে পূর্ণ মাত্রায় হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। যেখানে ঔষধ সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেখানে যদি শক্তি নির্ব্বাচনটী ঠিক না হয়, তবে জীবনী-তন্ত্রীতে কোনও ঝঙ্কারই হইবে না, কিন্তু পাছে একটী মাত্র মাত্রা দিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিলে শেষে বঞ্চিত হইতে হয় ও অনর্থক সময়টাও নষ্ট হয়, সেইজন্য হ্যানিম্যান তাঁহার ৬ষ্ঠ সংস্করণের অর্গেননে বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসার সুনির্ব্বাচিত ঔষধ একবার একদিন একটি মাত্রা না দিয়া, নিত্য অথবা একদিন অন্তর ঐ মাত্রাটি অল্প অল্প শক্তির পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়া দিতে হইবে, এবং যে দিন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে, সে দিন হইতে ঔষধ বন্ধ থাকিবে, কেননা বেশ বুঝা গেল যে, জীবনী-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার হইয়াছে, অতএব ১ম মাত্রা দেওয়া হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে দিলে কোনও গোলমালই থাকে না। কিন্তু আমরা ঐ সংস্করণের অর্গেনন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত বরাবরই একদিন একবার একটী মাত্রা মাত্র ঔষধই দিতাম, এখনও ক্ষেত্র বিশেষে তাহাই দিয়া থাকি, কিন্তু প্রায়ই বঞ্চিত হইতে হয় নাই। কচিৎ কোনও ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে ২০।২৫ দিন অপেক্ষা করিয়াও কোনও ফল বা পরিবর্ত্তন অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার কোনও চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না, তবে ঐ ঔষধের শক্তিটীর পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া থাকি। আরও একটী নিদর্শনের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। যদি ঐ ঔষধটী ঠিকমত নির্ব্বাচিত হইয়া এক মাত্রা দেওয়া হইয়া থাকে, অথচ প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন শীঘ্র পাওয়া যাইতেছে না, তখন অন্যদিকে অধৈর্য্যের পরিবর্ত্তে একবার **রোগীর মানসিক অবস্থা যদি পর্য্যবেক্ষণ করা হয়,** তবে হয়ত দেখা যায় যে, যদিও এখনও কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই, তবুও রোগী যেন তাহার মনে একটা স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছে, এবং তাহা যদি হয় তবে আর বিলম্ব নাই,—অরুণোদয় হইয়াছে, শীঘ্রই সূর্য্যোদয় হইবে।

এক্ষণে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যেখানে ঔষধ ও তাহার শক্তি সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত সময় অপেক্ষা করা হইয়াছে, **সেখানে অতি অবশ্যই প্রাথমিক লক্ষণ সকল পুনরায় আসিবে, ইহাই আশা করা উচিত।** অনেক সময় এরূপ হয় যে, প্রাথমিক লক্ষণ পুনরাবির্ভাবের পূর্ব্বে, বহু পূর্ব্বে এবং তরঙ্গাবির্ভাবের পরে, একটী এমন সময় আসে, যখন রোগীর অবস্থা একেবারে **প্রশান্ত, স্থির ও লক্ষণশূন্য**—অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার মত লক্ষণ সকলের আসা যাওয়ার ভাবও নাই, অথচ রোগীর যে সকল প্রকৃষ্ট লক্ষণ ছিল, যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচন কার্য্য করা হইয়াছে, সেগুলিও লোপ পাইয়াছে, এখন কোনও লক্ষণই নাই অথবা ২।১টী সামান্য বাজে অনাবশ্যকীয় লক্ষণমাত্র আছে, অথবা কিছুই নাই—রোগীর অবস্থা একেবারে প্রতিক্রিয়াশূন্য, স্থির ও প্রশান্ত।

এ অবস্থায় চিকিৎসকের মনের অবস্থা অতি ভয়ানক। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠেন, মনে করেন—এ অবস্থায় নিশ্চয়ই আর একবার ঔষধ দেওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য, এবং তাহার যদি অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে তিনি এ অবস্থায় ঔষধ না দিয়া ত থাকিতেই পারিবেন না—এদিকে রোগীও তাহার বাড়ীর লোক ঔষধের জন্য বিব্রত করিয়া তুলিবে। এ অবস্থায় নিত্য অন্ততঃ একবার করিয়া প্ল্যাসেবো দেওয়াতে রোগীর তরফ হইতে কৈফিয়ৎ বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তাঁহার মনে এইরূপ তর্ক আশা উচিত—"আমি হোমিওপ্যাথ, আমি প্রকৃষ্ট লক্ষণ-সমষ্টির উপর ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছি, প্রতিক্রিয়াও হইয়াছে, প্রতিক্রিয়া কিছুদিন চলিয়া আবার লক্ষণশূন্যতা আসিল, নিশ্চয়ই ঔষধের ক্রিয়া চলিতেছে,—অতি গভীর প্রদেশে কার্য্য চলিতেছে, ঔষধশক্তি অতি নিগূঢ় অভ্যন্তরে ক্রিয়া করিতে এতই ব্যাপৃত যে বাহিরে ক্রিয়া প্রকাশ করিবার মত অবসর নাই, এবং সেখানে কাজ করা শেষ হইলে তবে বাহিরে লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। সে যাহাই হউক, লক্ষণ-শূন্যতার উপর আমি কি করিতে পারি? লক্ষণ না পাইলে **কাহার উপর নির্ভর করিয়া** কি নীতিতে ঔষধ দিব? অতএব অপেক্ষা করাই সঙ্গত।" পরন্তু, এই স্থলে আরও অল্পদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই প্রাথমিক লক্ষণ সকল নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে। তবে সাবধান, যদি তাড়াতাড়ি ঔষধ দেওয়া হয়, এমন কি, যে ঔষধ যে শক্তিতে দেওয়া হইয়াছে যদি তাহাই দেওয়া হয়, তাহা হইলেও রোগীর ভয়ানক অনিষ্ট হইবে, এমন কি, হয়ত আর সে সারিবেনা,—অন্ততঃ একটা ভয়ানক গোলযোগ আনিবে, ইহার সন্দেহ নাই। প্রাচীন পীড়া চিকিৎসা করিবার সময় বিশেষ কথা, সর্ব্ব প্রধান কথা, একটি—**সেটী ধৈর্য্যাবলম্বন, রোগীপক্ষে ত বটেই, চিকিৎসকপক্ষেও বটে।**

কেবলমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বনের ত্রুটীতে অনেক রোগীর অনিষ্ট ঘটে। এ অবস্থায় যদি সর্ব্বপ্রথম মাত্রার ফলে কিছুদিনের পর একটী ওলট পালট, একটী দোলায়মান, একটী আসা যাওয়া, একটী চাঞ্চল্যপূর্ণ তরঙ্গায়িত অবস্থার সময় নিজের মনে বা রোগীর তরফ হইতে ঔষধ দিবার প্রবৃত্তি আসে; সেখানে চিকিৎসকের মনে এই তর্ক আসা উচিত যে, বর্ত্তমান তরঙ্গায়িত, অনির্দ্দিষ্ট ভাবযুক্ত অবস্থায় **কিসের উপর ঔষধ দেওয়া হইবে?** যখন ঔষধ দিতে হইবে, তখন ত একটী **লক্ষণ সমষ্টি** আবশ্যক, কিন্তু যখন নিত্য নূতন নূতন লক্ষণ আসা যাওয়া করিতেছে, কোন স্থিরতা নাই, কোনও নির্দ্দিষ্টতা নাই, **তখন কোন্ সমষ্টির উপর ঔষধ দেওয়া হইবে।** তাহার পর যখন সেই তরঙ্গায়িত অবস্থা অতিবাহিত হইবার পর একটী প্রশান্ত, লক্ষণশূন্যতার অবস্থা আসিল, **তখন ঔষধ দিবার মত লক্ষণের একেবারে অভাব,** কাজেই কি প্রকারে ঔষধ দেওয়া চলে? এই প্রকার যুক্তিতর্ক মনে আনয়ন করা ও আবশ্যক বোধ করিলে রোগীর আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলা ও পর্য্যবেক্ষণ করা—চিকিৎসকের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহা স্থির করিতে হইবে। অতি শীঘ্রই দেখিবেন আপনার বাঞ্ছিত পূর্ব্বলক্ষণসমষ্টি, যাহার উপর আপনি সর্ব্বপ্রথম মাত্রা দিয়াছিলেন, তাহা ফিরিয়া আসিবে, হয়ত কোনও কোনও লক্ষণ একটু তীব্রতর অথবা কোনও কোনও লক্ষণ একটু ক্ষীণতর ভাবে আসিয়া থাকে, ফলতঃ সমষ্টি তাহাই অর্থাৎ সেই সেই লক্ষণের সমষ্টি। যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণের সমষ্টিই আসে, অথবা আরও পরিষ্কার ভাবে কহিতে হইলে, যদি মনে করা যায় যে, যেন ঐ রোগী অদ্যই সর্ব্বপ্রথম আপনার নিকট আসিয়াছে ও আপনি যেন তাহার লক্ষণসমষ্টি সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে আপনার পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত ঔষধ ঠিক প্রয়োগ করা উচিত, যদি এইরূপই আপনি অনুভব ও যুক্তির দ্বারা স্থির করেন, অর্থাৎ

পূর্ব্ব নির্ব্বাচিত ঔষধ পরিত্যাগ করিবার মত কোনও পরিবর্ত্তন আসে নাই, তবেই আপনাকে পূর্ব্ব প্রদত্ত ঔষধই আরও একমাত্রা দিতে হইবে,—কিন্তু বিভিন্ন এবং উচ্চতর শক্তিতে দিতে হইবে।

যদি প্রথম মাত্রা দিবার পর উপরোক্ত ভাবে অবস্থাগুলি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে, তবে একটী অতি আশ্চর্য্যজনক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি অপূর্ব্ব! সেটা কি? সেটী **রোগীর মানসিক উন্নতি, অর্থাৎ সেই উন্নতিটী রোগী নিজের মনোমধ্যে অনুভব করিয়া থাকে।** প্রথম মাত্রা প্রয়োগ করার অতি অল্পদিন পর হইতেই রোগী নিজের মনে **একটী আশা, একটী আনন্দ, একটী স্বচ্ছন্দতা অনুভব** করিতে থাকিবে, এবং তাহা **ক্রমেই বর্দ্ধমান** হইবে। এই **আনন্দানুভবই অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র পরীক্ষা বা একমাত্র নিদর্শন যে, ঔষধ ঠিক নির্ব্বাচিত হইয়াছে।** দেখা যায়, যে সকল লক্ষণ রোগীর পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক ছিল, হয়ত সেই সকল লক্ষণ ঠিকই আছে, কিন্তু **তাহা সত্ত্বেও** রোগী নিজের মনে একটী বেশ আনন্দ, বা আরোগ্যের আশা অনুভব করিতে থাকে। ইহা হইতেই চিকিৎসক বুঝিতে পারেন যে তাঁহার ভ্রম হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে ২য় মাত্রা অর্থাৎ ২য় নির্ব্বাচন আরও কোন্ অবস্থায় কি ভাবে করিতে হইবে, তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় আরও একটী বিশেষত্ব,—ঔষধ নির্ব্বাচন বিষয়ে। মনে করুন, আপনি নিউমোনিয়া, বা জ্বর-বিকার চিকিৎসা করিতে গিয়াছেন, সেখানে রোগীর যে যে লক্ষণ আছে, সেগুলির সমষ্টি হিসাবে একটী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই আপনার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া থাকে,—প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় তাহা নয়। প্রাচীন পীড়াতে লক্ষণসমষ্টি লইবার পর দেখিতে হয় যে, কোন্ কোন্ লক্ষণ বর্ত্তমান

সময়ে প্রস্ফুটিত ও **জাগরিত**। তাহার পর সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিসের মধ্যে **কোন্ দোষটী** হইতে রোগীর বর্ত্তমান কষ্টকর লক্ষণ সকল পীড়াদায়ক হইয়াছে, জানিতে হইবে। আপনি যে যে লক্ষণ পাইলেন, প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে কোন্ গুলি বর্ত্তমান সময়ে রোগীদেহে বিকশিত, সেগুলি স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া জানিতে হইবে যে, সে গুলি ঐ তিনটী দোষের মধ্যে **কোন্ দোষ** হেতু আসিয়াছে। তিনটী দোষের মধ্যে কোনও একটী দোষই এক সময় জাগরিত হয়, অন্য দুইটী তখন যেন সুপ্তাবস্থায় থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে যে লক্ষণ রোগীকে পীড়া দিতেছে, তাহারা ঐ ৩টী দোষের **কোন্ দোষটী হইতে** সমুদ্ভূত, সেটী জানিয়া **সেই দোষঘ্ন** এবং **ঐ ঐ লক্ষণ-সমষ্টীর সাদৃশ্যে** নির্ব্বাচিত ঔষধ দিতে হইবে। প্রাচীন পীড়ার ঔষধ নির্ব্বাচনে দুই দিকে নজর রাখিতে হয়, ১মতঃ **কোন্ দোষটী** বর্ত্তমানে লক্ষণ সকল প্রসব করিয়া রোগীকে পীড়া দিতেছে ; ২য়তঃ সেই দোষঘ্ন ঔষধের মধ্যে **কোন্ ঔষধটী সাদৃশ্য হিসাবে নির্ব্বাচনযোগ্য**। এই দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যে ঔষধ নির্ব্বাচন করা হইল, তাহার ফলে রোগীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণ সকল, যাহা পূর্ব্বে অচিকিৎসা, কুচিকিৎসা ইত্যাদি দ্বারা অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহারা আবির্ভাব হইবে ; এবং সেই মাত্রার ক্রিয়া শেষ হইলে পুনরায় তখনকার লক্ষণানুসারে নির্ব্বাচন করিতে হয়, এবং নির্ব্বাচন করিবার সময় যদি দেখা যায় যে, অন্য আর একটী দোষ "মাথা তুলিয়াছে" ও তাহার লক্ষণ সকল দেখা দিয়াছে, তবে আবার উপরোক্ত দুইটী বিষয় (অর্থাৎ কোন্ দোষটী জাগরিত এবং সেই দোষঘ্ন ঔষধ সকলের মধ্যে সদৃশতম কোন্টী) লক্ষ্য রাখিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে। এই প্রকারে রোগী আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে হইবে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, **কোনও ১টী রোগীর পক্ষে যেন কোনও একটী ঔষধ একেবারে নির্দ্দিষ্ট**। সে

চিকিৎসা করা অত্যন্ত আরামজনক। ইহা কি প্রকার, তাহা বিস্তারিত ভাবে লিখিত হওয়া উচিত।

সদৃশ ও সদৃশতম।

আপনার রোগীকে লক্ষণসাদৃশ্যে ঔষধ দিতে হইবে, ইহাই আমাদের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের উপদেশ। এক্ষণে, "সাদৃশ্য" এই কথাটীর উপর বিশেষ মনোযোগ দিলে দেখা যায় যে, রোগীবিশেষে সাদৃশ্যের অনেক তারতম্য থাকে। সাধারণ রোগীদিগের নির্ব্বাচন ও চিকিৎসার কথা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় একাধিক ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কদাচিৎ ২।৪টী রোগী পাওয়া গিয়া থাকে, যেখানে একটী ঔষধের ফলে আরোগ্য হওয়া তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব জানিতে হয়, **সদৃশ** ও **সদৃশতম** কাহাকে কহে।

রোগীর লক্ষণসমষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রায় দেখা যায় যে, নানা লক্ষণের মধ্যে কেবল কতকগুলি মাত্র লক্ষণ আছে, যাহাদের প্রাধান্য অনুসারে চিকিৎসক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হয়েন,—কিন্তু নির্ব্বাচিত ঔষধে রোগীর সকল লক্ষণ নাই। প্রধান প্রধান মানসিক ও শারীরিক পীড়াদায়ক লক্ষণগুলি লইয়া যে ঔষধটী নির্ব্বাচিত হইল, তাহাকে "**সদৃশ**" ঔষধ বলা যায়। আবার দুই একটী এরূপ রোগী পাওয়া যায় যে, তাহারা এক **একটী ঔষধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি** বলিলেও চলে। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে একটী ঐ প্রকার আইওডিনের রোগী পাইয়াছিলাম। এক্ষেত্রে, এ রোগীর আইওডিন "**সদৃশতম**" ঔষধ বলা যায়। রোগীর প্রত্যেক লক্ষণ, প্রত্যেক বিশেষত্ব, প্রত্যেক ধাতুগত প্রকৃতি, ইত্যাদি যদি বর্ণে বর্ণে কোনও ঔষধের সহিত মিল থাকে, তবে উহাকে ঐ রোগীর "**সদৃশতম**" ঔষধ বলিতে হইবে।

এখানে দেখা যায়, সদৃশতম ঔষধেরই নিম্ন হইতে লক্ষাধিক ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে রোগী সারিয়া যায়, অন্য কোনও ঔষধের প্রয়োজন হয় না। এপ্রকার রোগীও ভাগ্যবান্ এবং তাহার চিকিৎসকেরও চিকিৎসা করা অতিশয় আনন্দজনক। তবে এরূপ রোগী সংখ্যায় অতি অল্প এবং ক্রমেই নানাপ্রকার ঔষধের অবাধ ব্যবহারহেতু এবং অন্যান্য কারণে এরূপ রোগী কমিয়া যাইতেছে। অন্য পক্ষে, আমি একটী রোগীর কথা এ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভুলিব না; কেননা তাহাকে ক্রমে ৬টী এন্টিসোরিক, ৩টী এন্টিসাইকোটিক ঔষধের ২০০ হইতে কাহারও বা ৫০ এম কাহারও বা সি, এম, কাহারও বা আরও উচ্চতর শক্তির ব্যবহার করিয়া তবে আরোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সম্পূর্ণ ৫ বৎসর ৯ মাস কাল তাহাকে আরোগ্য করিতে সময় লাগিয়াছিল। যাহা হউক, প্রায়ই ৩।৪টী ঔষধের নানা ক্রমের ঔষধ প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইবার কথা, তবে ক্ষেত্রবিশেষে কম আর বেশী। যেখানে সদৃশতম ঔষধ ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র পাওয়া যায়, সেখানে কেবল এক একটী শক্তির কার্য্য শেষ হইবার পরে উচ্চতর শক্তি ব্যবহার করিয়া যাওয়া ব্যতীত চিকিৎসকের অন্য কর্ত্তব্য বড় বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু ইহা ব্যতীত সাধারণ ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ধৈর্য্য ও পর্য্যবেক্ষণের সীমা নাই, যেন সর্ব্বদাই সচকিত নয়নে থাকিতে হয়। কেবল ব্যবসা হিসাবে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা চলে না, রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে একটী ভালবাসার টান ব্যতীত এত পরিশ্রম সম্ভব হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথিতে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসককে প্রকৃত মনুষ্য হইতেই হয়, নতুবা চিকিৎসকেরও চিকিৎসায় হাত দেওয়া চলে না, এবং রোগীরও বড় অসুবিধা হয়।

প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা।

৩য় ভাগ—প্রয়োজনীয় কথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রোগী-লিপি

অনেকেই মনে করেন যে, "রোগীলিপি তৈয়ার করা সেরূপ কিছু একটা বিশেষ মনোযোগের বিষয় নয়। রোগীর যে সকল কষ্ট ও যাতনা আছে, তাহা ত সে বলিবেই, ও সে যাহা বলে, তাহা লিখিয়া লইলে কিম্বা তাহার দ্বারা লিখিত একখানি পত্র বা বর্ণনা পাইলেই যথেষ্ট হয়।" অন্যান্য "প্যাথির" কথায় আমার প্রয়োজন নাই, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে রোগীলিপি তৈয়ার করার অপেক্ষা কঠিন কার্য্য, আমার বোধহয়, আর কিছুই নাই। হ্যানিম্যান তাঁহার অর্গেননের মধ্যে এই বিষয়ে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, উত্তমরূপে রোগী-লিপি তৈয়ার করিলেই রোগী অর্দ্ধেক আরোগ্য হইয়া থাকে,—ইহার অর্থ প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ, তিনি কহিয়াছেন যে রোগীলিপিখানি তৈয়ার করার উপরে রোগীর আরোগ্য এত বেশী নির্ভর করে যে, যদি লিপিখানি সম্পূর্ণভাবে তৈয়ার হয়, তবে রোগীর আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব থাকে না। আমি ইহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয় এবং উপাদেয় উপদেশ আর আছে কিনা বলিতে পারি না। যে সকল চিকিৎসক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অতি অল্পদিন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ঐ উপদেশ যে কত মূল্যবান্ তাহা অনুভব করেন না;

এবং অতি অল্পদিন পরেই যখন দেখিতে পান যে, অতি যত্ন সহকারে যে ঔষধ নির্ব্বাচন করা হইয়াছে তাহাও সুফল দিতেছে না, তখন তাঁহাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে, এবং কোথায় তাহাদের ভ্রম ও ক্রটী তাহা দেখিতে পান।

অনেকেই আবার মনে করেন যে লিপি তৈয়ারের আদৌ **আবশ্যকতাই নাই**। রোগীর মুখে বা তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট দুই চারিটি লক্ষণাদি শুনিয়া অতি শীঘ্রই একটা ঔষধ মনে আনিয়া ফেলেন এবং ঔষধ দিয়া বসেন। কিন্তু এ ধারণা তাঁহাদের ও যে সকল হতভাগ্য রোগী তাঁহাদের নিকট চিকিৎসা এবং আরোগ্যের আশা করে, এই উভয় পক্ষেই সর্ব্বনাশের হেতু। চিকিৎসকদিগের সর্ব্বনাশ অর্থে,—অচিরাৎ তাঁহাদের খ্যাতি নষ্ট হয়, এবং লোকে ফল না পাইলেই চিকিৎসকের নিন্দা করিয়া থাকে। চিকিৎসক যদি একবার অখ্যাতি ও অযশের পাত্র হন, তবে পুনরায় প্রতিপত্তি গড়িয়া তোলা অনেক সময় কষ্টকর, এমন কি, অসম্ভব। আর রোগীর পক্ষে সর্ব্বনাশ অর্থে, হয়ত অন্যের নিকট চিকিৎসা করাইলে আরোগ্য হইত, এক্ষণে সময় গত হওয়ায় তাহার শরীরের ও রোগের এরূপ অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে যে, আর আরোগ্য হওয়া অনেকটা সুকঠিন, এমন কি, আরোগ্যের বহির্ভূত হইয়াছে। এ প্রকার ধারণা অত্যন্ত পরিতাপের কথা। আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথিক স্কুল বা কলেজের অধ্যাপক মহাশয়দিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই যে, যেন তাঁহারা ছাত্রদিগের মনে রোগী-লিপি করিবার আবশ্যকতাটী বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। গত ১৯২৭ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে মেদিনীপুরের কোনও একটী আরোগ্যপ্রাপ্ত (আমার) রোগী আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, কোনও একটী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কেবল মুখের কথায় উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম শক্তির ঔষধ ছয়মাস বা এক

বৎসরের জন্য ২।৩।৪ দিন অন্তর অন্তর এক মাত্রা করিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া রোগীকে বা রোগীর লোককে বিদায় দিয়া থাকেন। তিনি ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমাকে এই বিষয়ের সামান্য আলোচনা (সুবিখ্যাত হ্যানিম্যান পত্রিকাতে) করিতে অনুরোধ করেন, এবং তদনুসারে আমিও লিখিয়াছিলাম,—(১৯২৭ সালের হ্যানিম্যান দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, আমি আমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদিগকে বিশেষ বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন বিনা রোগীলিপিতে কোনও রোগী চিকিৎসা করিবার প্রয়াসী না হয়েন।

রোগীলিপির আবশ্যকতা।—রোগীর লিপি প্রকৃতই অতিশয় আবশ্যক। **১ম কথা**, অনেক সময় রোগী কেবল তাহার কষ্টজনক লক্ষণগুলিমাত্র চিকিৎসককে অবগত করাই যেন যথেষ্ট মনে করে। রোগী নিজে যে সকল কষ্ট ও যাতনা ভোগ করে, সেই গুলিই তাহার চিকিৎসককে বলিবার জন্য ব্যস্ত থাকে, এবং সেগুলি দেওয়া হইলেই সে নিশ্চিন্ত হয়। এক্ষণে যদি চিকিৎসক সেগুলি লিপিবদ্ধ না করেন, তবে ঐ সকল লক্ষণের মধ্যে কোনটী বা কোন্ কোন্টী নির্ব্বাচনকার্য্যের সহায়ক, কোন্ কোন্টী সে কার্য্যের সহায় হইবে না, তাহা কিরূপে স্থির করিতে পারিবেন? আমাদের শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, রোগীপ্রদত্ত নানা লক্ষণের মধ্যে নির্ব্বাচনকার্য্যের মূল্যানুসারে সেগুলি সাজাইতে হইবে;—অর্থাৎ নির্ব্বাচন কার্য্যের জন্য যেগুলি অতিশয় মূল্যবান্ হইবে সেগুলি ১ম শ্রেণী, তাহাদের অপেক্ষা যেগুলির মূল্য কিঞ্চিৎ কম, তাহাদিগকে ২য় শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে, এবং বাকিগুলি ৩য় শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। এ অবস্থায় লিপিবদ্ধ না করিলে লক্ষণগুলিকে মূল্যহিসাবে সাজান অসম্ভব। **২য় কথা**, প্রায়ই দেখা যায় যে, রোগীর প্রদত্ত লক্ষণগুলির মধ্যে নির্ব্বাচন কার্য্যে সাহায্য করিবার মত কোনওটীই নাই। সে প্রকার

প্রয়োজনীয় লক্ষণগুলিকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিয়া লইতে হয়। অতএব, লিপি প্রস্তুত না করিলে প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয়, কি প্রকারে জানা যাইবে? অথবা, কি প্রকার লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা যথেষ্ট কিনা, আরও কি কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় নিরূপণ কি প্রকারে হইবে? অনেক সময় রোগীলিপিখানি বার বার পাঠ করিবার পর, তবে তাহার মধ্যে কোথায় ও কি ভাবে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। **৩য় কথা**, নির্ব্বাচন করিবার সময় রোগী লিপি সম্মুখে না থাকিলে কখনও বিশুদ্ধভাবে নির্ব্বাচন কার্য্য হয় না। দেখা যায় যে, দুইটী বা তিনটী ঔষধের মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য রোগীলিপিই একমাত্র সহায়। কেবল একটী মাত্র লক্ষণের জন্য একটী ঔষধ ত্যাগ করিয়া অন্যটী নির্ব্বাচিত হইতে পারে। রোগীলিপি সম্মুখে থাকিলে তবেই তাহাকে সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা সম্ভব হয়, নতুবা হয় না। **৪র্থ কথা**, রোগীকে ঔষধ দিবার পর যদি ক্রিয়া না হয়, তবে নির্ব্বাচনের ভ্রান্তি বা অন্য কোনও বাধা জন্য ক্রিয়া হয় নাই, ইহা স্থির করিতে হইলে রোগীলিপি একান্তই আবশ্যক হয়, এবং যদি ক্রিয়া হয়, তবে কোন্ কোন্ লক্ষণের তিরোধান হইল, কোন্ কোন্ লক্ষণ রহিল, বর্ত্তমানে কোনও নূতন লক্ষণ আসিল কিনা, অথবা ঐ নূতন লক্ষণ রোগীদেহে পূর্ব্ব হইতে ছিল কিনা, ঔষধ দিবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ লক্ষণ ছিল, এক্ষণে যে সকল লক্ষণ রোগীতে দেখা যাইতেছে, তাহারা বহুপূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছিল ও এক্ষণে পুনরাবির্ভাব হইয়াছে কিনা,—ইত্যাদি নানা বিষয় নির্ণয় করা অতীব প্রয়োজন হইয়া উঠে, কিন্তু লিপি না থাকিলে এ সকল নির্ণয় করা কিরূপে চলে? মানবের স্মৃতিশক্তির উপর এরূপ নির্ভর করা কখনও সম্ভব নয় যে, রোগীর মুখে একবার যাহা শুনা যাইবে, তাহা চিকিৎসকের মনে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকিবে,—

ইহা কখনও আশা করিতেও নাই। ইহা ব্যতীত, লিপি না থাকিলে কোন্ ঔষধ, কোন্ শক্তিতে, কোন্ তারিখে, কি ভাবে প্রয়োগ করা হইল, কি ফল হইল, অতঃপর কি করিতে হইবে, কিরূপে স্থির হইবে? সর্ব্বশেষে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, একজন চিকিৎসকের রোগী-লিপি রীতিমতভাবে রক্ষিত হইলে, তাঁহার নিজের এবং অপরের অনেক কল্যাণ হইয়া থাকে। চিকিৎসক ভবিষ্যতে তাঁহার চিকিৎসার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা পান, এবং নূতন শিক্ষার্থীদিগেরও শিক্ষা বিষয়ের অনেক সহায়তা করে। রোগীলিপি না রাখিয়া চিকিৎসকের প্রাচীন পীড়া চিকিৎসায় ব্রতী হওয়া অতীব গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করি। রোগীদিগের প্রতি যে চিকিৎসকের ভালবাসা ও কর্ত্তব্যবোধ থাকে, এবং সততার সহিত তাহাদের ও নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা যিনি করিয়া থাকেন, তিনি অতি অবশ্যই রোগীলিপি প্রস্তুত না করিয়া কখনই চিকিৎসায় অগ্রসর হন না। গত ৮।১০ বৎসরের ডায়েরী হইতে চিকিৎসক ইচ্ছা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, এবং নিজের ভুলভ্রান্তি থাকিলেও সংশোধন করিবার প্রবৃত্তি আসে।

কিরূপে **রোগীলিপি** তৈয়ার করিতে হয়, সে বিষয়ে যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ, তাঁহাদের প্রয়োজন না হইলেও আমি ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের জন্য লেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। **সর্ব্ব প্রথমেই রোগীকে তাহার নিজের দুঃখ, কষ্ট ও যাতনার বিষয় নিজের ভাষায় বলিতে দেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য।** কেবল সে ব্যক্তি কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণা না করে, এজন্য দৃষ্টি রাখিতে হয়, এবং যদি তাহা করে, তবে মিষ্টভাবে তাহাকে আসল কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে হয়, অথবা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হয়। চিকিৎসকও রোগীর ভাষাতেই অবিকল লিখিয়া যাইবেন, এবং যাহাতে

রোগীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকও লিখিয়া যাইতে পারেন, এই জন্য রোগীকে তাহার ঐ সকল কথা একটু ধীরে ধীরে বলিবার জন্য প্রথমেই অনুরোধ করিয়া রাখা ভাল। চিকিৎসক কেবল প্রত্যেক ছত্র লেখার ভিতর, যেন ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে, আরও একটী ছত্র লিখিতে পারেন, এরূপভাবে বেশ ফাঁক ফাঁক করিয়া লিখিয়া যাইবেন। যতক্ষণ রোগীর কোনও কথা বলিবার থাকে, ততক্ষণ তাহাকে নিজের মনে বলিতে দেওয়া বিশেষ সঙ্গত,—এবং তাহার বক্তব্য শেষ হইলে "তোমার তাড়াতাড়ির কোনও প্রয়োজন নাই, আরও যদি কিছু থাকে, বলিতে পার, আমি অপেক্ষা করিতেছি," এই প্রকার বলিয়া তাহার যাহা যাহা বলিবার থাকে, তাহা শেষ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা ভাল যে, চিকিৎসকের রোগীলিপির খাতাখানি মোটা ও বাঁধান হইবে, এবং ৫টী স্তম্ভ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহার মধ্যে ২টী স্তম্ভ ছোট অর্থাৎ অল্প পরিসর হইলে ক্ষতি নাই, কেননা উহার ১টী স্তম্ভে নির্ব্বাচিত ঔষধের নাম ও আর ১টী স্তম্ভে তারিখ থাকিবে। ঔষধের সঙ্গে তাহার শক্তিটীও লিখিয়া রাখিতে হইবে। কেহ কেহ রোগীলিপি লেখা হইবার পর ঐ প্রকার স্তম্ভ করিয়া লইতে উপদেশ দেন, কিন্তু অনেক সময় রোগী ইতিপূর্ব্বে কি কি ঔষধ ব্যবহার করিয়াছে, এবং ঐ ঐ ঔষধ ব্যবহার করিবার দিন তারিখও তাহার ইতিহাসের মধ্যেই কহিয়া থাকে, কাজেই প্রত্যেক পাতাতেই স্তম্ভ করিয়া রাখাই যেন ভাল বলিয়া মনে হয়,—ফলতঃ প্রত্যেক চিকিৎসক তাঁহার সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া করিতে পারেন। বাকী ৩টী স্তম্ভ অতীব প্রয়োজনীয় ও প্রত্যেক চিকিৎসকই যেন এ বিষয়ে মনোযোগ দেন। এই ৩টীর মধ্যে ১টী স্তম্ভ যেন সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়, তাহাতে রোগীর বক্তব্য সকল লিখিতে হয়, ২য়টীতে প্রত্যেক লক্ষণের, অন্ততঃ প্রধান প্রধান লক্ষনের হ্রাসবৃদ্ধি লিখিতে হয়, এবং ৩য়টীতে রোগীর হাব-ভাব, প্রকৃতি, ইত্যাদি,—

চিকিৎসক যাহা ও যেরূপ লক্ষ্য করিলেন, তাহা এবং অন্যান্য মন্তব্যও লিখিতে হয়। এই ৩য় স্তম্ভে অথবা ডায়েরির অন্য কোনও স্থানে ঐ রোগীর ঔষধ প্রয়োগের ফলাফল লিখিয়া রাখিতে হয়। বিশেষ কথা, রোগীলিপিতে বা ডায়েরীতে কোনও কথা ইঙ্গিতে লিখিতে নাই, অর্থাৎ এমন ভাবে লিখিতে হইবে যেন চিকিৎসক নিজে এবং অপর কোন চিকিৎসক ভবিষ্যতে রোগীর চিকিৎসা ব্যাপারটী দর্পণের ন্যায় জানিতে পারেন ও বুঝিতে পারেন,—সকল বিষয়ই বেশ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যদিও ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছে, তবুও এই প্রকার জটিল বিষয় পুনরুক্তিতে দোষ নাই।

রোগীর বক্তব্য নিঃশেষ হইলে পর, **তবেই চিকিৎসকের জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষেত্র উপস্থিত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে।** কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? রোগী যে যে লক্ষণ বলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীর **হ্রাসবৃদ্ধি,**—কখন হয়, কিসে হয়, কি অবস্থায়, কি করিলে, কি ভাবে, কোন্ ঋতুতে হইয়া থাকে, ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া লইয়া উপরোক্ত ২য় স্তম্ভটী পরিপূরণ করিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। কেন? কি প্রয়োজনে? কোনও একটী **ঔষধের চিত্রটীকে** সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ করার প্রয়োজনে। রোগীর নিজের দেওয়া লক্ষণা-বলীর দ্বারা ঔষধের চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হয় না, এজন্য ঐ চিত্রটীকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই জিজ্ঞাসা করা। এখানে **একটী বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।** রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চিত্রটী সম্পূর্ণ করিবার **পূর্ব্বে কোনও ঔষধ বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে নাই।** চিকিৎ-সক কেবল সাধারণ ভাবেই প্রত্যেক লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধি জিজ্ঞাসা করিয়া ২য় স্তম্ভটী পূর্ণ করিবেন ও তাহার পরে সমস্ত রোগীলিপিখানি বার বার পাঠ করিয়া তাঁহার মেটেরিয়া মেডিকার নানা ঔষধের চিত্রগুলি যাহা

তাঁহার মানসপটে পূর্ব্ব হইতে অঙ্কিত আছে, তাহাদের মধ্যে কাহার চিত্রের সাদৃশ পাইলেন, তাহা স্থির করিবেন। এ সময়, যদি দুইটী ঔষধের মধ্যে কোন্‌টী তাহা স্থির করিবার অসুবিধা ঘটে, তবে বিভিন্নতাজ্ঞাপক ২।১টী লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারেন। **এই হ্রাসবৃদ্ধির স্তম্ভটী অতিশয় প্রয়োজনীয়,** এবং এটী পরিপূরণ করিতে না পারিলে ঔষধ নির্ব্বাচনের আশা সুদূরপরাহত। এমন অনেক রোগী আসে, যাহাদের নিকট হইতে হ্রাসবৃদ্ধি বা বিশেষত্বজ্ঞাপক লক্ষণ আদৌ পাওয়া যায় না। তাহারা বলিয়া থাকে—"এটী মধ্যে মধ্যে হয়, কখন হয়, তার কি ঠিক আছে ?" অথবা, "সকল সময়েই হয়, সময়ের ঠিক নাই," ইত্যাদি। এ সকল রোগীর চিকিৎসা করা বড় কঠিন, এমন কি, ইহাদের মধ্যে কাহারও বা একেবারে অসম্ভব। আপনি বিশেষ লক্ষণ বা হ্রাসবৃদ্ধির লক্ষণ না পাইলে, কি করিবেন ? আমার নিজের এমন কতকগুলি রোগী আছেন, যাঁহারা বহুদূর হইতে পত্রের দ্বারা চিকিৎসা প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং নিজেদের রোগীলিপি লিখিয়াছেন, যাহার মধ্যে একটী মাত্র লক্ষণও পাইবেন না, কেবল কোন চিকিৎসক কি ঔষধ কি ভাবে দিয়াছিলেন, তাহারই এক একটী প্রকাণ্ড ইতিহাস এবং বর্ণনা মাত্র। হয়ত ৫।৬ দিনে পত্র যায়, আবার পত্রের দ্বারা দুইবারে, তিন বারে, চারি বারে, যাবতীয় বিশেষ লক্ষণ ও হ্রাস-বৃদ্ধির কথা জিজ্ঞাসার দ্বারা জানিয়া তবে তাঁহাদের নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে। তাঁহাদেরও দোষ নাই, কেননা তাঁহাদের সরল ধারণা এই যে, রোগের নাম ও চিকিৎসার ইতিহাস হইলেই যথেষ্ট হইবে। যাহা হউক, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, যে কোনও উপায়েই হউক, বিশেষত্বগুলিকে জানা, নতুবা পীড়ার নাম ধরিয়া তিনি ঔষধ-নির্ব্বাচন কি প্রকারে করিবেন ? আদি গুরু হ্যানিম্যান আরও একটী কথা আমাদিগকে কহিয়াছেন যে, চিকিৎসক রোগীকে এমন কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না, যাহার উত্তর কেবলই

"হাঁ" বা "না" হইতে পারে, অথবা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না, যাহার উত্তর দিতে গিয়া রোগী ঐ প্রশ্নের মধ্যেই যেন উত্তরের কতকটা আভাস পাইতে পারে। রোগীর শিরঃপীড়া লক্ষণটীর বিশেষত্ব জানিতে হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—"আপনার শিরঃপীড়া কখন হয় ?" তাহা না করিয়া যদি চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করেন—"বৈকালে বৈকালে, আপনার শিরঃপীড়া হয় কি ?"—তাহা হইলে অন্যায় হইবে। এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যাহার উত্তর তৈয়ার করিয়া দিবার জন্য রোগীকে নিজেই বাক্য যোজনা করিতে বাধ্য হইতে হয়। যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন—"আপনার আহারের পর নিদ্রা আসে কি ?" অথবা "পেটে ভারবোধ হয় কি ?" তবে সে ব্যক্তি কেবল "হাঁ" অথবা "না" বলিবার সুযোগ পাইবে, তাহাকে যেন উত্তর দিবার ভাষাটী যোগাইয়া দেওয়া হইল। এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই, এবং এরূপ প্রশ্নের উত্তর যাহা পাওয়া যায়, তাহার মূল্যও অতি কম। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"আহারের পর কোনও প্রকার অসুবিধা বা কষ্টবোধ করেন কি ?" এরূপ প্রশ্নের দোষ নাই।

রোগীর **মানসিক লক্ষণ ও প্রকৃতি** জানা বিশেষ প্রয়োজন, এবং ইহার মূল্যও বড় বেশী। যখন রোগী বর্ণনা করিতে থাকে, তখন তাহার প্রকৃতিগত ও মানসিক অবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়। পত্রের দ্বারা যে সকল রোগী দূর হইতে চিকিৎসিত হইয়া থাকে, তাহাদের পত্রের ভাষাতেই ইহার আভাষ পাওয়া যায়, লক্ষ্য করিলেই ধরা পড়ে। কথাতে বা পত্রে মনুষ্যের মানসিক অবস্থার একটী ছবি পড়িয়া থাকে, তাহা অবশ্য বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ধরিতে হয়। নিকটের রোগী এবং তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকটে এ লক্ষণ পাওয়া আদৌ কঠিন নহে। ফলতঃ যে কোনও প্রকারেই হউক, ইহা পাওয়া চাই, এবং উপোরোক্ত ৩য় স্তম্ভে লিখিয়া রাখিতে হয়। মানসিক লক্ষণের মূল্য

অন্যান্য লক্ষণের মূল্যাপেক্ষা অনেক বেশী—একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা চাই।

রোগীলিপি লেখা শেষ হইলে **নির্ব্বাচনে** মনোযোগ দিতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাচন তত্ত্ব।

হোমিওপ্যাথিতে **ঔষধ নির্ব্বাচন** অতিশয় কঠিন কার্য্য। অনেক দিনের অভ্যাস হইলে অনেকটা সহজ হয়। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত করিলে তবেই নির্ব্বাচন নিভু'ল হয়। নির্ব্বাচনের দোষে অনেক ক্ষতি হয়। কেবলই যে রোগীর সময় নষ্ট হইল, তাহা নয়, ইহা ব্যতীত আরও অধিক ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় বিশেষ সাবধানে এ কার্য্য করিবার ব্যবস্থা, তাড়াতাড়ি করিয়া যে কোনও ঔষধ দিয়া রোগীকে বিদায় দেওয়া অধর্ম্ম।

রোগী মাত্রেরই, বিশেষতঃ প্রাচীন পীড়ার প্রত্যেক রোগীরই, একটী করিয়া স্বতন্ত্র রোগীলিপি প্রস্তুত করিতে হয়। কিরূপে করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রোগী-লিপিতে কতকগুলি লক্ষণ লিখিত আছে ও থাকে, নির্ব্বাচনকার্য্য সেই সকল লক্ষণ সমষ্টির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। ফলতঃ এই লক্ষণসমষ্টির মধ্যে প্রত্যেক লক্ষণের **মূল্য** সমান নয়। কোনও কোনও লক্ষণ অতীব মূল্যবান্, আবার এমন লক্ষণও থাকে, যাহা নির্ব্বাচনকার্য্যের আদৌ সহায়তা করে না। যদিও প্রত্যেক রোগীর রোগীলিপি একেবারে সম্পূর্ণভাবে পাইবার আশা করা যাইতে পারে না, তবুও এমন কতকগুলি লক্ষণ থাকা চাই, যেগুলি না থাকিলে নির্ব্বাচন করা অসম্ভব। মনে করুন, কেবল কতকগুলি **সাধারণ** লক্ষণ ব্যতীত আর কোনও লক্ষণ পাওয়া গেল না, তখন জানিতে হইবে যে, এ রোগীর জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন আদৌ সম্ভব নহে। যাহা হউক, আমরা এখানে ধরিয়া লইলাম যে, আমরা একটী সম্পূর্ণ রোগী-

লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে, কি ভাবে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে ?

ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে লক্ষণগুলিকে তাহাদের **মূল্য বা কদর হিসাবে** সাজাইতে হয়। সর্ব্বপ্রথম—**মানসিক**, দ্বিতীয়—**সার্ব্বদৈহিক**, এবং তৃতীয়—**দেহাংশিক**, লক্ষণ সকলের একটী একটী করিয়া শ্রেণী বিভাগ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইলে ভাল হয়। মানবের **মানবত্ব কোন্ খানে ? মানবের মানবত্ব,—তাহার মনে।** কে কেমন লোক, একথা বিচার করিবার সময়, আমরা তাহার দেহের রূপ বা গঠন ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দিই না, তাহার মন লইয়াই বিচার করিয়া থাকি। যাহার যেরূপ মন, আমরা তাহাকে সেই অনুসারে ভাল লোক, মন্দ লোক, সৎ, অসৎ, ইত্যাদির বিচার করি। এজন্য **মানসিক লক্ষণই সর্ব্বাদৌ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগের বিষয়।** মনকে আবার আমরা ৩টী অংশে বিভক্ত করিতে পারি, যথা, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদির অংশ ; তাহার পর, বুদ্ধিবৃত্তি, যাহার দ্বারা মনুষ্য বিচার করিয়া থাকে, সেই অংশ ; এবং স্মৃতি-ক্ষেত্র ; এই ৩টী অংশ বা বিভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। নিম্নে, রোগীলিপির মধ্য হইতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লক্ষণ কি ভাবে সাজাইতে হইবে, তাহাদের **মূল্যহিসাবে** পর পর লিখিত হইল।

১। **মানসিক**—(১) স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ; অর্থাৎ প্রীতি-ক্ষেত্র।

(২) বুদ্ধি ক্ষেত্র, অর্থাৎ বিচার শক্তি।

(৩) স্মৃতি-ক্ষেত্র।

মানসিক লক্ষণের শ্রেণী সর্ব্বপ্রথম মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, কেননা মানসিক লক্ষণের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মানসিক লক্ষণের

মধ্যে রোগীর স্নেহ, মমতার, বা প্রীতির যদি কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, মনে করুন, কোনও একটী স্ত্রীলোক তাঁহার পীড়ার পুর্ব্বে স্বামী ও সন্তানদিগের প্রতি বিশেষ প্রীতিসম্পন্না ছিলেন, কিন্তু রোগ হওয়ার পর হইতেই তাঁহার এই স্বাভাবিক প্রীতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তৎ বিপরীতে উহাদের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য বা ঘৃণার ভাব দেখা যাইতেছে,—এই যে স্বাভাবিক প্রীতির বৈলক্ষণ্য, ইহা বিশেষ মূল্যবান্ লক্ষণ। আরও মনে করুন, এরূপ ব্যক্তির পীড়ালক্ষণের মধ্যে দেখা গেল যে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে, এবং কিসে নিজে আত্মহত্যার দ্বারা জীবন নাশ করিতে পারে, ইহারই উপায় ও সুবিধা দেখিয়া বেড়াইতেছে। এখানে দেখুন, নিজের জীবনের প্রতি মমতা ও জীবের সকল প্রকার মমতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেননা জীব কখনও মরিতে চায় না। অতএব এই যে নিজের জীবনের প্রতি মমতার অভাব, ইহাই অতিশয় মূল্যবান লক্ষণ, এমন কি, অনেক সময় এই প্রকার ২।১টী লক্ষণের দ্বারাই ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া উঠে। যাহা হউক, মানসিক লক্ষণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম,—প্রীতিক্ষেত্র। তাহার পরেই বুদ্ধি-ক্ষেত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণের মূল্য। রোগের জন্য বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিলে সেই লক্ষণ-বিশেষ প্রয়োজনীয় লক্ষণ জানিতে হইবে। মানসিক লক্ষণের মধ্যে সর্ব্বশেষ লক্ষণ—স্মৃতির লোপ বা অল্পতা বিষয়ক লক্ষণ। ফলতঃ যে ব্যক্তির **স্বাভাবিক** স্নেহ মমতা কম বা বেশী, অথবা **স্বাভাবিক** ভাবেই তাহার বুদ্ধি অতি অল্প বা অতি তীক্ষ্ণ, অথবা তাহার স্মরণ শক্তি অতিশয় বেশী বা অতিশয় কম,—অর্থাৎ এ সকলের **স্বাভাবিক** অবস্থা,—কখনই চিকিৎসার বিষয় নহে, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কেবল **রোগের ফলে** ঐ ঐ শক্তির যেমন যেমন তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহাই রোগ লক্ষণ বলিয়া গণ্য এবং চিকিৎসার বিষয়, একথা যেন ভুল না হয়।

২। **সার্ব্বদৈহিক**—অর্থাৎ, যে লক্ষণ—সমগ্র দেহ সম্বন্ধীয়, সেই

লক্ষণের মূল্য মানসিক লক্ষণের ঠিক পরেই ধরিতে হইবে। ঋতুস্রাব ও পুঁজস্রাব, অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক স্রাবগুলির প্রকৃতি এবং গন্ধ ব্যতীত, সার্ব্বদৈহিক শ্রেণীতে নিম্নলিখিত কয়টী বিভাগে লক্ষণ পাওয়া গিয়া থাকে, যথা—

(ক) শীত, বর্ষা ও তাপ সম্বন্ধে সমগ্র রোগীর কি প্রকার সম্বন্ধ ?

(খ) চুপ করিয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা, বা সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনে অভিলাষ দেখা যায় ?

(গ) বাহিরের খোলাবাতাসে রোগীর কি প্রকার প্রবৃত্তি ? খোলা বাতাস চায়, কিম্বা আবদ্ধ বায়ুতেই তাহার থাকিবার অভিলাষ ?

(ঘ) রোগীনীদিগের ঋতুকালের পূর্ব্বে, ঋতুকালের মধ্যে ও তাহার পরে, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।

(ঙ) আহারের পূর্ব্বে ও পরে রোগীর কোনও পরিবর্ত্তন হয় কিনা।

(চ) বাহ্য, প্রস্রাবাদি স্বাভাবিক স্রাব হইয়া যাইবার পর রোগীর অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন হয় কিনা। এই লক্ষণগুলি সকলই সর্ব্বাদৈহিক, অর্থাৎ গোটা রোগীর পরিবর্ত্তন বা বৈলক্ষণ্য।

৩। দেহাংশিক অর্থাৎ দেহের কোনও অংশবিশেষে যে লক্ষণ বিকশিত হইয়া থাকে, তাহাকে এই শ্রেণীতে ফেলিতে হয়। **রোগী প্রায়ই যে রোগের জন্য চিকিৎসকের নিকট আসে তাহা এই শ্রেণীভুক্ত।** মনে করুন, রোগী আসিয়া কহিল, তাহার পেটে শূল বেদনা হইয়া থাকে। এই শূল বেদনাটী তাহার গোটা দেহের ব্যাধি নয়, বেদনাটী কেবল তাহার দেহের একটী অংশে অর্থাৎ পেটে বিকশিত হইয়া থাকে। এই রোগীর লিপিতে পূর্ব্ব কথিত ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর লক্ষণাবলী অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া যদি ১টী মাত্র ঔষধে উপনীত হওয়া যায়, তবে তাহার

শূলবেদনার লক্ষণের সহিত ঐ ঔষধের সাদৃশ **না থাকিলেও** কোনও আপত্তি নাই, অর্থাৎ ঐ ঔষধটীর মধ্যে যদিও শূলবেদনার লক্ষণ না থাকে, **তাহা হইলেও ঐ ঔষধই নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য, এবং তাহাতেই রোগী আরোগ্য হইবে।** মনে করুন, এই রোগীর **মানসিক** লক্ষণ এই যে, রোগী বড অসহিষ্ণু, অতি সামান্য কারণে রাগিয়া উঠে, তাহা ছাড়া, সামান্য শব্দে, সামান্য রৌদ্রে, সামান্য শীতে বেশী কাতর হয়, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না, সর্ব্বদাই এখানে ওখানে যাইবার ইচ্ছা থাকে। **সার্ব্বদৈহিক** লক্ষণের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তনের প্রবৃত্তি এবং আহার করিলে রোগীর উপশম বোধ হয় ও শীতাতপ প্রভৃতির বিষয়ে রোগীর অভিলাষ কিরূপ, তাহা জানিতে গিয়া লিপি-বদ্ধ করিয়া লইয়াছেন যে, পেটের ভিতর এবং মাথায়, ঠাণ্ডাই তাহার ভাল লাগে। এই কয়টী হইতেই আপনি ফস্‌ফোরাস্ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। এক্ষণে যদি রোগীর শূল বেদনাটী ফস্‌ফোরাসের শূলবেদনার মত না হয়, তাহাতেও কিছুই আসে যায় না, ফসফোরাসই ঐ রোগীকে আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে। যদি রোগীর বেদনা ফস্‌ফোরাসের বেদনার সদৃশ হয়, তবে ত ভালই হইল, ফলতঃ সদৃশ না হইলেও কোনও আপত্তি নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, রোগী যে রোগলক্ষণের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকটে আসে, সেই লক্ষণের মূল্য কতটুকু। অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য উহার মূল্য আদৌ থাকে না। প্রকৃত হোমিওপ্যাথি সূত্রে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইলে রোগীর শরীরস্থ কোনও অংশবিশেষে বিকশিত রোগলক্ষণের মূল্য বড় বেশী নয়, একথা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ লিপি পাওয়া বড়ই দুষ্কর, প্রায়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃত নির্ব্বাচনের জন্য কেবলমাত্র দেহের অংশবিশেষে বিকশিত রোগলক্ষণ

ব্যতীত উপরের কথিত ১ম ও ২য় শ্রেণীর লক্ষণ অত্যাবশ্যক, এমন কি তৎব্যতীত নির্ব্বাচন করা একেবারে অসম্ভব। যে যে রোগীর ঐ সকল লক্ষণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই সেই রোগীর জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন অধিক সহজ ও ফলদায়ক হইয়া থাকে। যে রোগীর কেবল-মাত্র ৩য় শ্রেণীর লক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও লক্ষণই নাই, তাহার পীড়া আরোগ্যের আশা অতি অল্প বা একেবারে নাই বলিলেই হয়,—কেননা ঔষধ নির্ব্বাচনের উপায় নাই। ১ম ও ২য় শ্রেণীর লক্ষণের একেবারে অভাব হইয়া থাকে বলিয়াই, কর্কট রোগ, রাজ-যক্ষ্মা, অর্ব্বুদ, ইত্যাদি কতকগুলি ব্যাধি প্রায়ই আরোগ্য হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, ঐ সকল রোগের কেবল ২।১টী রোগের **ফলমাত্র** অবশিষ্ট থাকে, তাহা ছাড়া কোনও লক্ষণই থাকে না, কাজেই ঔষধ নির্ব্বাচন হইতে পারে না, এবং আরোগ্যের আশাও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্মিত হইবার বিশেষ কি আছে? প্রদর্শক লক্ষণ না থাকিলে উপায় কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাহিরের সাহায্য,—সাহায্য না বাধা?

কোনও কোনও প্রাচীন পীড়ার রোগীচিকিৎসার সময় চিকিৎসককে আরও একটী দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। রোগীলিপি তৈয়ার করিয়া, যথারীতি ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার পর যখন সেই ঔষধের প্রয়োগ করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে দেখিতে হয় যে, যে রোগীকে আরোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে ঔষধ দেওয়া হইতেছে, তাহার শরীরে ঔষধের ক্রিয়া করিবার পথে কোনও **বাধা** আছে কিনা। যদি তাহা থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহা দূর করিতে হইবে, নতুবা ঔষধে কোনও ফল হইবে না। রোগী অনেক সময় রোগের কাতরতার জন্য নিজের ইচ্ছায় অথবা অন্যের উপদেশে, তাহার রোগ লক্ষণের যন্ত্রণার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে, **বাহিরের সাহায্য** অবলম্বন করিয়া থাকে। দেখা যায়, অজীর্ণের ও অম্লরোগের কথঞ্চিৎ উপশম পাইবার আশায় নিত্য নিত্য কেহ কেহ "সোডা" ব্যবহার করিয়া থাকে, কেহ বা বাতবেদনার জন্য অহিফেন সেবন অভ্যাস করিয়া ফেলে, কেহ বা শূল বেদনার উপশমনার্থ অহিফেন বা অহিফেন ঘটিত কোনও ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের জরায়ু বহির্নিষ্ক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য "পেসারি" ব্যবহারও করিয়া থাকে, এবং ঐ প্রকার একশিরা, অন্ত্রবৃদ্ধি জন্য "ট্রাস" ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায়, সর্দ্দি হইবার ভয়ে কেহ কেহ "ইউকেলিপ্টাস্ ওয়েল"এর আঘ্রাণ লয়, অথবা মূর্চ্ছার জন্য "স্মেলিং সল্ট" ব্যবহার করিয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধের জন্য মধ্যে মধ্যে জোলাপ লওয়া, নিত্য নিত্য 'ডুস' লওয়া ত আজকাল শিক্ষিত সমাজের প্রকৃষ্ট

ধারাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্র আছে, যেখানে এই প্রকারের সামান্য উপশমকারী সাহায্য অবলম্বন না করিলে চলে না, এমন কি, রোগীর জীবন সংশয় হইয়া পড়ে, সে প্রকার স্থলে অনন্যোপায় হইয়া রোগী ঐ সকল বাহিরের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়া থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ আবশ্যক না হইলেও কেবল বড়লোকের "ফ্যাসেন" জন্যই এ সকলের ব্যবহার দেখা যায়। যাহা হউক, প্রকৃত আরোগ্যকামী হইলে, **বাহিরের সকল সাহায্য একেবারে বন্ধ করিতেই হইবে, নতুবা আরোগ্য হইবে না।** বাহিরের সাহায্য সকল কখনই "সাহায্য" বলিয়া মনে করা সঙ্গত নয়, এগুলি প্রকৃত পক্ষে **আরোগ্য পথের বাধা।** যদি সাহায্য হইত, তাহা হইলে সেগুলি বন্ধ করিবার উপদেশ কখনও দেওয়া হইত না। সে গুলিকে কি জন্য বাধা বলা হইতেছে ? একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে, যে প্রাচীন পীড়ার কোনও কষ্টকর রোগ লক্ষণ যদিও রোগীর পক্ষে যন্ত্রণাজনক, কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে নির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। **লক্ষণ সকল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতির ভাষা,** এবং ঐ ভাষাই চিকিৎসকের পক্ষে ঔষধ নির্ব্বাচনের সাহায্য করিয়া থাকে, সেজন্য অনেক সময় লুপ্ত ও সুপ্ত লক্ষণ সকলকে পরিষ্কার ভাবে প্রস্ফুটিত করিয়া লইতে হয়। এরূপ স্থলে, বাহিরের সাহায্যের দ্বারা প্রকৃতির ভাষাকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে আরোগ্যের পথে বাধা না বলিয়া কি বলা যাইবে ? আরও এক কথা, প্রকৃতি প্রতিনিয়ত আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে, এ অবস্থায় বাহিরের সাহায্য পাইলে প্রকৃতি আর সাহায্য করিবে না। কাজেই ঔষধের কোন ক্রিয়াই হইবে না—কেন না, যতদিন প্রকৃতির সাহায্য থাকে, ততদিনই ঔষধ সকল আরোগ্যদানে সমর্থ হইয়া থাকে, প্রকৃতির চেষ্টা বন্ধ হইলে ঔষধ কি করিবে ? এস্থলে একটী উদাহরণ দিলে এই বিষয়টী আরও পরিষ্কার হইবে। মনে করুন, কোনও একটী স্ত্রীলোক

তাঁহার যোনি-পথে জরায়ু বাহির হইয়া পড়ার জন্য বড় কষ্ট পাইতেছেন,—তিনি যদি "পেসারী" ব্যবহার করেন, তবে কি অবস্থায় বৃদ্ধি হয়, কি অবস্থায় হ্রাস হয়, এবং বৃদ্ধির সময় অন্যান্য স্থানে, অন্যান্য যন্ত্রে, কিরূপ অনুভূতি সকলের উদয় হয়, এ সকল লক্ষণ জানিবার কোনও উপায় থাকে না। তাহা ছাড়া, তিনি তাঁহার "পেসারীর" সাহায্যে তাঁহার যাতনা ও অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন বলিয়া প্রকৃতি আর কোনও সাহায্য করিবার কারণ বা সুযোগ পাইতেছে না, কাজে কাজেই ঔষধ প্রয়োগও, প্রকৃতির নিশ্চেষ্টতার জন্য, নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে। যতদিন বাহিরের সাহায্য থাকিবে, ততদিন ঔষধে কোনও কার্য্য করিবে না। এ কথা স্থির ত বটেই, আর যদিই বা কার্য্য করে, তাহাও জানিবার কোনও উপায় থাকে না। এই সকল নানা কারণে, বাহিরের সকল প্রকার সাহায্য অপসারিত করিয়া রোগলক্ষণজনিত যাবতীয় কষ্ট ও অসুবিধা বেশ প্রস্ফুটিত ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইল, তবে হোমিওপ্যাথির সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়, নতুবা ফলের আশা করা বিড়ম্বনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঔষধ ব্যবহারকালে, রোগীর পক্ষে বিধি এবং নিষেধ।

আমাদের দেশে, এবং অল্পবিস্তর অন্যান্য দেশেও, রোগীর পক্ষে নানা প্রকার **বিধিনিষেধের** ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিধি-নিষেধের যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহার সকল গুলিরই উদ্দেশ্য একই, রোগীর রোগ আরোগ্য করিবার পথে সাহায্য করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। নূতন পীড়ায়, রোগীর পথ্যাপথ্যের রীতিমত ব্যবস্থা না থাকিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, তবে নূতন পীড়ায় প্রায়ই স্বভাবতঃই রোগীর আহারাদিতে বড় ইচ্ছা থাকে না,—কাজেই বিধিনিষেধের ব্যবস্থাটী অনেকটা প্রকৃতির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন পীড়ায় তাহা নয়। প্রাচীন পীড়ার রোগী দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রকার রোগ যন্ত্রণার মধ্যে থাকায়, অনেক সময় পথ্যাপথ্যের বিধিনিষেধ আর মানিয়া চলিতে পারে না, এবং বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও বিশেষ কোন স্থায়ী উপকার না পাওয়ায়, সে অনেকটা বীতশ্রদ্ধ ও উদাসীন হইয়া উঠে, এমন কি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাচীন পীড়ার রোগীকে যথেচ্ছাচার হইতেও দেখা যায়। ফলতঃ ইহাতে তাহার অকল্যাণই ঘটে, কিন্তু তবুও সে আর মানিয়া চলিতে ইচ্ছা করে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে চিকিৎসকেরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করি। যে রোগী প্রতি-নিয়ত রোগের যন্ত্রণায় জীবনে হতাশ হইয়াছে, তাহার প্রতি বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করিতে হইলে, একটু করুণহৃদয়ে করিতে হয়। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি, চিকিৎসকের অতিশয় কঠিন আদেশ প্রতিপালন

করিতে গিয়া রোগীর স্বাধীনতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্বে নিজের ইচ্ছায় দুই একটী দ্রব্যের সাহায্যে সে ব্যক্তি সামান্য সামান্য পথ্যাদি উদরস্থ করিতেছিল, এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাহার জীবন আরও ভীষণতর ও প্রায় অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ আদেশের ফল দুই প্রকার, ১মতঃ,—রোগীর পক্ষে অতিশয় কষ্টকর, ২য়তঃ,—অতিশয় কঠিন আদেশ অনেক সময় মানিয়া চলা দুর্ঘট হয় বলিয়া রোগী যথেচ্ছাচার হইয়া উঠে। তবে, কি পথ্যাপথ্যের বিধিনিষেধ অপ্রয়োজনীয় ও নীরর্থক? না, কখনই নয়। চিকিৎসক যখন দেখিবেন যে, রোগীর পক্ষে কোনও একটী খাদ্য অনিষ্টজনক হইবে, তখন তিনি অবশ্যই নিষেধ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা তাহাতে রোগীর কল্যাণই উদ্দেশ্য। ফলতঃ চিকিৎসক অকারণ বা কেবল নিজের খেয়ালের বশে যেন কতকগুলি আদেশ না দেন, ইহাই আমাদের বক্তব্য। অনর্থক বিধি নিষেধে রোগীর স্বাধীনতার হানি হয় এবং সেগুলি মানিয়া চলা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া থাকে। তবে প্রয়োজন বোধ করিলে অবশ্যই তাহা করিতে হইবে, সে বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নাই। আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, চিকিৎসকের বিধিনিষেধ ব্যবস্থার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এমন কি, কেবল মাত্র তাহার খেয়াল অনুসারেই ইহা করিয়া থাকেন। আসল কথা, স্বাধীনতার হানি যতই অল্প করিতে পারা যায়, ততই ভাল। রোগীর কল্যাণমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া ব্যবস্থা করিলেই প্রকৃত ব্যবস্থা করা হয়। দেখা যাউক, এ সম্বন্ধে কোনও নীতি অবলম্বন করিতে পারা যায় কিনা?

তরুণ পীড়ায়, রোগীর স্বভাবতঃই আহারে অনিচ্ছা থাকে, কাজেই বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু প্রাচীন পীড়ায় ততটা সহজ নয়। ফলতঃ রোগী যে যে রোগ লক্ষণে কষ্ট পাইতেছে, যে যে দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহার সেই সেই রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হইবার

আশঙ্কা থাকে, সেই সেই দ্রব্য অবশ্যই নিষেধ করিতে হইবে। যেমন প্রস্রাবে জ্বালা থাকিলে,—লঙ্কার ঝাল, অম্লোদ্গার থাকিলে,—গুরুপাক দ্রব্য, যকৃতে বেদনা থাকিলে,—ঘৃতপক্ক দ্রব্য ইত্যাদি; রোগী নিজেই সেগুলি ত্যাগ করিয়া চলে, এবং চিকিৎসকও সেগুলি নিষেধ করিবেন। আরও একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রাচীন পীড়ার রোগীকে যে ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়, সেই ঔষধের বা সেই শ্রেণীর ঔষধের যাহাতে "হ্রাসবৃদ্ধি" হয়, জানিতে হইবে যে, রোগীরও তাহাতেই "হ্রাসবৃদ্ধি" হইবে,—এজন্য **ঔষধের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে** বিধিনিষেধের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। ল্যাকেসিসের রোগীর অম্লনিষেধ করিতে হয়, আর্সেনিকের রোগীর দুগ্ধ সেবন অবশ্য নিষিদ্ধ, লাইকোপোডিয়ামের রোগীর বৈকালে ভোজন ও অম্ল ভোজন চলে না, এই প্রকার যে যে ঔষধের যে যে সময়ে, যে যে খাদ্যে, যে যে অবস্থায় হ্রাসবৃদ্ধি আছে, সেই সেই ঔষধের রোগীর পক্ষে, সেইরূপ ব্যবস্থাই প্রায় যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কেবল বিলাসের জন্য মদ্যপান, বা এই প্রকারের কোন কার্য্য, যাহা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যহানি করিয়া থাকে, তাহাও নিষেধ করা যাইতে পারে। পরন্তু, নিরর্থক কতকগুলি বিধিনিষেধ কখনই সঙ্গত নয়। আমরা দেখিয়াছি, বিনাকারণে অনেক চিকিৎসক, রোগীর পান খাওয়া, তামাক খাওয়া প্রভৃতি নিষেধ করেন, ইহাতে রোগীর অনর্থক কষ্ট হয় মাত্র। একটী পালসেটিলা রোগীর নিউমোনিয়াতে, গরম গরম পুলটিশ দেওয়া ও তুলা দিয়া বক্ষঃস্থলটী বাঁধিয়া রাখিবার আদেশে, রোগীর প্রাণসংশয় হইতে দেখিয়াছি। আরও একটী ফস্‌ফোরাসের রোগীর স্নান বন্ধ রাখিবার আদেশে, রোগী প্রায় উন্মত্ত হইয়াছিল, আমার মনে আছে। এ সকল কারণে, **রোগীর রোগলক্ষণ এবং ঔষধের হ্রাসবৃদ্ধির** দিকে নজর রাখিয়া রোগীর পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করা বিশেষ সঙ্গত। চিকিৎসককে সর্ব্বদাই নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া-ভূমি।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল এক একটী "**শক্তি**", ইহারা কেহই **স্থূল** পদার্থ বা জড় নহে। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় কতকগুলি ধাতুঘটিত ঔষধও প্রায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় "শক্তি" বিশেষের ন্যায় কার্য্য করে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ঔষধমাত্রই **জড় ও স্থূল**। তাহারা **খাদ্য-স্তরে** কার্য্য করিয়া থাকে। লোকে যে সকল খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া থাকে, সে সকল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে গিয়া, পরিপাক হইয়া, যে ভাবে রস, রক্তাদি ধাতুতে পরিণত হয় ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, অন্যান্য জড়ীয় বা স্থূল জাতীয় ঔষধ সমুদায়ও ঠিক সেই ভাবে, অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্যের ন্যায়, আমাদের শরীরে ক্রিয়া করে, কেহই **শক্তি-স্তরে** কার্য্য করিতে পারে না। কেন পারে না? যেহেতু, তাহারা **স্থূল**। **স্থূল কেবল স্থূলের উপরেই কার্য্য করিতে পারে, সূক্ষ্ম-স্তরে** কার্য্য করিবার তাহার শক্তি নাই।

এ সম্বন্ধে সামান্য গবেষণা করিলেই বোধগম্য হইবে যে, ঔষধ **সূক্ষ্ম** না হইলে পীড়া আরোগ্য করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। পীড়া যে **স্তরে**, তাহাকে আরোগ্য করিবার ঔষধও নিশ্চয়ই **সেই স্তরের** হওয়া আবশ্যক। দেখিতে হইবে, পীড়া কোথায়। **পীড়া সর্ব্বপ্রথম জীবনী-শক্তির স্তরে আবির্ভাব হইয়া সর্ব্বশেষে স্থূল রূপে ও এক একটী নামে দেখা দেয়।** স্থূল রূপটী পীড়া নয়, পীড়ার **ফল** মাত্র, এজন্য স্থূল রূপটী চিকিৎসার বিষয়ীভূত নয়,—পীড়া আরোগ্য হইলে, স্থূল রূপটী, কাজে কাজেই, অপসারিত হইয়া থাকে। পীড়াটী জীবনীশক্তিকে অস্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য করে। যে

জীবনীশক্তি নিজের স্বাভাবিক প্রকৃতির বশে অপ্রতিহতপ্রভাবে এতাবৎকাল কার্য্য করিতেছিল, যাহার ফলে মনুষ্যটী স্বচ্ছন্দভাবে আহার বিহারাদি করিত, সেই জীবনীশক্তি এক্ষণে পীড়াশক্তির অধীনে কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়ায় অস্বাভাবিকভাবে কার্য্য করিতেছে, এবং সেজন্য সেই মনুষ্যই পূর্ব্বেকার স্বচ্ছন্দভাবের পরিবর্ত্তে অস্বচ্ছন্দবোধ করিতেছে। এক্ষণে, আরোগ্যকারী ঔষধ যদি স্থূল হয়, তবে কি প্রকারে সে ঐ পীড়াশক্তির উপর ক্রিয়া করিবে? ঔষধকে **সূক্ষ্ম-স্তরে**, অর্থাৎ **শক্তি স্তরে** আনিতে হইবে, নতুবা পীড়ার উপর তাহার কোনও ক্রিয়া সম্ভব হইবে না। একস্তরে না পৌঁছিলে, কি প্রকারে একটী অন্যটীর উপর কার্য্য করিবে? হোমিওপ্যাথিক ঔষধসকল এক একটী শক্তি, এক একটী স্থূল দ্রব্যকে "শক্তিকৃত" করা হইয়াছে। যে যে দ্রব্য ভেষজ বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যাহারা রোগ আরোগ্য করিতে পারিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাদিগকে ঔষধরূপে প্রস্তুতকরণের প্রথাবিশেষের সাহায্যে বিভিন্ন শক্তিতে আনা হয়। ৩০, ২০০, ১০০০, বা ততোধিক শক্তিতে তুলিলে প্রত্যেক ভেষজ পদার্থটী আর পদার্থ থাকে না, তখন তাহারা এক একটী অতি আশ্চর্য্য প্রকারের আরোগ্যকারিণী "শক্তি"—রূপে পরিণত হয়। এজন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কার্য্য দ্রুত, এত বেগবান, এবং এত মৃদু,—অথচ স্থায়ী। স্থূল দ্রব্য স্থূলের উপর আঘাত করিলে তাহার ক্রিয়া মৃদু হইতে পারে না, এখানে সূক্ষ্মের উপর সূক্ষ্মের ক্রিয়া,—ঔষধশক্তি আমাদের জীবনীশক্তির উপর ক্রিয়া করিয়া জীবনী শক্তির পূর্ব্ব স্বভাব ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করে, কাজেই স্থূলের রাজ্য হইতে বহুদূরে,—ইহাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার স্থান, সেখানে স্থূলের কোনও সম্পর্ক নাই। আবার, কোনও একটী ভেষজপদার্থকে যত উচ্চ শক্তিতে আনা হয়, ইহার রোগ আরোগ্যকারিণী শক্তি ততই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এজন্য ৩০ শক্তি হইতে ২০০ শক্তির, ২০০ শক্তি হইতে ১০০০

শক্তির ক্ষমতা অধিকতর, এবং যতই উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম শক্তিতে আনীন হয়, ইহার ক্রিয়া ততই বেগবতী হইয়া থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে জানা যাইবে যে, ঔষধও সূক্ষ্ম স্তরের এবং রোগও সূক্ষ্ম স্তরের দ্রব্য, এই দুইটাই শক্তি, এজন্য একটী, অন্যটীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে কি স্থূল দ্রব্যের আরোগ্যকারিণী শক্তি আদৌ নাই? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, যেমন আমাদের আহার্য্য পদার্থের ক্রিয়া, স্থূল ভেষজেরও সেইরূপ ক্রিয়া। স্থূল দ্রব্যের সামান্য ভাবে আরোগ্য-কারিণী শক্তি থাকিলেও তাহা দ্রুত নয়, মৃদুও নয় এবং স্থায়ীও নয়। দেখা যায়, অহিফেন, তামাক, প্রভৃতি দ্রব্যের সাহায্যে যে ক্ষণিক স্বচ্ছন্দতা অনুভব হইয়া থাকে, তাহা কখনই স্থায়ী হয় না, ঐ ঐ স্থূল দ্রব্যের ক্রিয়া যতক্ষণ থাকে, কেবল ততক্ষণমাত্র সামান্য স্বচ্ছন্দতা বোধ হয়, আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসে। যে শক্তির দ্বারা মনুষ্যদেহে স্বচ্ছন্দতা বা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব হয়, সে শক্তির উপর কোনও ক্রিয়া প্রকাশ না হওয়ায়, ঐ সকল কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। যে ব্যক্তির নিত্যই অভাব, তাহাকে একদিন সামান্য সাহায্য করিলে, তাহার দুঃখের স্থায়ী প্রতীকার হয় না,—ইহাও ঠিক তদ্রূপ; জীবনী-শক্তির স্বাভাবিক প্রকৃতি ফিরাইয়া না আনিতে পারিলে স্থায়ী প্রতীকার অর্থাৎ নির্ম্মল আরোগ্য আসিতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন পীড়ার রোগীর স্থান পরিবর্ত্তনের ফলাফল।

অন্য মতের চিকিৎসকগণ অনেক সময় রোগীকে স্থান পরিবর্ত্তন বা বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিকগণ যে ঐ উপদেশ না দেন, তাহা নয়, তবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। যাহা হউক, স্থান পরিবর্ত্তনের ফলাফল আলোচনা করিয়া জানিতে হইবে যে, প্রাচীন পীড়ার রোগীদিগকে স্থান পরিবর্ত্তন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া সঙ্গত কিনা, যদি সঙ্গত হয়, তবে কোন্ অবস্থায় সঙ্গত ?

প্রাচীন পীড়ার কারণ—সোরা, সাইকোসিস, এবং সিফিলিস, এই ৩টার একটী বা দুইটা বা তিনটী। ইহাদের দ্বারা, জীবনীশক্তির ও তাহার কার্য্যের উপর, বিশৃঙ্খলা আনীত হয়, ইহা আমরা বেশ জানি। কাজেই প্রাচীন পীড়ার রোগীকে আরোগ্য করিতে হইলে, অন্য একটী **স্বতন্ত্র শক্তির** প্রয়োজন, অর্থাৎ ঔষধ শক্তি ব্যতীত আরোগ্য সম্ভব নয়। এ অবস্থায় অর্থাৎ ঔষধ শক্তির সাহায্যে রোগীর নির্ম্মল আরোগ্য আনয়নের পূর্ব্বে, তাহাকে স্থান পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেওয়া কখনই কল্যাণজনক হইতে পারে না। স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য চলিতে থাকিলে, তাহা স্বতন্ত্র কথা, এবং তাহাতে আরোগ্যের কোনও বাধা হয় না, বরং পরিবর্ত্তিত স্থানটী রোগীবিশেষের পক্ষে অনুকুল হইলে, আরও অধিকতর উপকার হয়,—আশা করা যায়। কিন্তু কেবল স্থান পরিবর্ত্তনের দ্বারা আরোগ্য আশা করা অন্যায় ও অসম্ভব, কেননা সে আশা কখনই সফল হইতে পারে না। সোরা,

সাইকোসিস্ এবং সিফিলিসের দ্বারা আনীত বিশৃঙ্খলাই নানা রোগ বলিয়া পরিচিত, এক্ষণে ঐ বিশৃঙ্খলার ধ্বংস করিতে হইলে, তাহার কারণ বা নিদান ধ্বংশ করিতে হইবে। সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিসের ধ্বংস না করিলে বিশৃঙ্খলা যাইবে না, এবং রোগীও আরোগ্য হইবে না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বায়ু পরিবর্ত্তনের দ্বারা রোগীর কতদূর ফল আশা করা যাইতে পারে। যদি দেখা যায় যে, কোনও একটী রোগীর পক্ষে সমুদ্রকুলই উপযোগী স্থান, কেননা সেখানকার জলবায়ুর ক্রিয়ায় রোগীর অনেকটা সাহায্য হইতে পারে, তবে ঐ রোগীকে সেই স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা, অথবা নির্ম্মল আরোগ্য হইবার পর সেই স্থানে ঐ রোগীকে রাখিতে পারিলে, অতি শীঘ্রই রোগা পূর্ব্বস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। নতুবা, একটু দেরীতে পূর্ব্বাবস্থা আসিবে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু রোগ আরোগ্য কার্য্যটী **ঔষধ শক্তি সাহায্যে** করিতেই হইবে,—বায়ু পরিবর্ত্তনের দ্বারা সেই কার্য্য হইতে পারে না। রোগীবিশেষের জন্য উপরোক্ত উদ্দেশ্যে, স্থানবিশেষ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যেহেতু, কোনও একটী স্থান, সকল প্রকার প্রাচীন পীড়ার রোগীর জন্য উপযোগী হইতে পারে না। অতএব, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তাহার প্রাচীন পীড়ার রোগীকে আরোগ্য করিবার পূর্ব্বে, স্থান পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে চিকিৎসার কোনও বাধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন; অথবা নির্ম্মলভাবে আরোগ্য হইবার পর, শীঘ্র শীঘ্র পূর্ব্বকার বল ফিরিয়া পাইবার উদ্দেশ্যে, তাহাকে তাহার পক্ষে অনুকুল স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন। নতুবা, **কেবল স্থান পরিবর্ত্তনের** দ্বারা কোনও কল্যাণ আশা করা অসঙ্গত,—একথা যেন রোগীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

অন্যমতের চিচিৎসকগণ রোগীকে "রোগী" ভাবে চিন্তা করেন না,

এজন্য তাঁহারা কেবলই স্থান পরিবর্ত্তনের দ্বারা আরোগ্য আশা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের ন্যায় মত পোষণ করিতে পারি না, কেননা আমরা "রোগী" চিকিৎসা করিয়া থাকি, এবং "রোগী" অর্থে আমরা কেবলমাত্র রোগসমষ্টি বুঝি না। কাজেই আমাদের উপদেশ স্বতন্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সোরা, সাইকোসিস্ সিফিলিস্ এবং ত্রিদোষের তথ্য সকলের সন্ধান ও পরিচয়।

প্রাচীন পীড়ার **কারণরূপ দোষ সমুহের** তথ্যানুসন্ধান করিবার উপায় কি? সোরা, সাইকোসিস্ প্রভৃতির সহিত উত্তমরূপে পরিচিত না হইতে পারিলে, তাহাদের চিকিৎসায় ফল লাভ করা অতিশয় দুরূহ। প্রত্যেকের লক্ষণাবলি ও প্রকৃতির সহিত পরিচয় পাইতে হইলে, একটী উপায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে। মনে করুন, কলেরা অর্থাৎ ওলাউঠা কি প্রকার পীড়া, তাহার কি কি লক্ষণ, ইত্যাদি জানিতে হইলে, অনেকগুলি ওলাউঠা-পীড়িত রোগীকে দেখিলে কতকগুলি **সাধারণ** লক্ষণের সহিত পরিচয় হয়। ওলাউঠার **সাধারণ লক্ষণ** —ভেদ, বমি, হিমাঙ্গতা ইত্যাদি,—এবং সাধারণ লক্ষণগুলির জ্ঞান হইলে, ঐ পীড়ার বিষয় একটী **সাধারণ** জ্ঞান জন্মে। তখন ওলাউঠা পীড়া বলিলেই কতকগুলি লক্ষণসমষ্টি আপনার মনে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অনেকগুলি বসন্তরোগী দেখিলে, বসন্ত রোগের **সাধারণ** লক্ষণগুলির সহিত পরিচয় হয় এবং বসন্ত রোগ বলিলেই কতকগুলি লক্ষণসমষ্টি আপনার মনে আসে। এই প্রকারে **তরুণ** পীড়ার জ্ঞান হইয়া থাকে। কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের একত্র সমাবেশ হইলেই তাহাদের সমষ্টিগত একটী নাম দেওয়া হইয়া থাকে,--এবং যখনই সেই নাম মনে আসে, তখনই ঐ ঐ লক্ষণসমষ্টি মনের মধ্যে উদয় হইয়া থাকে। যখনই এই প্রকার কোনও পীড়ার **সাধারণ** লক্ষণ সকল বিশেষরূপে পরিচিত থাকে, তখন ঐ পীড়ায় পীড়িত রোগীর চিকিৎসা করা সহজ হইয়া উঠে। কেননা রোগের

সাধারণ লক্ষণ সকলত জানাই আছে, এক্ষণে ঐ পীড়িত ব্যক্তির **বিশেষ** বা **ব্যক্তিগত** লক্ষণ, জানিতে পারিলেই রোগীর জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারা যাইবে। কোনও ব্যক্তিবিশেষের কলেরা দেখিতে গিয়া যদি দেখা যায় যে, কলেরার সাধারণ লক্ষণগুলি সকলই উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু **বিশেষ** বা **ব্যক্তিগত** লক্ষণের মধ্যে—ঘর্ম্মের **প্রচুরতা**, ভেদ ও বমির **প্রচুরতা**, এমন কি পিপাসারও **প্রচুরতা** অর্থাৎ অনেকখানি করিয়া জল পান করিবার পিপাসা বর্ত্তমান রহিয়াছে; তখন ভিরেট্রাম এল্‌বাম্ নামক ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং প্রত্যেক পীড়ার সাধারণ লক্ষণগুলি জানিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়। তখন মেটিরিয়া মেডিকা হইতে যে যে ঔষধের মধ্যে ঐ ঐ সাধারণ লক্ষণগুলি রহিয়াছে, সেই সেই ঔষধের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই আর ঐ পীড়া চিকিৎসায় কোনও অসুবিধা থাকে না।

উপরে তরুণ পীড়ার বিষয় যাহা লিখিত হইল, **প্রাচীন পীড়ার** সহিতও ঠিক সেই ভাবেই পরিচিত হইতে হয়। তবে তরুণ পীড়ার ক্ষেত্রে কোনও একটী পীড়ার অনেকগুলি রোগী দেখিয়া তবে ঐ পীড়ার সাধারণ লক্ষণগুলি স্থির করিতে হয়। প্রাচীন পীড়ায়, তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি এণ্টিসোরিক ঔষধ, কতকগুলি এণ্টিসাইকোটিক ঔষধ ও কতকগুলি এণ্টিসিফিলিটিক ঔষধের লক্ষণগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া, এণ্টিসোরিক ঔষধ সকলের মধ্য হইতে সোরার **সাধারণ** লক্ষণ, এণ্টিসাইকোটিক ঔষধ সকলের মধ্যে হইতে সাইকোসিসের **সাধারণ** লক্ষণ, এবং এণ্টিসিফিলিটিক ঔষধ সকলের মধ্য হইতে সিফিলিসের **সাধারণ** লক্ষণগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে হয়। যখন দীর্ঘকাল এই প্রকার অধ্যয়ন দ্বারা সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ দোষ সমূহের **সাধারণ** লক্ষণগুলি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়, তখন প্রাচীন পীড়া

চিকিৎসা করা অতীব আনন্দজনক কার্য্য হইয়া উঠে, কেননা তখন **কেবল ব্যক্তিগত বিশেষত্বটী** জানিতে পারিলেই প্রাচীন পীড়ার কোনও রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করা অতিশয় সহজ হইয়া উঠে। প্রথমে সামান্য পরিশ্রম করিয়া লইলেই আর কোনও অসুবিধা থাকে না। আমি এই পুস্তকের ৪র্থ ভাগে সোরা, সাইকোসিস্ প্রভৃতি দোষের লক্ষণ ও প্রকৃতি সকল বিস্তারিত ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহা হইতে ঐ ঐ দোষের বিষয় সম্যকরূপে জ্ঞান লাভ হইবে।

এক্ষণে এন্টিসোরিক, এন্টিসাইকোটিক প্রভৃতি ঔষধগুলির এক একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলে অনেক সুবিধা হইবে মনে করিয়া নিম্নে সেগুলি সন্নিবেশিত হইল। তালিকা হইতে জানা যাইবে যে, কোনও ঔষধ, কেবল একটী মাত্র দোষঘ্ন, আবার কেহ বা, দুইটী দোষের বিরোধী, আবার কেহবা তিনটী দোষকেই নষ্ট করিতে সমর্থ। একটী মাত্র কথা এখানে লেখা আবশ্যক যে, সকল এন্টিসোরিক, অথবা সকল এন্টিসাইকোটিক বা সকল এন্টিসিফিলিটিক, সমান কার্য্যকরী নয়, অর্থাৎ সকলে সমান গভীরভাবে কার্য্য করিতে পারে না। যেগুলি অতি গভীরভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম, সেগুলির পশ্চাতে একটী করিয়া * চিহ্ন দেওয়া গেল। সর্ব্বাপেক্ষা গভীরভাবে ক্রিয়াবান ঔষধ সকল ** দ্বারা চিহ্নিত হইল।

এন্টিসোরিকঃ—এব্রোটেনাম, এসেটিক্ এসিড, এগারিকাস মাস্ক, এলো, *এলুমিনা, এম্‌বা গ্রিসিয়া, এমন্ কার্ব্ব, *এনাকার্ডিয়াম্, এন্টিম্ ক্রুড্, *এপিস, আর্জ্জেণ্টাম্ মেটা, আর্জ্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্, **আর্সেনিকাম্ এলবাম, **আর্সেনিকাম্ আইওডেটাম, *অরাম্ মেটা, *অরাম্ মিউরিয়েটিকাম্. *ব্যারাইটা কার্ব্ব, বেলেডোনা, বেঞ্জোইক্ এসিড, বের্ব্বেরিস্, বোরেক্স, *বিউফো রানা, *ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, *ক্যালকেরিয়া আর্স, *ক্যালকেরিয়া ফস্, কার্ব্বো এনিমেলিস *কার্ব্বো

ভেজিটেবিলস্ *ক্যাপ্‌সিকম্, সিস্‌টাস্ ক্যানেডেন্‌সিস্, ক্লিমেটিস, কোক্কাস কেক্‌টি, *কোনায়াম্, *ক্রোটেলাস্, ক্রোটোন্ টিগ্, কিউপ্রাম্ মেটা, ডিজিটেলিস, ডালকেমারা, ফেরাম্ মেটা, ফেরাম্ ফস্, *ফ্লুয়োরিক্ এসিড্, *গ্রাফাইটিস্, **হিপার সালফ, **আইওডিন্, *কেলি বাই-ক্রোমিকাম্, *কেলি কার্ব্ব, *কেলি আইওডাইড্, কেলি ফস্, কেলি সল্ফ্, *ল্যাক্ কেনিনাম্, **ল্যাকেসিস্, লিডাম্, *লাইকোপোডিয়াম্, ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব, ম্যাগনেসিয়া মিউর, ম্যাঙ্গেনাম্, মেজেরিয়াম্, মিউরিয়েটিক্ এসিড, *নেট্রাম্ আর্স, *নেট্রাম্ কার্ব্ব, **নেট্রাম্ মিউর, *নেট্রাম্ সালফ্, *নাইট্রিক এসিড্, পিট্রোলিয়াম্, *ফস্‌ফোরাস্, ফস্‌ফরিক এসিড্, প্ল্যাটিনাম, প্লাম্বাম্, **সোরিনাম্, *পাইরোজেন্, সার্সাপেরিলা, সিকেলি, *সিলিনিয়াম্, **সিপিয়া, **সাইলিসিয়া, ষ্ট্যানাম্, *ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, **সালফার, সালফিউরিক্ এসিড, *ট্যারেন্টিউলা, থেরিডন্, **টিউবারকুলিনাম্, *জিঙ্ক।

এণ্টিসাইকোটিকঃ—আর্জ্জেণ্টাম্ মেটা, আর্জ্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্, **আর্সেনিকাম্ এল্‌বাম্, **আর্সেনিকাম্ আইওডেটাম্, বেঞ্জোইক্ এসিড, বের্ব্বেরিস, *ক্যালকেরিয়া আস, কষ্টিকাম্, ক্লিমেটিস্, কল্‌চিকাম্, ডাল্‌কেমারা, ফ্লুওরিক্ এসিড, **আইওডিন্, *কেলি বাইক্রো, *কেলি কার্ব্ব, *কেলি আইওড, *লাইকো-পোডিয়াম্, ম্যাগ্‌নেসিয়া কার্ব্ব, ম্যাগ্‌নেসিয়া মিউর, ম্যাগ্‌নেসিয়া ফস্, **মেজেরিয়াম্, মিউরিএটিক এসিড, *নেট্রাম্ আর্স, *নেট্রাম্ কার্ব্ব, **নেট্রাম্ মিউর, *নেট্রাম্ সাল্‌ফ্, *নাইট্রিক এসিড, *ফস্‌ফোরাস্, ফস্‌ফোরিক এসিড, **সোরিনাম্, **পাইরোজেন্, সার্সাপেরিলা, **সিপিয়া, **সাইলিসিয়া, ষ্টেফিসেগ্রিয়া, থূজা, **টিউবারকুলিনাম্।

এণ্টিসিফিলিটিকঃ—আর্সেনিকাম এল্‌বাম্, আর্সেনিকাম্ আইওডেটাম্, *অরাম্ মেটা, *অরাম্ মিউরিয়েটিকাম্, *ক্যালকেরিয়া

আস, ফ্লু ওরিক এসিড, **হিপার সালফার, *কেলি বাইক্রোমিকাম্, *কেলি কার্ব্ব, *কেলি আইওডেটাম, **ল্যাকেসিস্, *লাইকোপোডিয়াম্, *মার্কুরিয়াস্, *নাইট্রিক এসিড, ফাইটোলাকা, সার্সাপেরিলা, *ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, *সিফিলিনাম্ **টিউবারকুলিনাম।

এই তালিকার বহির্ভূত ঔষধ সকল তরুণ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং প্রাচীন পীড়া হঠাৎ বাড়িয়া গেলেও কখনও কখনও তাহাদের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কোনও কোনও ঔষধ কেবল ১ম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত, কেহ বা ১ম ও ২য় বা ৩য় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, আবার কেহ বা তিনি শ্রেণীরই মধ্যে রহিয়াছে।

এই তালিকার অন্তর্গত ঔষধ সকল সর্ব্বদাই প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় প্রয়োজন হইয়া থাকে। চিকিৎসাকালে এক ঔষধের পর লক্ষণানুসারে অন্য যে কোনও ঔষধ প্রয়োজন হইতে পারে, ফলতঃ এজন্য কোন্ ঔষধের পর কোন্ ঔষধ কার্য্যকরী, ইহার নির্ণয় করিয়া রাখা ও তদনুসারে কার্য্য করা আদৌ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেক স্থলেই প্রাচীন পীড়ার রোগীতে আবির্ভূত লক্ষণসমষ্টি অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই থাকা উচিত। একটী ঔষধের পর অন্য যে কোনও ঔষধ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্ব হইতে সে বিষয়ের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলে চিকিৎসকদিগের ঔষধ ব্যবহারকালে সন্দেহ ও অসুবিধা জন্মিতে পারে, এজন্য তাহা দেওয়া হইল না।

প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা

৪র্থ ভাগ—পুরাতন পীড়াদোষ সকলের নিদর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সোরা

কোনও প্রাচীন পীড়ায় রোগীদেহে **কোন্ কোন্ দোষ** বর্ত্তমান আছে, তাহা জানিবাব উপায় আছে কি না?—রোগীর লক্ষণ সমষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া বিশেষ গবেষণা করিয়া দেখিতে হয়। তাহা না দেখিয়া, ভাসা ভাসা লক্ষণের উপরে ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। মনে করুন, একটী পুরাতন পীড়ার রোগীর কোমরে অতিশয় বেদনা, উপবেশনের পর প্রথম চলিতে আরম্ভ করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেদনা হয়, স্থির থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া, তাহার নিম্নাঙ্গ প্রায় সর্ব্বদাই বেদনা-যুক্ত, ইত্যাদি লক্ষণ পাইয়া যদি আপনি, অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত রাস টক্স দেন, তবে প্রথম ২।১ ব'র সামান্য উপকার হইলেও রোগীর **স্থায়ীফল** কখনই হইবে না; এস্থলে, আপনাকে জানিতে হইবে যে, **পুরাতন পীড়া দোষ,** যথা—সোরা, সাইকোসিস বা সিফিলিসের মধ্যে, হয়ত সোরা, অথবা আরও কেহ, বা হয়ত তিনটীই রোগীদেহে অবস্থান করিতেছে, নতুবা স্থায়ী ভাবে মানবদেহ পীড়িত হইতে পারে না। এক্ষণে, কোন্টী বা কোন্ কোন্টী আছে? কিরূপেই বা

জানিবেন? জানিবার একমাত্র উপায় **লক্ষণ** এবং **তাহার প্রকৃতি**। যে যে দোষ মানবদেহে বর্ত্তমান থাকে, তাহারা লক্ষণের দ্বারা নিজ নিজ প্রকৃতি বিকাশ করে, ও **সেই সকল লক্ষণ হইতে** জানিতে পারা যায় যে, কোন্ দোষ, বা কোন্ কোন্ দোষ ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। লক্ষণ সকলের দ্বারা সে কথা বুঝিতে পারিলে চিকিৎসার যে কত সুবিধা হয়, তাহা বলা যায় না। দোষ সকলের মধ্যে, সোরা দোষই অতি পুরাতন, এবং এরূপ মানবদেহ আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না,—যাহা এই দোষে দুষ্ট নয়। বরং একথাও বলা চলে যে, কেবল সোরাদোষে দুষ্ট দেহ, অর্থাৎ সোরা ব্যতীত অন্য কোনও দোষ না থাকা, আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না। বেশীর ভাগ লোকই সোরা ও আরও অন্ততঃ একটী দোষযুক্ত আছেই। কচিৎ, **নির্দ্দোষ** অথবা **কেবল সোরাদুষ্ট** লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস ব্যতিরেকে, আজকাল **টীকা ও ইঞ্জেক্সনের** জন্য মানবশরীর যে কি অদ্ভুদ্‌ভাবে দুষ্ট ও ক্লিষ্ট হইতেছে, তাহা অনুমান করিলেও আতঙ্কে প্রাণ শিহরিয়া উঠে! যদি একের অধিক দোষে দুষ্ট অবস্থাকে নিরাময় করিতে হয়, তবে আগেই তাহাদের **গ্রন্থি বা সংমিশ্রণ খুলিতে না পারিলে** চিকিৎসাই হয় না! কিন্তু টীকা ও ইন্‌জেক্‌সনের জন্য শরীরে যে সকল দোষ সঞ্চয় হয়, তাহাদের গ্রন্থি খোলা অতি ভয়ানক ব্যাপার! যাহা হউক, আগে সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিসের বিষয় আলোচনা করিয়া অবশেষে অন্যান্য দোষ সংমিশ্রণের বিষয় লেখাই কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ লক্ষণ, কি প্রকার প্রকৃতি, কি প্রকার গতি, ইত্যাদি নিদর্শন পাইলে দোষ সকলের প্রত্যেককে চিনিতে পারা যায়?—সর্ব্বাদৌ তাহারই পরিচয় প্রয়োজনীয়।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি মোটামুটী সোরাদোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

(১) ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের ক্রিমির দোষ, তাহাদের অন্ত্রে ক্রিমি জন্মে, এজন্য তাহাদের অনেক প্রকার কষ্ট ও যাতনা হয়, গুহ্যদ্বার অতিশয় চুলকায়—সুরসুর্ করে। সেজন্য তাহারা অত্যন্ত কান্দে, মেজাজ বড়ই খারাপ হয়।

(২) অস্বাভাবিক প্রকারের ক্ষুধা, অর্থাৎ হয়ত "রাক্ষুসে" ক্ষুধা অথবা একেবারে ক্ষুধাহীনতা।

(৩) বিনা কারণে মানসিক চাঞ্চল্য, বিষণ্ণতা, উৎসাহহীনতা, উদাসীনতা, অসাধারণ উদ্বেগ, ভয়।

(৪) মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা ও চক্ষুদ্বয়ের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের একান্ত অভাব। মুখমণ্ডলের লাবণ্যহীনতা।

(৫) বালক বালিকা, কিশোর কিশোরীর ও যুবক যুবতীর নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মধ্যে মধ্যে এই রক্তস্রাব হইবার প্রবণতা।

(৬) ঘর্ম্মের একান্ত অস্বাভাবিকতা, যথা, কাহারও বা কপালে, কাহারও বা হাতে পায়ে, কাহারও বা সমগ্র মুখমণ্ডলে, কাহারও বা গুহ্যপ্রদেশে,—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, অথবা ঐ ঐ স্থানেই ঘর্ম্মোদ্গম, আংশিক ঘর্ম্ম, একেবারে ঘর্ম্মের অভাব, ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ, ইত্যাদি অস্বাভাবিকতা।

(৭) অতি সামান্য কারণে এবং হঠাৎ অথবা বিনা কারণে সর্দ্দিলাগা ; অথবা অতিরিক্ত ঠাণ্ডালাগা সত্ত্বেও সর্দ্দি না লাগা, অথবা অন্য পীড়া আক্রমণ করে কিন্তু সর্দ্দি হয় না।

(৮) সামান্য কারণে নাসিকাটী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়, এজন্য মুখ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে বাধ্য হয়।

(৯) নাসারন্ধ্রে প্রায়ই ছোট, বড়, লম্বা পিঁচুটী জন্মে এবং সর্ব্বদাই অঙ্গুলির দ্বারা সেগুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবার প্রবৃত্তি।

(১০) সামান্য পরিশ্রমে অত্যাধিক ক্লান্তি, অথবা সামান্য কারণে অনেক দিন ধরিয়া ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; অথবা সামান্য কারণে শরীরের কোনও স্থানের মাংসপেশীতে, অস্থিতে, স্নায়ুতে অতিরিক্ত আঘাত বোধ এবং তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

(১১) এক দিকে শিরঃপীড়া,—অতি সামান্য কারণে এবং মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। মাথায় নানা প্রকারের কষ্ট, যাতনা ও নানা প্রকারের অনুভূতি।

(১২) প্রায় বিনা কারণে বা অতি সামান্য কারণে, মধ্যে মধ্যে দন্ত পাটীতে বা তাহার অংশে যাতনা, শোথ ও রক্তস্রাব।

(১৩) মধ্যে মধ্যে মাথার চুল উঠিয়া যায় ও অধিক বয়স হইতে না হইতে, কেশ সকল বিবর্ণ হয় ও পাকে। চুলের মধ্যে মরা মাংস, দাদ, চুলকানি, ইত্যাদি হইবার প্রবণতা।

(১৪) মধ্যে মধ্যে সামান্য আঘাতে বা বিনা কারণে বিসর্প রোগ, অর্থাৎ স্থান বিশেষে শোথ হইয়া অতিশয় যন্ত্রণার সঙ্গে শোথটী ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে এবং ক্রমে জ্বর ও পচনাদি উপসর্গ আনয়ন করিবার প্রবণতা। এইরূপে শরীরের স্থানবিশেষে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।

(১৫) সময়ে সময়ে মনে হয় যে, যেন শরীরের সমস্ত রক্তস্রোত ঊর্দ্ধদিকে প্রবাহিত হইতে থাকিল এবং তৎসঙ্গে যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া উঠে, এজন্য অত্যন্ত অস্থিরতা ও মানসিক উদ্বেগ হয়, এবং পরিশেষে কপালে ও মুখমণ্ডলে স্বল্পমাত্র ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া সে অবস্থাটী অপনীত হয়। মধ্যে মধ্যে এই প্রকার অনুভব হইবার প্রবণতা।

(১৬) স্ত্রীলোকদিগের মাসিক ঋতুর যাবতীয় বিপর্য্যয়, যথা, অল্পতা,

আধিক্য, রক্তের বিবর্ণতা, গন্ধের তারতম্য, নানা প্রকার কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি, ইত্যাতি।

(১৭) নিদ্রার একান্ত অভাব, নানা অস্বাভাবিকতা, খণ্ড খণ্ড নিদ্রা, নিদ্রার মধ্যে চম্‌কিয়া উঠা, নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন, স্বপ্নে ভীত হওয়া, নিদ্রার মধ্যে অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, মল, মূত্র, ইত্যাদির নিঃসরণ, চিৎকার করিয়া উঠা, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও তজ্জন্য বিকট শব্দ, জিহ্বাতে "চাকুম্ চাকুম" করা, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার মত ভাব, অতিরিক্ত নাসিকাধ্বনি, সর্ব্বদাই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, অত্যন্ত অস্থিরতা, লালাস্রাব, রক্তস্রাব, বিকট হাস্য করিয়া উঠা, ইত্যাদি। অতিরিক্ত নিদ্রালুতাও সোরাদোষজ।

(১৮) জিহ্বাতে নানা বর্ণের লেপ, মুখে দুর্গন্ধ, দন্তে অতিরিক্ত ময়লা জামা, অতিশয় লালাস্রাব।

(১৯) প্রাতঃকালে বমন বা বমনের ইচ্ছা, বিনা কারণে মুখে জল উঠা বা জিহ্বার একান্ত শুষ্কতা, মুখে নানা প্রকারের স্বাদবোধ, যথা তিক্ত, লবণাক্ত, অম্লময় ইত্যাদি।

(২০) দ্রব্যবিশেষে অতিরিক্ত প্রিয়তা, অথবা একান্ত অপ্রিয়তা যথা, দুগ্ধে অতিশয় প্রিয়তা অথবা দুগ্ধপানে একেবারে অনিচ্ছা।

(২১) অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ বা মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ এবং মধ্যে মধ্যে তরল মলত্যাগ, বিনা কারণ অথবা স্বল্প কারণে উদরাময়।

(২২) পেটের মধ্যে নানা প্রকারের যাতনাবোধ, যাহা,—দ্রব্য বিশেষ আহারে ও সময়বিশেষে হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

(২৩) মলদ্বারের মধ্যে নানা প্রকারের অনুভূতি, যাতনা, বেদনা, মলের সহিত রক্ত বা রসের স্রাব, এবং অর্শোবলির আবির্ভাব।

(২৪) ঋতু বিশেষে পায়ে ও অঙ্গুলির মধ্যদেশ হাজিয়া যাওয়া।

(২৫) পায়ের অঙ্গুলিতে "কড়া" হওয়া, এবং ঐ সকল কড়াতে মধ্যে মধ্যে যাতনা ও টাটানি ব্যথা।

(২৬) আহারের সময়, চলাফেরার সময়, বসিয়া উঠিবার সময় বা পরিশ্রমের পর বসিবার সময়, শরীরের নানা স্থানে শব্দ ("খটাস্ খটাস্") হওয়া, চলিবার সময় প্রতি পাদক্ষেপে পায়ের হাড়ে ঐ প্রকার শব্দ হওয়া।

(২৭) শরীরের নানাস্থানে যাতনা ও বেদনা সকলের, ঋতু বিশেষে, শীতাতপবর্ষাদিঋতু ভেদে, শয়ন, উপবেশন এবং সঞ্চালনবিশেষে হ্রাসবৃদ্ধি।

(২৮) শরীরের নানা স্থানে ফোড়া, চুলকানি ইত্যাদি হইবার স্বভাব। খোস, চুলকানি, দাদ, অথবা ঋতু বিশেষে হাত, পা ও গাল ইত্যাদি স্থান ফাটিয়া যাওয়া।

(২৯) মেজাজ অতিশয় চটা, রুক্ষ ও কর্কশ, হৃদয়ে কাহারও প্রতি ভালবাসার একান্ত অভাব, অথবা অন্যের অনিষ্ট করিবার প্রবল ইচ্ছা।

(৩০) স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অতিরিক্ত আসঙ্গ পিপাসা।

উপরে সোরাদোষের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইল, সেগুলি **সুপ্ত সোরার** লক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ যখন এগুলি মানবদেহে অবস্থিতি করে, তখন, সোরা যেন লুক্কাইত অবস্থায় থাকে, এবং লোকে মনে করে যে তাহারা অতি সুস্থ, তবে যে তাহাদের দেহে ঐ প্রকার কোনও কোনও লক্ষণ আছে, তাহা তাহারা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করে এবং এরূপ অল্পবিস্তর সকল লোকেরই থাকেই থাকে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। কিন্তু তাহারা এটী আদৌ মনে করে না যে, একদিন অতি সামান্য কারণে সোরা **উত্তেজিত** হইয়া উঠিবে এবং নানা রোগলক্ষণের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। কোথাও কিছুই নাই, একদিন সামান্য শীতল পূর্ব্ববায়ু লাগিয়া হয়ত একটু মাত্র সর্দ্দিবোধ হইল, সেই সর্দ্দি উপলক্ষ করিয়া হস্তে পদে বেদনা, জ্বরভাব ইত্যাদি ক্রমে

আসিয়া উপস্থিত হইল," কি: জানি কেন, কাশিতে কাশিতে একটু রক্ত দেখা দিল, এবং এই অবস্থা হইতেই রোগলক্ষণ সকল ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া শেষে হয়ত নিদারুণ যক্ষ্মা রোগে পরিণত হইতে পারে। সোরা দোষ হইতে সকল প্রকার পীড়াই হইতে পারে। কেবল পীড়ার সময় ব্যতীত অপর সময় সোরা যেন "**নিদ্রিত**" থাকে,—তখন সোরা আছে কি নাই, তাহা বড় একটা অনুভব হয় না।

মানবদেহে সোরার **বিকশিত** লক্ষণ সকল লিখিয়া শেষ করা প্রায় অসম্ভব। যে সকল মানবের, নানা রূপের ও নামের যাতনা, বেদনা ইত্যাদি দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটীর কারণ একমাত্র সোরা। এমন কতকগুলি রোগ লক্ষণ আছে, সেগুলি সাইকো-সিস্ ও সিফিলিস্ হইতে উদ্ভূত হয়, কিন্তু সোরা দোষ না থাকিলে যখন অন্য কোনও দোষ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না, তখন **প্রকৃত কারণ**,—সোরা, একথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। সাইকোসিস্ ও সিফিলিস কেবল নিজের নিজের প্রকৃতি যোগ দিয়া জটীলতা আনয়ন করিতে থাকে, কিন্তু সোরা সে সকল পীড়ারই **ভিত্তিভূমি ও একমাত্র মূল কারণ**, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

জটিলতার কারণ অনেকগুলি—(১) সোরার সহিত অন্য দোষের যোগ, (২) এলোপ্যাথিক ও অন্যান্যবিধ দমনকারী কুচিকিৎসা, (৩) টীকা ইন্‌জেক্‌সনাদি নব নব প্রণালীর উদ্ভব, এবং (৪) কুলানুক্রমে **প্রাপ্ত** দোষ সকলের গ্রন্থি ও দোষের সহিত মানবের নিজ জীবনে **অর্জ্জিত** দোষের নিগূঢ় বন্ধন, এই গুলি হইতেই জটীলতা আসিয়া থাকে। যে প্রকার বিভৎস চিকিৎসাবিধান প্রকৃত চিকিৎসা বলিয়া চলিতেছে, ইহার ফলে মনুষ্যকে ক্রমেই অল্পায়ু, হীনবীর্য্য ও অকালবৃদ্ধ করিতে থাকিবে। নানা নামের নানা পীড়ার উদ্ভব ত এখনই হইয়েছে, বহুদিন হইতেই হইতেছে, আরও যে কত হইবে, তাহার

সংখ্যা করা অসম্ভব। দেখিয়া শুনিয়াও লোকের চৈতন্য হয় না। দৈবশক্তিসম্পন্ন হ্যানিম্যান সত্যই কহিয়াছেন,—"মানবদেহের স্বাভাবিক রোগ, অর্থাৎ প্রকৃতিক নিয়মলঙ্ঘণ জনিত পীড়াসকল অল্পায়াসেই আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু কুচিকিৎসার ফলে যে সকল রোগ সৃষ্টি হইতেছে ও জটীলতা আনীত হইতেছে, তাহাদের চিকিৎসা নাই, কহিলেও চলে।" অতি সত্য কথা। যদিও উচ্চ, উচ্চতর ঔষধশক্তির ক্রিয়ার দ্বারা আমরা এক্ষণে রোগের জটীলতা ও দোষ সকলের গ্রন্থি খুলিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু ক্রমেই দিন দিন যেরূপ চিকিৎসার নামে বর্ব্বরতা প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে আশা অতি অল্প। জটীলতা আনয়ন করিবার আরও একটী ক্ষেত্র আছে, তাহাকে উপরোক্ত কারণগুলির সহিত গণনা করা যায় নাই, কেননা তাহা **বিলাসজ**, অর্থাৎ মানুষ বিলাসী হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বনের ফলে প্রাকৃতিক যে সকল নিয়ম আছে, তাহাদের প্রতিরোধ করিতেছে, প্রকৃতিও সেজন্য প্রতিশোধ লইতেছেন। স্ত্রীলোকের মাতৃত্বটীকে নষ্ট করিবার জন্য দেশের লোকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, কেহ বা স্ত্রীলোকের ডিম্বধারগুলিকে সজোরে উৎপাটন করিয়া ফেলিতেছেন, কেহ বা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া যাহাতে সন্তান না জন্মিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছেন, সে সকল কথা লিখিয়া আর লেখনী কলুষিত করিতে ইচ্ছা নাই। স্ত্রীপুরুষের সংযমের পথ অবলম্বন করিলেই ঐহিক পারত্রিক সকল দিকেই কল্যাণ হইতে পারে, তাহা না করিয়া স্বভাবের চিরন্তন ও মহৎ কল্যাণ স্রোতঃগুলি বন্ধ করিতেই হইবে, প্রকৃতিও কাজে কাজেই নানা ব্যাধি আনিয়া এই সকল অবাধ্য সন্তানকে উৎসন্ন দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। বানরের গ্ল্যাণ্ড গুলি পরিয়া বৃদ্ধ অবশ্য যুবক হইতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্যযুবক হইল কি বানরযুবক হইল, তাহার

সন্ধান কে রাখে? যাহা হউক, এই প্রকার বিলাসের ফলে কতকগুলি রোগলক্ষণ আসিতেছে, **তাহাদের প্রতিকার নাই।**

সোরাকে চিনিতে হইলেই, মানবদেহের একেবারে একান্ত অভ্যন্তর হইতে বাহির পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখিতে হয়। সোরা মানবের **মনকে** আগেই পঙ্কিল করে। মানবের মানবত্ব কি লইয়া? বিশুদ্ধ মন লইয়াই মানবের মানবত্ব। মনটী নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ না হইলে, তাহার ইচ্ছা অর্থাৎ বাসনা ও কার্য্য কখনই মনুষ্যোচিত হইতে পারে না। আমাদের এবং অন্যান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে কেবল মনটীকে বিশুদ্ধ করিবার প্রথাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে "সাধন" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতএব নির্ম্মল মনই মনুষ্যের উন্নতির বিশেষ লক্ষণ। এই মন, যাহা নির্ম্মল থাকিলেই মানব মানবনামের যোগ্য হয়, সেই মনকেই সোরা এরূপ ভাবে দূষিত করে যে, ক্ষেত্র বিশেষে তাহাকে পশুতুল্য বা তদপেক্ষাও অধমতর করিয়া তোলে। সোরার মন কি প্রকারে চেনা যায়? সোরাদুষ্ট মনের বিশেষত্ব—**চাঞ্চল্য**; সে কখনও সন্তুষ্ট নয়, কোনও অবস্থাই সোরাদুষ্ট মনের নিকট শান্তিপ্রদ বলিয়া পছন্দ হয় না। এই চাঞ্চল্য,—তাহার চিন্তায়, কার্য্যে ও আচরণে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সে সর্ব্বদাই নিজের অবস্থা অন্যের অপেক্ষা মন্দতর বলিয়া মনে করে, এবং নানাপ্রকার সুখের আশায় সদাসর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া উঠে। নিজ ধর্ম্মপত্নীতে তাহার সন্তোষ জন্মে না, এজন্য সে অনেক সময় গনোরিয়া ও উপদংশের কবলে পড়িয়া নিজের অবস্থা অতীব শোচনীয় করিয়া ফেলে। সোরা আক্রমণ করিলেই সুস্থির চিন্তা একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়া যায়। অবশ্য, তাহার ঐ চঞ্চলতা, ব্যাকুলতা এবং নানাপ্রকার সুখের সামগ্রী অন্বেষণ করিবার চিন্তায় ব্যস্ততা প্রযুক্ত, তাহার বুদ্ধিবৃত্তিটী অনেক সময় অতি তীক্ষ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের বা জগতের কোনও কল্যাণ সাধন হয় না, যেহেতু বুদ্ধি যখন নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ

মনের অধীনে কার্য্য করিতে পারে, তখনই কেবল তাহা কল্যাণ প্রসব করিতে পারে, নতুবা যতই তীক্ষ্ণ হউক তাহার ফলে, কেবল শঠতা, ধূর্ত্ততা, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কিছু আশা করিতে পারা যায় না। আবার অশুদ্ধ মনের শাস্তি দিবার জন্যই যেন "ভয়" বলিয়া একটী পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। সোরার রোগী বড়ই **ভীত**। হয়ত কোনও পীড়া বা কোনও অবস্থা প্রকৃত পক্ষে ভীতিজনক নয়, কিন্তু সোরা তাহাতেই অত্যন্ত ভীত ও বিব্রত হইয়া পড়ে। একই পীড়া অন্য দোষজনিত হইলে সে আদৌ উদ্বিগ্ন হয় না, কিন্তু সোরাদোষজ হইলে তাহার ভয়ের আর সীমা থাকে না। সোরা একা থাকিতে ভয় করে, অন্ধকারে যাইতে ভয় করে, একটু সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য হইলে ভয় করে, ভবিষ্যতে কি যেন ভয়ানক একটা অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে বলিয়া মনে করে, ও সেজন্য ভয়ব্যাকুল হইয়া উঠে। সোরার বিশেষত্ব—তাহার মানসিক **চাঞ্চল্য ও ভয়**।

সোরার **ক্ষুধা** অস্বাভাবিক,—অসময়ে ক্ষুধা, আহারের অল্পক্ষণ পরেই আবার খাইবার ইচ্ছা; আহারের পরক্ষণেই ক্ষুধা, আহার করিলেও তাহার পেট যেন ভরে না, ক্ষুধাই থাকিয়া যায়। আহারের দ্বারা ক্ষুধার শান্তি হইলেই সেটী স্বাভাবিক ক্ষুধা বলিতে পারা যায়। কিন্তু সোরা-রোগীর আহারে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। আবার, আহার করিবার সময় সে ঘর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, এবং আহার করিবার পরেই বা অল্পক্ষণ পরে পেটটী বায়ুপূর্ণ ও ভার হইয়া উঠে। আহারের পর নিদ্রাকর্ষণ হয় ও নিদ্রা না যাইলে থাকিতে পারে না। সোরা মিষ্ট, অম্ল, এবং অম্ল ও মিষ্ট এই দুই রসই একত্রে থাকে. এরূপ দ্রব্য খাইতে অধিক ভালবাসে। **যে জিনিস খাইলে অনিষ্ট হইবে, সোরার রুচি প্রায় সেই জিনিসেই বেশী।** আবার **অদ্ভুত জিনিস খাইবার ইচ্ছা অতি প্রবল দেখা যায়।** সোরাদুষ্টা গর্ভিণী চা খড়ি, মাটী, পেন্সিল বা এই প্রকার **অখাদ্য** এবং **অদ্ভুত** খাদ্য খাইতে ভালবাসেন। গর্ভাবস্থায়

রমণীদিগের নিজ নিজ প্রকৃতিটী বিশেষ পরিস্ফুট ও বিকশিত হইয়া উঠে, এজন্য তাহাদের গর্ভাবস্থায় রোগলক্ষণ সংগ্রহ করা বিশেষ সুবিধাজনক। আহার্য্য দ্রব্যাদির প্রতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা লক্ষ্য করিলে অনেক সময় ঔষধ নির্ব্বাচনের বিশেষ সৌকার্য্য পাওয়া যায়। মনুষ্যের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালবাসা, মন্দবাসা হইতে তাহার অভ্যন্তরের চিত্র পাওয়া যায়, এবং ঔষধ নির্ব্বাচনের সহায়তা করে। মনে করুন, পিতামাতা আসিয়া সংবাদ দিলেন,—"ছেলে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে খাবার জন্য কান্দে, ১২।১টা রাত্রির সময়, মহাশয়, তাকে কিছু না কিছু খাবার না দিলে চলে না," আপনি এই একটী কথা হইতেই সোরার সন্ধান পাইলেন,—এবং কোন্ কোন্ ঔষধে এই লক্ষণ আছে, তাহা মিলাইতে পারিবেন। অনেক এন্টিসোরিকের মধ্যে এই লক্ষণ রহিয়াছে। সোরা, ভাজা জিনিসই অধিক পছন্দ করে, সিদ্ধ করা জিনিস তত পছন্দ করে না। তৈলে বা ঘৃতে ভাজা জিনিস, আচার বা ঐ মত জিনিস বেশী ভালবাসে। মাংসাদি খাদ্য তাহার রুচিজনকও নয়, এবং খাইলে বড় সহ্যও হয় না। সাইকোসিস একেবারেই মাংস সহ্য করিতে পারে না, সোরা বরং পারে। **সোরা সকল প্রকার খাদ্যের মধ্যে মিষ্ট জিনিসই অধিক ভালবাসে।** সোরা, খাবার জিনিস যাহা রন্ধন করিয়া খাওয়া যায়, তাহা **গরম গরমই** পছন্দ করে।

আমি এখানে কেবল বিশেষত্বগুলি সংক্ষেপে লিখিতেছি মাত্র, যেহেতু বিস্তারিতভাবে লেখা সম্ভব নয়। উপরোক্তগুলি স্থূলতঃ মনে রাখিলেই যথেষ্ট হয়। পর্য্যবেক্ষণের ফলে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমে পূর্ণ হইতে থাকে। ঠিক পথে দৃষ্টি আকর্ষণই সর্ব্বাদৌ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিরোদেশ,—সোরার **নিদর্শন** শরীরস্থ অন্যান্য অংশের উপরেও

থাকে। বিশেষ প্রণিধান সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়। সোরার মাথাঘোরা যথেষ্ট ও অনেক প্রকারের। ইহার শিরো-লক্ষণ ও কষ্ট সকলের প্রাতঃকালেই বৃদ্ধি, সূর্য্যদেব যেমন প্রাতঃকাল হইতে ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকেন, ততই সোবার শিরোলক্ষণ সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং যেমন যেমন তিনি ক্রমে ক্রমে অবতরণ কবিতে থাকেন, ততই উপশম হইতে থাকে। আবার দেখা যায় যে, সোরার মানসিক চাঞ্চল্য অত্যন্ত অধিক থাকা সত্ত্বেও শিরঃপীড়া বা শিরোঘূর্ণন, এবং আরও কোনও কোনও পীড়ার সময়,—চুপ করিয়া স্থিরভাবে থাকিতেই ভালবাসে,—যেহেতু স্থিরভাবে থাকিলে, গরম প্রলেপে, বিশ্রামে ও নিদ্রায় উপশম হয়। সোরার শিরঃপীড়ার পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হয়, ও রোগী না খাইয়া থাকিতেই পারে না। যে কোনও দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার ভোগ করিলে, সোরাদুষ্ট রোগীর মাথায় অতিশয় মরামাংশ (অর্থাৎ সচরাচর যাহাকে খুস্কী বলে) বাহির হয় ও অবিরত চুলকানি হইয়া সেগুলি পড়িতে থাকে এবং তৎসঙ্গে মাথাব চুলগুলি উঠিয়া যায়। অকাল-পক্কতা, তাহার মাথার চুলেরই হউক বা গোঁফ দাড়ির চুলেরই হউক, সোরার অতি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সোরা মাথায় ঢাকা বড় সহ্য করিতে পারে না, যদিও পীডার সময় তাহার মাথার তাপ প্রয়োজন হয়, কিন্তু তাহাও বড বেশী তাপ নয়, কেননা সাধারণতঃ **সোরা মাথা খোলা রাখিতেই ভালবাসে।**

চক্ষুতে সোরাজনিত নানা ব্যধি হয়, তবে চক্ষুতে যে কোনও পীড়া হউক না কেন, সোরার নিয়ম এই যে, তাহা দিনের বেলায় **সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি হয়,** এবং **তাপে উপশম রাখে।** তাহা ছাড়া, চক্ষুপীড়ায় প্রায় চুলকানি ও জ্বালা বর্ত্তমান থাকে, এবং চক্ষের পাতাগুলি ঘর্ষণ করিতে ভাল লাগে।

সোরাদোষ হেতু **কর্ণের** পীড়া বড় দেখা যায় না,—তবে, **রোগী-হিসাবে, শব্দে অসহিষ্ণুতা** দেখা যায়। **নাসিকাতে** সোরা লক্ষণ

প্রায়ই দেখা যায় না,—তবে আঘ্রাণ শক্তি সোরার অধিক প্রবল দেখা যায়। এমন কি, কোনও কোনও পীড়ায় সোরাদোষ হেতু আঘ্রাণ শক্তি অতিশয় তীব্র দেখা যায়। রন্ধনের গন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া বমি করিয়া ফেলে, মাথা ঘোরে ও আহারে অনিচ্ছা হয়। ইহা ব্যতীত অন্য আরও একটী দোষের সমাবেশ না হইলে, নাসিকার বড় একটা রোগ দেখা যায় না।

স্বাভাবিক ও সুস্থাবস্থায় মুখের **আস্বাদ** খারাপ হওয়া উচিত নহে। সোরা দুষ্ট ব্যক্তির মুখের আস্বাদ প্রায়ই টক্, তিক্ত ও মিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কোথনও রোগী বলে যে, তাহার মুখে খারাপ আস্বাদ লাগে কিন্তু প্রায়ই **তিক্ত, মিষ্ট** ও **অম্ল,** এই তিন প্রকার স্বাদই সোরার নির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিতে হয়। আহার করিবার পর, কখনও কখনও মুখে ভুক্ত পদার্থের আস্বাদ পাইয়া থাকে। তবে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, সোরা আহারীয় দ্রব্য বিষয়ে **বড় বাছাবাছি করে,** "এটা ভাল নয়, খাব না, ওটা ভাল লাগে না," অর্থাৎ যাহাকে সোজা কথায় "ঘিন্‌ঘিনে" বলে, তাহাই। বাড়ীর লোক অনেক ভয়ে ভয়ে তাহার জন্য খাবার করে, কেননা সর্ব্বদাই বাছিয়া খাইবার প্রবৃত্তি এবং কোন প্রকারের কোনও দোষ পাইলে তাহার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উদর, পাকস্থলী, তলপেট, নিম্নান্ত্র প্রভৃতি স্থানে,—সোরার লক্ষণ, প্রধানতঃ—পেট ফাঁপা, পেট গড়্ গড়্ করিয়া ডাকা, উদর ও তলপেট ফাঁপা, দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই ক্ষুধা, প্রাতঃকালেই ক্ষুধা, নিদ্রার মধ্যে ক্ষুধা, মাথাধরার পূর্ব্বে ক্ষুধা, আহারের পরে অম্লোদ্গার, যে জিনিষ খাওয়া হইয়াছে, তাহারই গন্ধযুক্ত উদ্গার, ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আহার বিষয়ে ও ইচ্ছা অনিচ্ছা বিষয়ে, ইতিপূর্ব্বে মানসিক লক্ষণ লিখিবার কালে অনেকটা আভাস দেওয়া হইয়াছে। একটী কথা আবার বলিতে

ক্ষতি নাই,—তাহা এই যে, পেটে ও অন্যান্য স্থানে **"খালি খালি"** **বোধ,** অর্থাৎ সেখানে যেন কিছুই নাই,—এই প্রকার বোধ সোরার নির্দ্দিষ্ট। দেহের অন্যান্য স্থানে এবং পরিপাক যন্ত্রের এই প্রকার অনুভূতি, সোরার একটী প্রধান বিশিষ্টতা জানিতে হইবে।

সোরার **সর্দ্দিকাশি** বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, তবে একটী কথা এই অধিকারে সর্ব্বদাই মনে থাকা উচিত,—**কেবল সোরাদুষ্ট** সর্দ্দি কাশি, এমন কি, অনেক দিন পুরাতন অবস্থা হইলেও, বড় মারাত্মক হয় না, কিন্তু রোগীর ব্যাকুলতা বড় বেশী, তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও অধিক হয়। সামান্য সর্দ্দিকাশিতেও **তাহার ভয় ও উদ্বেগ বড় বেশী,** আবার অপর দিকে **সোরার সহিত সিফিলিস্ যোগ থাকিলে বা টিউবারকিউলার দোষ থাকিলে,** অতি ভয়ানক সর্দ্দিকাশি, এমন কি, যক্ষ্মা পর্য্যন্ত হইলেও তাহাতে রোগী মনে করে, তাহার বিশেষ কিছু হয় নাই,—**সর্ব্বদাই আশাপূর্ণ। এমন কি, হয়ত মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত, তবুও** টিউবারকিউলার রোগীর **ভয় আদৌ থাকে না, সে কখনও নৈরাশ্যযুক্ত হয় না।** এটী বড় অদ্ভুদ্ পার্থক্য,—মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে সোরাজনিত নানারোগ হইতে পারে, কিন্তু সামান্য হইলেও **ব্যাকুলতা অধিক।** এই ব্যাকুলতা অনেক সময় কেবল সোরাদোষ ব্যতীত রোগীদেহে অন্য দোষ নাই, ইহাই নির্দ্দেশ করে। এজন্যই হ্যানিমান্ কহিয়া গিয়াছেন যে মানসিক লক্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

অন্যান্য স্থানে সোরার বিশিষ্টতা বড কিছু না থাকায় এখানে লিখিত হইল না। কেবল সোরাদোষের জন্য উপরোক্ত লক্ষণাদি যাহা লিখিত হইল, তাহা মনে রাখিবার যোগ্য, তাহা হইলেই প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে অতি সহজেই জানা যাইবে যে, এই ক্ষেত্রে সোরা ব্যতীত আর অন্য কোনও দোষ আছে বা নাই। ইহার পরে অন্য

দোষের সহিত সোরার সংমিশ্রণ হইলে কি প্রকার তারতম্য পাওয়া যায়, সেই প্রসঙ্গে সোরার বিষয় আরও লিখিত হইবে।

সোরার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সোরার প্রধান বিশেষত্ব যে দুইটী, তাহা না লিখিলে অসম্পূর্ণ থাকে। এই দুটী এতই প্রয়োজনীয় যে, কেবল এই দুটী নিদর্শন মনে রাখিলে আর অন্য কথা মনে না থাকিলেও ক্ষতি নাই। সে দুটী কি, কি?—(১) সোরা—**অনুভূতিপ্রধান,** অর্থাৎ বোধ করিবার শক্তি সোরার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাতনা, কন্‌কনানি, টন্‌টনানি বা অন্য কোনও প্রকার বেদনার কম বেশীর কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে—কেবল **বোধের**; সোরা,—**বোধ** করে সর্ব্বাপেক্ষা, অর্থাৎ সাইকোসিস্ বা সিফিলিস অপেক্ষা অনেক বেশী। মনের উপর সোরার অধিক ক্রিয়া থাকায় ইহার **অনুভূতি** অত্যন্ত বেশী। অতএব যদি কোনও রোগীর রোগলক্ষণে নানা প্রকার যাতনা **বোধের** প্রাধান্য থাকে, তবে জানিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি সোরাদুষ্ট। (২) এক্ষণে, সে ব্যক্তি যে **কেবলই** সোরাদুষ্ট, অন্য কোনও দোষ যোগে নাই, (সোরা না থাকিলে ত পীড়ার সৃষ্টিই হয় না, কাজেই সোরা ত আছেই, কিন্তু **কেবলই** সোরা আছে, অন্য কোনও দোষ তাহার নাই), ইহা জানিবার উপায় কি? ইহা জানিবার **একমাত্র** উপায় এই যে, যদি রোগীর যে স্থানে বা যে যন্ত্রে পীড়া, তাহা **কেবল ক্রিয়াগত, কেবল কার্য্যগত** পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ কেবলই কষ্ট, যাতনা ইত্যাদি হয়, তবে সোরা ব্যতীত আর কেহই সেখানে নাই জানিতে হইবে। আর যদি কেবল ক্রিয়াগত, কেবলই কার্য্যগত পরিবর্ত্তন না হইয়া, সেই যন্ত্রের **আকারগত** পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবে জানিতে হইবে যে, সোরার সহিত অপর দোষের নিশ্চয়ই যোগ আছে। **সোরা একা কখনই আকারগত পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করিতে পারে না।** এ তত্ত্বটী একটু পরিস্ফু

করিয়া না কহিলে বোধ হয় অনেকেরই বোধগম্য হইবে না। মনে করুন, কোনও রোগীর সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব হইতেছে, বাম দিকে শয়ন করিতে অক্ষম, দক্ষিণ দিকে ব্যতীত সে শুইতে পারে না, পিপাসাও অধিক, মধ্যে মধ্যে তরল মল ভেদ হইয়া থাকে, ইত্যাদি হইতে জানিতে পারিলেন যে, তাহার যকৃতের ব্যধি হইয়াছে। এক্ষণে তাহার যকৃতস্থানটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যদি কোনও বিবৃদ্ধি লক্ষ্য না করিতে পারেন, তবে জানিতে হইবে যে, ইহা **কেবলই** সোরার কার্য্য, কিন্তু যদি **বিবৃদ্ধি** দেখিতে পান, তবে জানিবেন যে সাইকোসিস্ অথবা সিফিলিস্ অথবা এই দুইটীই সোরার সহিত যোগ আছে; নতুবা বিবৃদ্ধি রূপ (যকৃতের) **আকারগত পরিবর্ত্তন** কখনই হইত না। মনে করুন, একটী উন্মাদ রোগী আপনার নিকট চিকিৎসার্থ আসিল,—আপনি রোগীর লক্ষণাদি সংগ্রহ করিলেন, এবং যদি তৎসঙ্গেই দেখেন যে, তাহার মুখমণ্ডলে উন্মাদ রোগের একটী "**ছাপ**" পড়িয়াছে, তাহার উদাসীনভাব যেন মুখে **অঙ্কিত** রহিয়াছে, একটী উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, শূন্যদৃষ্টি ইত্যাদি যেন তাহার মুখে লেখা রহিয়াছে, তবে আপনি জানিবেন যে, রোগীর মস্তিষ্কে বিধানতন্তু সকলের **আকারগত** পরিবর্ত্তন হইতেছে ও হইয়াছে; এ অবস্থায়, একা সোরার কার্য্য কখনই হইতে পারে না, নিশ্চয়ই অন্য দোষ সকলের সংযোগ আছে। কিন্তু মনে করুন, তাহার মুখ দেখিয়া সে যে উন্মাদ রোগী, তাহা যদি আপনি ধারণা করিতে না পারেন, যদি কেবল লক্ষণসমষ্টি হইতেই আপনি জানিতেছেন যে, তাহার কার্য্য কলাপ পাগলের ন্যায়, কিন্তু তাহার মুখে সে প্রকার কিছুই **প্রকাশ** পাইতেছে না, তবে জানিবেন যে, সোরাই একা এখানে কার্য্য করিতেছে, অন্য আর কেহ নাই।

আকারগত পরিবর্ত্তন সহজে বা অল্পদিনে হয় না। সোরা ব্যতীত

অন্য একটী বা দুইটী দোষ থাকা সত্ত্বেও আকারগত পরিবর্ত্তন হইতে অল্প বিস্তর সময় প্রয়োজন হয়। যদি ঐ সময়ের মধ্যে ক্রিয়াগত পরিবর্ত্তনের প্রকৃত আরোগ্য হয়, তবে যতই প্রবল দোষ থাকুক না কেন, ঐ রোগীর আকারগত পরিবর্ত্তন আর আসিতেই পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা হয় না, ঐ সময়টা, বহুমূল্যবান সময়টা বৃথা কাটান হয়, কাজেই রোগটী জটীলতর হইয়া উঠে এবং আকারগত পরিবর্ত্তন ঘটিবার সুবিধা দেওয়া হয়। আমি দেখিয়াছি, স্বামীর দোষে অনেক স্ত্রীলোকের সোরা ও সাইকোসিস্ দোষ হেতু জরায়ুতে বা ডিম্বাধারে বহুদিন ধরিয়া যাতনা, বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ভোগ করার পর, অনেক দিন গত হইলে তবে টিউমার প্রভৃতি তৈয়ার হয়। টিউমারকে বাঙ্গলা কথায় অর্ব্বুদ বলে। তখন লোকে টিউমারের চিকিৎসা করিবার জন্য ব্যাকুল হয় এবং অধিকাংশ স্থলে কেবল টিউমারটী কাটিয়া ফেলা ছাড়া অন্য প্রতিবিধান হয় না, ইহাতে রোগের ফলটী নষ্ট হয়, রোগীটী সারে না, বরং রোগীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। আমার নিজ ডায়েরীতে যে সকল টিউমারযুক্ত রোগীর চিকিৎসার বিষয় লিখিত আছে, সেখানে ঐরূপ কোনও ক্ষেত্রেই টিউমারের চিকিৎসা কখনই অবলম্বিত হয় নাই। রোগীর চিকিৎসা হওয়াতেই রোগী সারিবার অনেক দিন পরে টিউমার কাজেকাজেই সারিয়া যায় ও গিয়াছে। যাহা হউক, যখন কেবল যাতনা, বেদনা ও টাটানি প্রভৃতির দ্বারা প্রকৃতি দেবী আমাদিগকে ইঙ্গিত করেন যে, "এই সময় রোগীকে আরোগ্য কর, নতুবা আকারগত পরিবর্ত্তন অবিলম্বেই আসিবে," তখনই আমাদের রোগীর দিকে মনোযোগ দেওয়া ও তাহাকে রোগী হিসাবে সারান কর্ত্তব্য, নতুবা রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাইকোসিস্।

কোনও দেহে, সাইকোসিস্ আছে কিনা, তাহা জানিবার **নিদর্শন** অতিশয় প্রয়োজনীয়। সাইকোসিস্ দোষ থাকিলে অবশ্যই সোরা দোষ আছেই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কেননা, সোরাদুষ্ট দেহ ব্যতীত সাইকোসিস্ থাকিতে পারে না। সাইকোসিসের **বিশিষ্ট** নিদর্শন,—**মানসিক**। দৈহিক চিহ্ন যাহা যাহা আছে, তাহার বিষয় পরে লিখিত হইতেছে। ইহার **মানসিক** নিদর্শনই বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিস। সাইকোসিস্ মনের উপর অসাধারণ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার প্রধান নিদর্শন, (১) **গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি**, পাছে অন্য কেহ তাহার পীড়ার বিষয়, কি সাংসারিক বিষয়, জানিতে পারে, এই ভয়ে সাইকোটিক্ রোগী সর্ব্বদাই প্রকৃত ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করে। আর একটা মানসিক চিহ্ন এই যে, (২) তাহার রোগের জন্য কোথাও একস্থানে চিকিৎসা করাইয়া সন্তোষ আসে না। বার বার রোগের স্থান পরীক্ষা করে ও নানা চিকিৎসক দ্বারা করায়, তবুও তাহার সন্তোষ আসে না। আমি যখনই শুনি যে, কোনও রোগী অল্পদিনের মধ্যে ২।৩।৪ জন চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার জন্য গিয়াছে, তখনই সন্দেহ করি যে, সে ব্যক্তি সাইকোটিক্, এবং আমার নিকট আসিলে আমি যখন তাহার লক্ষণসমষ্টি লিপিবদ্ধ করি, তখনই দেখি যে, আমার ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল। সাইকোটিক্ রোগী সর্ব্বদাই এখানে ওখানে নানা চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার্থ গমন করে,—কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া কেবলই চিকিৎসক

পরিবর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। **সাইকোটিক্ রোগীর মনটী রোগের উপর পড়িয়া থাকে, এবং সে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করাইতে পারে না।** সাইকোটিক্ ব্যক্তির বর্ত্তমান রোগ হয়ত বিশেষ কিছুই নয়, লোকের চক্ষে বা চিকিৎসকের চক্ষে সামান্য, কিন্তু রোগী মনে করে—অতি ভীষণ এবং ইহাতে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। সাইকোটিক্ রোগীর আরও একটী নিদর্শন,—(৩) ঝড়বৃষ্টি বা কেবলই ঝড় আসিবার **পূর্ব্বে** তাহার অতি **ঘন ঘন** প্রস্রাবের বেগ হইতে থাকে। এই নিদর্শনটী বড় চমৎকার।

উপরোক্ত ৩টী নিদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যে কোনওটী একবার লক্ষ্যের মধ্যে আসিলে, এ ধারণা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য যে, রোগীর সাইকোসিস্ দোষও আছে। দৈহিক চিহ্নসকলের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে সাইকোসিস্ কি ভীষণ, তাহা একবার না বলিলে সঙ্গত হয় না। যদি সাইকোসিস্ একবার শরীরে প্রবেশ করে, তবে রোগীকে মনুষ্যত্ব হারাইতে হয়। **সাইকোটিক্ বিষ মনুষ্যত্বকে প্রধানতঃ দুই দিকে নষ্ট করে**—(৪) মনুষ্যের **বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্যকরূপে ধ্বংশ করিয়া**, তাহাকে উন্মাদ, বা যাহাকে লোকে "পাগল" বলে, তাহাই করিবার চেষ্টা করে। তাহার চিন্তাশক্তির ধারা উল্‌টাইয়া দেয়। এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে পাগল বলা না চলিলেও, প্রায়ই পাগলের ন্যায় মনে হয়। যতক্ষণ মানুষ নিজের হিসাব নিকাশ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় ও "ঠিকে ভুল" না করে, ততক্ষণ সাধারণ লোকে তাহাকে পাগল বলিবে না,—কিন্তু একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই তাহার মনের অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। পূর্ণমাত্রায় সুস্থ মন এবং একবারে বদ্ধ পাগল, ইহার মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে, তাহার মধ্যে যে সকল স্তর পাগলের নিকটবর্ত্তী, সেগুলি সকলই সাইকোসিসের

কীর্ত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। মনকে নষ্ট করিতে এরূপ অদ্ভুদ্ শক্তি আর কাহারও নাই। **স্মৃতিশক্তির** প্রায় একেবারেই উচ্ছেদসাধন করে। রোগীর কিছুই মনে থাকে না। **বিশেষতঃ, লোকের নাম, দ্রব্যের নাম, লোকের ঠিকনা** ও **তারিখ** এবং **বার বা মাসের দিন সংখ্যা**, তাহার আদৌ স্মরণ থাকে না। (৫) সাইকোসিস্ মানুষের **ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোপ করে**। তাহাকে মিথ্যাবাদী, দুষ্ট ও পাপী করিতে চেষ্টা করে। মনুষ্যের ভালবাসা বা অন্যের জন্য চিন্তা একেবারে নষ্ট করিয়া, তাহাকে নীচ, স্বার্থপর ও হীনমনা করিয়া থাকে। জগতে যত প্রকারের পাপী আছে, তাহাদের ভিতর সাইকোসিস্ দোষ নিশ্চয়ই আছে, এবং অনুসন্ধান করিলে সাইকোসিসের সূত্র পাওয়া যায়। মনুষ্যের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়া একেবারে পশুত্বে পরিণত করিতে একমাত্র সাইকোসিস্ই যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। অতএব, এই দোষ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

দৈহিক নিদর্শনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য করিবার জিনিষ— রোগীর অঙ্গে আঁচিল, বা ঐ জাতীয় দ্রব্য। কোনও কোনওটা ঠিক ফুল-কপির ন্যায়, অঙ্গের বর্ণ, কালবর্ণ, ধূসর বর্ণ, ইত্যাদি নানা বর্ণের হয়। কোনও কোনওটা সামান্য পরিমাণে ও দুর্গন্ধ রস ক্ষরণ করে, আবার অনেক সময় শুষ্কও দেখা যায়। এগুলি ব্যতীত, যত প্রকার আব্ বা ঐ জাতীয় জিনিষ,—সকলই সাইকোটিক্। উহাদের নানা প্রকার নাম আছে, সেগুলি ইংরাজী, তাহাদের প্রতিশব্দ বাংলা বা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, ফলতঃ যেখানেই **অতিরিক্ত মাংসখণ্ড**, অস্বাভাবিক ভাবের ছোট বা বড় রকমের **মাংসবৃদ্ধি**, সকলই সাইকোসিসের কার্য্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রোগীর গুহ্য স্থানে অনেক সময় অধিক পরিমাণে এই সকল আঁচিল দেখা যায়। সাধারণ ভাষায় লোকে এই গুলিকে "ডমুরফুলী বলে। অর্শোপীড়ার বলি,—সাইকোসিসের কার্য্য।

উপরোক্ত সাধারণ ও প্রধান নিদর্শনগুলি মনে থাকিলে, সাইকোসিসের অবস্থিতি ধরিবার বড়ই সুবিধা হয়। ইহার পর, দেহের বিশেষ বিশেষ অংশে ইহার কার্য্য কি প্রকার, তাহারই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। সাইকোসিসে মানুষের মেজাজটী একেবারে **খিট্‌খিটে ও ক্রোধী** হইয়া থাকে, তাহার মেজাজের অবস্থা আবার অত্যন্ত অধিক খারাপ হয়,—**ঝড় বাতাস ও ঋতুর পরিবর্ত্তনে**। আমাদের হোমিওপ্যাথির কোনও কোনও চিকিৎসক-গ্রন্থকর্ত্তা সেজন্য সাইকোটিক্ রোগীর নাম **"জীবন্ত ব্যারোমিটার"** দিয়াছেন। বাস্তবিক, পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যায় যে, ঝড় বাতাস এবং ঋতু-বিপর্য্যয়ে, সাইকোটিক রোগীর **দেহে ও মনে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে**। তাহার খিট্‌খিটে ও ক্রোধী মেজাজটী আরও অধিক খিট্‌খিটে হইয়া উঠে। এই সকল পরিবর্ত্তনে, তাহার সর্ব্বদাই **এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বা চলিয়া ফিরিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়**। এক স্থানে থাকা সাইকোটিক্ রোগীর পক্ষে অসম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় (এবং আমাদের সাইকোটিক ঔষধের প্রুভিংএর সময়ও এই লক্ষণ বাহির হইয়াছে) যে, রোগীর **যাতনা ও কষ্ট সকল ঘুরিয়া বেড়াইলে উপশম হইয়া থাকে**।

সাইকোটিক্ রোগীর মন সর্ব্বদাই **সন্দেহ পরিপূর্ণ**। সন্দেহের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া তাহার পক্ষে অতি অসম্ভব। একটী লাইন লিখিয়া বার বার পড়িয়া দেখিতে হয় ও সন্দেহ হয়, কি যেন লেখা উচিত ছিল, তাহা লেখা হইল না। লিখিতে বা বলিতে যে সকল শব্দ সে ব্যবহার করে, তাহাতে তাহার সন্তোষ হয় না, সন্দেহ যায় না,—মনে করে, "ঠিক শব্দগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে ত?" মনে করুন, আপনার নিকট চিকিৎসিত হইবার ইচ্ছা করিয়া কোনও সাইকোটিক্ রোগী আসিয়াছে, তাহার লক্ষণ বলিবার সময়, তাহার

যাতনাদি বর্ণনা করিবার সময়, আপনি প্রায়ই লক্ষ্য করিবেন যে, তাহার মনে একটী সন্দেহ থাকিয়াই যাইতেছে,—কেবলই মনে করে যে ঠিক ভাষায় তাহার লক্ষণাদি বলা হইতেছে না। "ঐ কি যেন বাদ পড়িল।" একবার একটী বাক্য লিখিয়াই আবার কিছুক্ষণ পরে সেটীকে সামান্য সংশোধন করিবার চেষ্টা করে, এবং প্রায়ই সন্দেহে দোদুল্যমান থাকে। লিখিবার সময় একটী বাক্য বার বার পড়িয়া দেখে যে, ঠিক মত লেখা হইয়াছে কিনা, কোনও কথা বাদ পড়িয়া গেল কি না। লিখিবার ও বলিবার সময় সাইকোটিক্ রোগীর কথাগুলি যেন ঠিক যোগাইতে চায় না, কেননা কোন্ কথাটী ঠিক সেই স্থলে যোগ্য হইবে, তাহা মনোমধ্যে ঠিকমত ও দ্রুতগতিতে মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারে না। **সোরায় ঠিক বিপরীত**, যেহেতু লিখিবার বা বলিবার সময় তাহার মনের মধ্যে বাক্যের ও চিন্তার যেন স্রোত আসিয়া থাকে এবং এত দ্রুতগতিতে আসে যে, সে তাহা বলিয়া বা লিখিয়া উঠিতে পারে না।

বিকারাদি পীড়ার সময় অথবা উন্মাদাবস্থায়, সোরারোগী যা তা প্রলাপ বকিতে থাকে, এটা ওটা বলে কোনওটাই স্থিরতাযুক্ত থাকে না,—**সাইকোটিকের ঠিক বিপরীত**, কেননা **একটী প্রলাপ বাক্য সে বার বার বলিবে**। আমি একটী রোগীর বিকারাবস্থায় দেখিয়াছি যে, যাহারাই তাহার পীড়াবস্থায় দেখিতে বা সংবাদ লইতে আসিতেছে, সকলকেই সে অতি করুণস্বরে, অতিশয় অনুনয় বিনয়ের সহিত, অনুরোধ করিতেছে যে, "ঐ দুইটী লোক আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া আজ কয়দিন বসিয়া আছে ও আমায় বিরক্ত করিতেছে, আপনারা দয়া করিয়া পুলিশে সংবাদ দিয়া এই দুইটী লোককে ধরাইয়া দেন।" যে ব্যাক্তি প্রাতঃকালে গিয়াছিল এবং বৈকালেও আবার হয়ত আসিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, প্রাতঃকালে যে তাহাকে পুলিশে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তি

অঙ্গকার করিয়াছিল সে সংবাদ দিবে, তদনুসারে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কিনা। ঐ একই চিন্তা সর্ব্বদাই তাহার মনে উঠা পড়া করিতেছে, সেই চিন্তাটী মন হইতে যাইতে চাহে না। আমাকে দুই বেলা জিজ্ঞসা করিত যে, আমি তাহার প্রতি দয়া করিয়া ঐ দুইটী লোকের বিরুদ্ধে পুলিশে সংবাদ দিয়াছি কি না। আশ্চর্য্য কথা, অন্যান্য বিষয়ে বেশ স্বাভাবিক থাকিলেও, ঐ ভ্রান্তিরই বার বার আন্দোলন। অবশ্য আমি তাহাকে চিকিৎসার দ্বারা আরাম করিতে পারি নাই, অতিরিক্ত বয়স এবং নানা প্রকার কুচিকিৎসা হেতু তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল, ৩৭ বৎসর বয়সে সামান্য জ্বর ও মস্তিষ্কবিকারে মারা যান। আরও একটী সাইকোটিক্ রোগীর উন্মাদ রোগ হয়, সেটী আমাদের গ্রামের লোক। আমাদের গ্রামে ৺দীননাথ রায় নামে একজন অতি উপযুক্ত ও সম্মানী লোক ছিলেন, তিনি সকলের এতই বিশ্বাসভাজন ছিলেন যে, আমাদের গ্রামের ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকট অতি গোপনে তাহাদের অলঙ্কার, অর্থ প্রভৃতি গচ্ছিত রাখিয়া যাইত, আবার আবশ্যক মত লইয়া যাইত, আমরা কখনও কাহারও সহিত কোনও গোলমাল হইতে শুনি নাই। তাঁহারই নিকটস্থ এবং জ্ঞাতিসন্তান একজন উন্মাদগ্রস্থ হইয়া, কি জানি কেন, তাঁহার উপর এত হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিল যে, "দীননাথ" বা ঐ প্রকার কানও শব্দ উচ্চারণ করিলে, সে ব্যক্তি সেখানে আর থাকিত না, ক্রোধে নানাপ্রকার গালিগালাজ ও অঙ্গভঙ্গি করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিত। ক্রমে এরূপ হইল যে, তাহাকে যদি কেহ নিমন্ত্রণ করিত যে,—"দিনের বেলায় আমার বাড়ীতে আপনার নিমন্ত্রণ', তবে আর রক্ষা নাই, যে হেতু "দিন" কথাটী উচ্চারণ করা হইয়াছে, সুতরাং তাহার বাড়ীতে সে কখনও নিমন্ত্রণে যাইত না, এবং অন্যকেও নিরস্ত করিত। অন্য দিকে বড় বেশী কিছু উন্মাদলক্ষণ দেখা যায় নাই। ঐ ব্যক্তির কবিরাজী চিকিৎসা

হইয়াছিল, আরাম হয় নাই, তবে ঐ ভাবে অনেক দিন জীবিত ছিল। এতই আক্রোশ ছিল যে, দীননাথ রায় মহাশয় মারা যাইবার পর তাহার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়। সাইকোসিসের দ্বারা মনের কি প্রকার নীচতা হয়, চিন্তা করা যায় না।

যেমন উপরোক্ত নিদর্শনগুলি হইতে জানা যায় যে, একটী লোকের দেহে সাইকোসিস্ আছে, তেমনই কতকগুলি এরূপ রোগলক্ষণ আছে যে, সেগুলি সাইকোটিক্ ধাতু না হইলে আসিতে পারে না। সেই রোগলক্ষণগুলিও এখানে লিখিত হওয়া প্রয়োজন। সেই রোগ লক্ষণগুলিও কম নিদর্শন নয়! অণ্ডকোষের স্ফীতি, অণ্ডকোষের বেদনা, বাতরোগ ও তাহার যাতনা, সর্দ্দি—নাকের বা অন্য কোনও স্থানের, যেমন আমাশয় ও স্ত্রীলোকদের প্রদরস্রাব, রক্তহীনতা, শারীরিক বিবর্ণতা, শরীরের কোনও স্থানের মাংসপেশী ছোট হইয়া যাওয়া, কোমরটী "পড়িয়া যাওয়া", মূত্রযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া, স্নায়বিক যন্ত্রণা, এগুলির প্রত্যেকটীই সাইকোসিস্ দোষের নিদর্শক। এ সকল রোগ-লক্ষণের মধ্যে কেবল মূত্রযন্ত্রেরই নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে, যথা, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র রক্তমূত্র, পুঁজমূত্র, ব্রাইট্‌স ডিজিস, গাউট নামক অতি দুষ্ট জাতির বাত, শোথ, ইত্যাদি সাইকোসিসের জন্য কোনও স্থানের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হওয়ায়, অনেক স্থলেই লোকে খঞ্জ, নেংড়া ইত্যাদি হইয়া উঠে, আবার কাহারও বা চলৎশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু এবং গর্ভসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রগুলি সাকোসিস দোষে নানাপ্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হয়। স্ত্রীলোকগণ যখন স্বামীর দোষে সাইকোসিস্ বিষে বিষাক্ত হন, তখন প্রায়ই তাঁহাদের মাতৃত্বেরই হানি ঘটে। কেননা সর্ব্বাদৌ ঋতুকালে তাঁহারা যে যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রক্তস্রাব স্বাভাবিক পরিমাণে হয় না, এবং তৎসঙ্গে দারুণ যন্ত্রণা, এমন কি, অনেক

সময় স্ত্রীলোকদিগের যন্ত্রণার জন্য মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ক্রমে ঋতুস্রাবটী একেবারে নষ্ট ও লোপ পাইয়া থাকে এবং গ্রন্থি, আর্ব্বুদ, যাহাকে ইংরাজীতে টিউমার, ক্যানসার, এপিথেলিওমা ইত্যাদি বলে, সেই সকল উপস্থিত হইয়া প্রাণহানি করিয়া থাকে। তাহা ব্যতীত, স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়েই একবৎসা, মৃতবৎসা, বন্ধ্যা ইত্যাদি দোষ-যুক্তা হইয়া চিরদিনের জন্য আনন্দশূন্যা হইয়া মৃতবৎ জীবন যাপন করিতে থাকেন। সাইকোসিসের মত এত দুষ্ট জাতির দোষ বোধ হয় অপর দুইটী নয়, অবশ্যই সোরাও অত্যন্ত ব্যাপক, কিন্তু সাইকোসিস্ অতিশয় বিশ্বাসঘাতক, যেহেতু **বাহিরের প্রকাশ বড় বেশী থাকে না, অথচ ভিতরে ভিতরে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং স্ত্রীলোকের মাতৃত্বটীকে ধ্বংস করে।** এত সর্ব্বনাশ, অথচ অতি গোপনে, অন্য কেহ সাধন করিতে পারে না।

পিতামাতার দেহে সাইকোসিস দোষ থাকিলে, তাহা সন্তান কন্যায় অবশ্যই বর্ত্তিয়া থাকে, তাহার কোনও ব্যতিক্রম কখনও দেখা যায় না। পিতামাতার সাইকোসিস্ দোষ থাকার নিদর্শন,—ছেলেরা প্রায়ই ৫।৬ মাসের মধ্যেই দেখাইয়া থাকে। সাইকোসিস্ দুষ্ট সন্তানদের ইন্‌ফেন-টাইল কলেরা, দুষ্ট জাতির পেটের পীড়া, অতি অম্লগন্ধী উদারাময়, আক্ষেপ, দন্তোদ্গমের সময় যাবতীয় কষ্ট ইত্যাদি দেখা যায়। সাইকো-সিস্ দোষহেতু বালকবালিকাদিগের পুষ্টি ও বর্দ্ধনের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়, বলিলেও চলে। ছেলে যেন বাড়িতে চায় না। দুগ্ধপান তাহাদের বিপজ্জনক হয়,—পান করিতেও চায় না, পরিপাকও হয় না। রাত্রে নিদ্রার সময় মাথাটী বেশ ঘামে, ঘন ঘন সর্দ্দি হয়, এবং অন্যান্য নানাপ্রকার রোগের আবাসস্থান হইয়া থাকে। আজকাল অকালমৃত্যু অধিক হওয়ার প্রধান কারণই,—পিতামাতার সাইকোসিস দোষ।

প্রায়ই দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকগুলি প্রথমগর্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (রোগী

নং ৪ দেখুন) বেশ নির্ম্মল ও সুস্থ থাকেন, তাহার পর প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের নানা কষ্ট ও রোগলক্ষণ একে একে আসিয়া দেখা দেয়। **স্বামীদেহের দোষে** এই ঘটনা ঘটে। এজন্য সাইকোসিস দোষটী হোমিওপ্যাথিক এন্টিসোরিক ও এন্টিসাইকোটিক চিকিৎসার দ্বারা নির্ম্মলভাবে আরোগ্য না হইলে, পুরুষদিগের কখনও বিবাহ করা উচিত নয়। পিতা হয়ত নিজে কোনও দোষ করেন নাই, নিজের হয়ত কখনও সাইকোটিক্ গনোরিয়া হয় নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে সাইকোসিস্ দোষশূন্য, তাহা বলা যায় না, কেননা তিনি হয়ত তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে দোষটী প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং নিজের সন্তানকন্যা-দিগেরও দোষের কারণ হইতেছেন। দোষ সকল নানা দিক হইতে আসিতে পারে। কন্যার বিবাহ অতি সাবধানে দেওয়া উচিত এবং পুত্রের বিবাহও অতি সাবধানে দেওয়া উচিত, তবে আজকাল সংক্রামকতা যেরূপ অতি ব্যাপক হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ সাবধান হইলে আর বিবাহ দেওয়াই চলে না।

প্রত্যেক দোষের, অর্থাৎ সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস হেতু যে, সকল ব্যাধি ও ব্যাধিলক্ষণ আসে, তাহারা যদি সর্ব্বপ্রথমেই সুচিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইতে পায়, তবে অনেক কল্যাণ হয়, তাহা প্রায়ই হয় না, তাহাদিগকে কেবল চাপা দেওয়াটাই আজকাল চিকিৎসা বলিয়া জগতের লোক জানে, এবং এই **চাপা দেওয়ার জন্যই** যত অনিষ্ট হইতেছে ও হইবে। এই যে নূতন নূতন নাম ও রূপের ব্যাধি নিত্য নিত্য দেখা দিতেছে, ইহার কারণ অন্য কিছুই নয়। কিন্তু কেই বা শোনে ? এজন্য প্রাচীন পীড়া হাতে লইবার সময় বিশেষ স্থির চিত্তে ও গভীর চিন্তার সহিত দেখিতে হয় যে, **কোন্‌টী দোষজ ব্যাধিলক্ষণ** এবং **কোন্‌টী চাপা দেওয়ার জন্য** আসিয়াছে। আজকাল ইঞ্জেক্‌সনের জন্য ব্যাধিলক্ষণসকল এত বিশ্রী জটীলতা

প্রাপ্ত হইতেছে যে, অনেক সময় ঐরূপ স্থির করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে।

এক্ষণে শরীরের **নানাস্থানে ও নানা যন্ত্রবিশেষে** সাইকোসিসের কার্য্য বিশেষ ভাবে লিখিবার প্রয়োজন মনে করি।

মন—মনের উপরে সাইকোসিসের ক্রিয়া ইতিপূর্ব্বেই বিশিষ্টভাবে কহিয়াছি। সাইকোটিক্ রোগীর মন অতিশয় খিট্‌খিটে হয়, এইটাই **সাইকোটিক্ মনের যেন বিশেষত্ব**। সাইকোটিক্ মনের এই বিশেষত্বটী আবার ঋতুর বিপর্য্যয়ে বৃদ্ধি হয়। সোরিক্ রোগীর অন্যমনস্কতা এবং সাধারণতঃ সকল বিষয়েই স্মরণশক্তির একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাইকোটিক্ রোগীর উহা **কোনও কোনও বিষয়ে** থাকে, যথা, বলিতে বলিতে বা লিখিতে লিখিতে কথা ভুলিয়া যায়, যেন কথা যোগাইতে চায় না। পড়িবার সময় এই মাত্র যে কথাটী বা যে বাক্যটী বা যে ভাবটী পড়িয়াছে, তাহা ভুলিয়া যায়, অতি সচরাচর কথার বানান বিষয়ে ভয়ানক সন্দেহ দেখা যায়। সন্দেহ থাকা স্বভাবটীও সাইকোটিক্ রোগীর বিশেষত্ব। সাইকোটিকের **তারিখ ও নাম** এই দুই বিষয়ে স্মরণশক্তির অধিকতর অভাব দেখা যায়। বিকারের সময় বা উন্মাদ অবস্থায় সোরিক্ রোগী যেমন ক্রমাগত বকিতে থাকে, সাইকোসিসে কথা যেন খুঁজিয়া পায় না এবং এক কথাই বার বার বকে,—এই বিভিন্নতাটি মনে রাখিবার যোগ্য। সাইকোটিক মনের আরও একটী বিশেষত্ব এই যে, অতি **সম্প্রতি** যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সবই ভুলিয়া যায়, অথচ বহু পূর্ব্বের ঘটনা সকল বেশ মনে থাকে। এটী বড়ই চমৎকার।

মস্তক—সাইকোটিক্ শিরঃপীড়ার বিশেষত্ব এই যে, রোগী মাথা ধরিলে আদৌ স্থির থাকিতে পারে না। অতিশয় অস্থির হয়, কান্দে, এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। সাইকোটিক্ পিতামাতার

সন্তানের যে কোনও ব্যাধি হইলে, তাহার **অস্থিরতা** একটী প্রধান্ লক্ষণ। মাথার চুলের মধ্যে আস্‌টে গন্ধ বাহির হয়, এবং চুল উঠিতে থাকে। ইহা ছাড়া অন্য বিশেষ লক্ষণ বড় দেখা যায় না।

অন্যান্য অঙ্গে বা যন্ত্রাদিতে সাইকোসিসের কার্য্য যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আর উল্লেখযোগ্য কিছু দেখা যায় না, তবে অন্য দোষের সংমিশ্রণ হইতে যে সকল ব্যাধিলক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা যথাস্থানে লিখিত হইবে। কিন্তু একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যেখানেই কোনও প্রকারের সর্দ্দি অর্থাৎ স্রাব, বাতব্যাধি এবং অর্শরোগ, সেখানেই সাইকোসিস্ দোষ নিশ্চয়ই আছে। টীকা লইলে সাইকোসিস্ দোষটী মানব দেহে প্রবেশ করে, এবং যে ব্যক্তি আদৌ সাইকোটিক্ নয়, তাহারও টীকা হইলে সাইকোসিস্ দোষ আসিয়া তাহার শরীরে নানা সাইকোটীক্ লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের জননেন্দ্রিয়, ডিম্বাধার প্রভৃতিতে, যেখানে স্রাবের সহিত **কষ্ট ও যাতনা** বর্ত্তমান থাকে, সেখানে অবশ্যই সাইকোসিস্ দোষ আছে, জানিতে হইবে। দাদ্ প্রভৃতি চর্ম্মরোগও প্রায়ই সাইকোসিস্‌দোষজ।

সাইকোসিসের ক্রিয়া অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মনেই যেন অধিক, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

দোষের আবির্ভাব,—সাইকোসিস্ দোষটী উত্তমরূপে বুঝিতে পারাও অনেক সময় অতি সুকঠিন। জননেন্দ্রিয় হইতে অতিশয় জ্বালা ও যন্ত্রণাযুক্ত প্রস্রাব হইলেই যে তাহা সাইকোসিস্ হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। অনেক সময় উহা ঐ **স্থানীয়** ব্যাধিও হইতে পারে, এবং তাহা হইতে উপরোক্ত ব্যাধিলক্ষণ সকল আসে না। **সাইকোটিক্ স্রাব একটী স্বতন্ত্র ও অতি দুষ্ট জাতির স্রাব** এবং প্রথম অবস্থায় বিভিন্নতা স্থির করাও একটু কঠিন। দুষ্টযোনি গমন না করিলে **দুষিত** গনোরিয়া, যাহা হইতে সাইকোটিক্ দোষ উৎপন্ন হয়, সেই

গনোরিয়া হইতে পারে না। অপরিমিত পরিশ্রম, রৌদ্রাদি সেবন, ইত্যাদি রুক্ষকর্ম্ম হইতে অনেক সময় **স্থানীয়** স্রাব ও জ্বালাযন্ত্রণা হইতে দেখা যায়, ফলতঃ তাহা কখনই দুষিত নয়, এবং তাহা হইতে সাইকোসিস্ আসিতে পারে না।

আর এক কথা, এক দেহ হইতে যখন অন্য একটী দেহে সাইকোসিস্ বা সিফিলিস্ দোষ সংক্রমিত হয়, তখন যাহার দেহ হইতে দোষটী আসিবে, তাহার দেহে ঐ ঐ দোষের যে প্রকার **অবস্থা,** ঠিক সেই প্রকার **অবস্থাই** সংক্রমিত হয়। যদি স্রাবযুক্ত বা স্রাবলুপ্ত অবস্থা থাকে, তবে সেই প্রকার অবস্থা অর্থাৎ স্রাবযুক্ত বা স্রাবলুপ্ত অবস্থারই প্রাপ্তি ঘটে। কোনও একটী সাইকোটিক্ সন্তান, পিতামাতার সাইকোসিস্ দোষের যে **অবস্থায়** জন্মগ্রহণ করে, ঠিক সেই অবস্থার দোষই প্রাপ্ত হয়। নিজের **অর্জ্জন করা দুষিত গনোরিয়া না হইলে প্রাথমিক স্রাবটী থাকে না।** প্রত্যেক দোষই মানব শরীরে, প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্য্যায়ের থাকিতে পারে এবং সন্তান, উত্তরাধিকারসূত্রে পাইলে, ঠিক সেই অবস্থাটীই পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে, পরে উদাহরণ ও রোগীতত্ত্ব দ্বারা আরও পরিস্ফুট হইবে। নিজের জীবনে **অর্জ্জিত** না হইলে, আরোগ্যের পথে গনোরিয়ার স্রাবটী আনা সম্ভব নয়। কিন্তু অর্জ্জিত ও প্রাথমিক স্রাবযুক্ত অবস্থাটী যদি অচিকিৎসার দোষে কাহারও লুপ্ত হয়, তবে ঐ স্রাবাদি পুনরায় আনিতে না পারিলে আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। উহা ব্যতীত যদি অন্য অবস্থাযুক্ত সাইকোসিস্ দোষটী, পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্তি ঘটে, তবে স্রাব না ফিরিলেও অন্যান্য নিদর্শনের দ্বারা আরোগ্যলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে পরে আরও লিখিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সিফিলিস্।

সিফিলিসের প্রধান নিদর্শন—দুষ্ট জাতির ফোড়া, বিউবো, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, জিহ্বার উপর সাদা লেপ এবং জিহ্বাটী মোটা ও লেপযুক্ত হওয়ায় তাহার উপর দন্তের ছাপ বা দাগ পড়া, ঘর্ম্মে উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি বোধ হওয়া, হাড়ের ভিতর বিশেষ প্রকারের বেদনা ও যাতনা, নানা জাতির ক্ষত ও চর্ম্মরোগ, রাত্রে শয্যাতপে বৃদ্ধি, মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ, রাত্রিই সাধারণতঃ বৃদ্ধির সময়, ইত্যাদি কতকগুলি প্রধান **নিদর্শন** দেখিলে, সে শরীরে সিফিলিস্ আছে, নিশ্চয়ই জানিতে হয়। সিফিলিস্ বা সাইকোসিস্ কখনও সোরা ব্যতীত থাকে না। সিফিলিসেব সঙ্গে সাইকোসিস্ না থাকিতেও পারে, কিন্তু সোরা যে থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিফিলিসের চর্ম্মরোগের একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে চুলকানি আদৌ থাকে না। তাম্রবর্ণের, চুলকানিবিহীন, এক জাতীয় উদ্ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কেবল সিফিলিসের জন্যই হইয়া থাকে। সিফিলিটিক ধাতুর দুই প্রকার অবস্থা দেখা যায়, কাহারও কাহারও ঠাণ্ডা ও গরম দুইটাই অসহ্য হয়, কাহারও বা গরম একেবারেই অসহ্য হয় এবং সিফিলিটিকের অধিক বয়স হইলে প্রায়ই ঠাণ্ডা অসহ্য হইয়া উঠে। সিফিলিটিক দেহে মস্তিষ্ক, লিভার, মূত্রযন্ত্র, প্লীহা ও ফুসফুস কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। ঐ ঐ যন্ত্রগুলি এবং অস্থি ও রক্ত অতি ভয়ানক ভাবে আক্রান্ত হয়। অতএব প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি এবং শরীরের বিশেষ আবশ্যকীয় অংশই দূষিত হইয়া থাকে। নাসিকার ভিতরে ক্ষত, গলার মধ্যে ক্ষত, ইহার একটী অতি সাধারণ লক্ষণ।

সিফিলিসের প্রথম আক্রমণের পর, অর্থাৎ বিষটী সামান্য বিস্তার লাভ

করিলেই, লিঙ্গের মধ্যে নালীর চতুর্দ্দিকে যে ক্ষত হইতে থাকে, বাহ্য প্রলেপাদি দ্বারা অথবা ইঞ্জেক্‌সেনাদির দ্বারা সেই ক্ষতকে, আরোগ্যের নামে, লোপ করিয়া দিলে, তখন সিফিলিস্ বিষটী উত্তমরূপে সংক্রমিত হইয়া প্রায়ই "বিউবো" হইতে দেখা যায়, তাহার পর ক্রমে উদ্ভেদ ও ক্ষতাদি হইতে থাকে, সে অবস্থাতেও যদি প্রকৃত আরোগ্য করা হয়, উত্তম এবং তাহা হইলে পুনবায় ক্ষতগুলি আবির্ভাব হইয়া রোগীটী নির্ম্মল ভাবে আরোগ্য হইয়া যাইবার পর ক্ষতগুলিও আরোগ্য হয়, এবং তাহার দ্বারা জানা যায় যে সিফিলিস্ **দোষটী** সম্পূর্ণ গিয়াছে। যদি তাহা না হইয়া সে অবস্থাতেও অচিকিৎসা হয়, তবে শরীবস্থ আরও আভ্যন্তর যন্ত্রাদি এবং অংশগুলি বিকৃত করিয়া ফেলে, এবং ক্রমে মনুষ্যত্বটীকেই নষ্ট করিতে থাকে।

সিফিলিস্ একটী অতি **গভীর দোষ**। রক্তাদি ধাতুকে দূষিত করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া ইহা মনুষ্যের **মনকে** অতিশয় গভীরভাবে আক্রমণ করে। **মনের স্থবিরতা, আলস্য ও জড়তা** আনাই ইহার প্রধান কার্য্য। মনের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করে, এবং কোনও বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিবার শক্তি লোপ করিয়া দেয়। রাত্রিকালটী সিফিলিটিকের পক্ষে অতি ভয়ানক সময়, কেননা ঐ সময় ও শয্যাতপে তাহার সকল কষ্টেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং রাত্রিতে তাহার মানসিক অবস্থাও শোচনীয় হয়। শয্যাতপে ও রাত্রিতে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, তাহাতে সোরিক দেহে বরং কষ্টের উপশম হইয়া থাকে, কিন্তু সিফিলিটিকের উপশম হওয়া ও দূরের কথা, বিপরীতপক্ষে, ঘর্ম্মজন্য তাহার সকল কষ্টের বৃদ্ধি বোধ হয়। রাত্রিতে তাহার মনের অবস্থা এতই ভীষণ হয় যে, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছাটী ঐ সময় অতি প্রবল হইয়া উঠে এবং কি প্রকারে সে তাহা সাধন করিতে পারে, তাহারই উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকে। তাহার মনে হয় যে, জীবনটী তাহার পক্ষে কেবল ভার মাত্র,

অতএব এ জীবন না রাখাই ভাল। সুতরাং সিফিলিস্ যে কত গভীর ভাবে মনকে দূষিত করে, তাহা অনুমান করাও অতি বিস্ময়জনক। নিজের জীবনের প্রতি মমতা প্রত্যেক জীবের অতি প্রবল। নিজের জীবন প্রত্যেক জীবেরই অতিশয় প্রিয়, এমন কি, জগতে এত প্রিয় আর কিছুই থাকিতে পারে না ও নাই। এমন যে মমতা, এমন যে প্রিয়তা, তাহাই নষ্ট করিয়া নিজের জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়, ও কিসে জীবনটা ধ্বংশ করিতে পারা যায়, সেই উপায়ই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত করে, আবার রাত্রিতেই ঐ প্রকার প্রবৃত্তিটার বৃদ্ধি হয়। ইহা ছাড়া, সিফিলিটিকের মনটা ক্রমে নির্ব্বোধ এবং একগুঁয়ে হইয়া যায়। সহজে কিছু বুঝিতে চায় না, পারে না, এবং সেজন্য তাহার মনটা অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া থাকে। কোনও একটা বিষয়ের চিন্তা হইতে, সে অন্য কোনও বিষয়ে চিন্তা করিবার প্রয়াসে, মনকে সহজে পরিবর্ত্তন করিতে অপারক হইয়া উঠে। সেজন্য কোনও সামান্য চিন্তাও তাহার মনে দীর্ঘকাল চলিতে থাকে ও নিকটস্থ অতি গুরুতর ও আবশ্যকীয় বিষয়েও যেন অন্যমনস্ক থাকিতে বাধ্য হয়। পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ে লিপ্ত থাকে, এবং সঙ্গীরা অন্য কোনও বিষয়ে কথোপকথন করিলে, সে পূর্ব্ব বিষয়েরই যেন "জাউর কাটিতে" থাকে, হঠাৎ মনকে নূতন বিষয়ে আনিতে তাহার বড় অসুবিধা বোধ করে। আবার বিপরীত পক্ষে, কোনও একটা বিষয় পুস্তকে বা সংবাদপত্রে পাঠ করিলে, এমন কি, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেও অনেক সময় তাহার অর্থবোধ হইতে চায় না। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও অনেক বিষয় মনে থাকে না, ঠিক যেন তাহার মনটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যায়। আরও এক কথা,—ঘর্ম্ম, উদরাময়, মূত্র ইত্যাদি স্বাভাবিক স্রাবাদি হইতে সোরিক্ এবং কখনও কখনও সাইকোটিক্ রোগীর মানসিক লক্ষণের উপশম দেখা যায়, সিফিলিটিকের তাহা হয় না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধি দেখা যায়।

সিফিলিসের **শিরঃপীড়া** রাত্রেই বৃদ্ধি পায়, এবং প্রাতঃকালে কমিয়া যায়। দিনের বেলায় উহা থাকিলেও অতি সামান্য, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া রাত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বৃদ্ধি হয়, এবং উষাগমে কমিয়া যায়। যেখানেই দেখা যায় যে, তাপে, স্থির থাকিলে, শুইলে অথবা নিদ্রা হইলে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি হয়, সেখানে উহা নিশ্চয়ই সিফিলিটিক্ জানিতে হইবে। সিফিলিস্ প্রায়ই ঠাণ্ডাই চায়, এবং তাহার শিরঃপীড়াও ঠাণ্ডায়, স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়া বেড়াইলে এবং নিদ্রার পূর্ব্বে উপশম হয় ও কমে। সিফিলিসে মাথায় প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ও তাহাতে একটী দুর্গন্ধ বাহির হয়।

সিফিলিস দোষহেতু মনুষ্যের অন্যান্য বহিরঙ্গ অপেক্ষা **চক্ষুরই** নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। পীড়ার নামের শেষ করা অসাধ্য, তবে কেবলমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষণ দেখিয়া তাহা প্রধানতঃ কোন্ দোষজ তাহা জানিতে হয়। সিফিলিসের সাধারণ হ্রাসবৃদ্ধি সকল চক্ষুরোগেই প্রযুজ্য, যথা, রাত্রিতে, শয্যাতপে, গরমে, শয়নে, ঘর্ম্মোদ্গমে,—চক্ষুরোগের বৃদ্ধি, এবং দিনের বেলায়, ঠাণ্ডায়, বসিয়া থাকিলে ও জল দিয়া ধৌত করিলে,—**উপশম** হয়। চক্ষুতে, নাসিকায় ও কর্ণাদি যন্ত্রে ক্ষত হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিফিলিসদোষ হইতেই হইয়া থাকে।

সিফিলিটিক্ রোগী কখনই মাংস **খাইতে** চায় না, এবং ঠাণ্ডা খাদ্য ও ঠাণ্ডা পানীয়ই পছন্দ করে। গরম খাদ্য ও পানীয় এবং জান্তব খাদ্য সে ভালবাসে না ও তাহার সহ্যও হয় না। জান্তব খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধ খাইতে ইচ্ছা করে মাত্র, তবে ততটা সহ্য করিতে পারে না।

শরীরের **বিধানতন্তুনিচয়ে** সিফিলিসের ক্রিয়াসকল সোরার সহিত জড়িত, এজন্য একটী স্বতন্ত্র আলোচনা অতীব প্রয়োজন। সেখানেই সিফিলিসের যে কি প্রকার অদ্ভুদ্ ক্ষমতা, তাহা বিশেষভাবে জানা যায়। বক্ষোদেশে, শ্বাসযন্ত্রে, সাধারণ জীবনীশক্তির দৌর্ব্বল্য ঘটাইয়া ঐ ঐ

স্থানে ও যন্ত্রে, কি যে ভীষণ অবস্থা আনয়ন করে, সে বিষয়ের একটী স্বতন্ত্র আলোচনা না করিলে, মনের তৃপ্তি আসে না। আরও কথা কেবল সোরা দোষ ব্যতীত অন্য কোনও দোষই মানবদেহে একক অবস্থান করে না, এজন্য মিলিতভাবে কিরূপ ক্রিয়া করে, তাহা কোনও একটী মাত্র দোষের আলোচনা করিয়া যথেষ্টরূপে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং **মিশ্রিত দোষের** আলোচনাটি অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি। ইতি-পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, সোরা কেবল একা থাকিলে দেহের যন্ত্রসকলের **কার্য্যগত** বৈলক্ষণ্য ও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে এবং অন্য দোষের সাহায্য না পাইলে, **আকারগত** বা **নির্ম্মাণগত** পরিবর্ত্তন ও রোগ-লক্ষণ ঘটাইতে পারে না। এ সকল বিষয় মিশ্রিত দোষের স্বতন্ত্র আলোচনায় বিশেষতঃ রোগী-তত্ত্বের সাহায্যে, বিশেষ পরিস্ফুট হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংমিশ্রণঃ—সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্।

রিকেট্‌স্, স্ক্রফিউলা, ষ্ট্রুমা, সিউডো-সোরা, টিউবারকুলোসিস্।

সোরা, সাইকোসিস্, ও সিফিলিস, প্রত্যেকেই এক একটী অতি ভয়ানক দোষ এবং ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা নানাপ্রকার কঠিন, দুঃসাধ্য ও অসাধ্য ব্যাধিলক্ষণসকল মানবদেহে প্রকাশিত হয়, তাহা অনেকবার লিখিত হইয়াছে ও ইহা প্রায় সকল হোমিওপ্যাথই জানেন। এই সকল দোষের বিষয় যতই পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, ততই ইহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব সকল আমাদের মনে অঙ্কিত হইতে থাকে। সোরা দোষটী মানব দেহে একা থাকিতে পারে, অর্থাৎ এমন লোক দেখা যায় যে, যাহার দেহে কেবলই সোরা দোষটি রহিয়াছে এবং সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্,—এই দুইটী দোষের মধ্যে কোনওটী নাই। কিন্তু অন্য দুইটী দোষ, যথা সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্, ইহাদের যে কোনও একটী বা দুইটীই যদি মানবদেহে বর্ত্তমান আছে, দেখা যায়, তবে জানিতে হইবে যে, সোরাদোষ ঐ দেহে নিশ্চয় আছে, কেননা সোরা সর্ব্বপ্রথম কোনও দেহে আবির্ভাব না হইলে অন্য দুইটী দোষের কোনওটীই আসিতে পারে না। একথা অতি যুক্তিযুক্ত, প্রকৃত সত্য, এবং হোমিওপ্যাথির আদিগুরু হ্যানিম্যান্ ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহামনিষীগণ সকলেই পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা একথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সোরা না থাকিলে অপর দুইটি দোষের কোনটিই আসিতে পারে না,—তাহার কারণ এই যে, সোরাই সর্ব্বপ্রথম মানব-মনকে দূষিত ও পঙ্কিল করে, তাহার জন্যই মানব কুকার্য্যের দিকে ধাবিত হয়। প্রথমতঃ যদিও কুমনন ও কুইচ্ছাই

সোরার প্রথম আবির্ভাবের কারণ, কিন্তু একবার সোরার আবির্ভাব হইলে, সোরা "বীজাঙ্কুরবৎ" আবার, মানব-মনকে অতিশয় দূষিত করিয়া ফেলে ও ক্রমে উহাকে কুকার্য্যে যাইবার মতি প্রদান করে। সোরা না থাকিলে পরস্ত্রীর নিকট যাইবার যে **কু-মতলবটি** মানব-মনে প্রথম আসিয়া, তাহার পর সেই মতলব মত কু-কার্য্যে রত করে, সেই কু-মতবলটিই আসিতে পাইত না। এজন্য সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সোরাই সর্ব্বপ্রথম মানবকে আক্রমণ করিয়া তাহার মনটিকে অন্যান্য দোষগুলি আনিবার মত যেন **ক্ষেত্র** তৈয়ার করে। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রকারে মানবদেহের পীড়া সকল জটীল হইতে জটীলতর হইয়া থাকে, তাহার একটু আলোচনা করিয়া প্রসঙ্গমতে আসল বিষয় লিখিত হইবে।

সোরা নিজেই যথেষ্ট রোগলক্ষণ আনিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল রোগ যখন আবার কুচিকিৎসা ও অন্যায় চিকিৎসা জন্য চাপা পড়ে, তখন তাহারা ক্রমেই মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি আক্রমণ করিয়া নানা দুষ্ট লক্ষণ ও জটীল লক্ষণ সকল আনয়ন করে। সোরা নিজে একটি অতি দুষ্ট প্রকৃতির দোষ, ও সেই দোষটির প্রকৃত প্রতীকার না করিয়া নানাপ্রকার উগ্রবীর্য্য ঔষধ সাহায্যে **কেবল বাহিরে প্রকাশিত অবস্থাটি জোর করিয়া লোপ** করিয়া দিলে, ঐ রোগ-শক্তিটি অন্তর্ম্মুখ হইয়া ক্রমে ভিতরের দিকে গতি লাভ করিতে থাকে, ইহার জন্যই **সর্ব্বপ্রথম জটিলতা** আসিয়া থাকে। আবার যখন সোরা অন্য দুইটি দোষের মধ্যে কোনওটির বা ঐ দুইটিরই সাহায্য পায়, তখন ত কথাই নাই। সোরাদুষ্ট দেহে সাইকোসিস্ বা সিফিলিস্ আসিবার পরে পরেই যে সোরার সহিত মিলিত হয়, তাহা নয়। এই মিলন বা মিশ্রণের পূর্ব্বে যদি নবাগত পীড়ার প্রকৃত প্রতীকার করা হয়, তবে **পীড়া** অবস্থাতেই উহা আরোগ্য হইতে পারে এবং **দোষ** রূপে সোরার সহিত মিলিত

হইতে পারে না। কিন্তু হায়! তাহা হয় না। বরং নূতন পীড়াটিকে, জোর করিয়া তাহার **প্রকাশিত লক্ষণ সকলকে** (যথা, গনোরিয়ার স্রাব ও সিফিলিসের প্রাথমিক ক্ষত) **চাপা দিয়া, ঐ ঐ দোষে** পরিণত করিয়া সোরার সহিত মিলিত হইবার সুবিধা দেওয়া হয়। যে দেহে সোরার সহিত অন্য দোষগুলির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহার রোগলক্ষণসকলের জটীলতা কাজেই বৃদ্ধি পায়। অতএব দেখা গেল যে, সোরা নিজেই বহুপ্রকার রোগের কারণ, ঐ সকল রোগলক্ষণকে প্রকৃত আরোগ্য না করিয়া চাপা দিলে অন্য অনেক প্রকার রোগ ও জটীলতা আসে। আবার যদি তাহার সঙ্গে কোনও একটি দোষ মিলিত হয়, তবে জটীলতার যে বৃদ্ধি হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি আছে? তাহার উপর, সোরার সহিত যদি বাকি দুইটি দোষই মিলিত হয়, তবে আরও জটীলতা, এমন কি, অসাধ্য অবস্থা আসাও বিচিত্র নয়। **"চাপা দেওয়া"** চিকিৎসা, ও **দোষের সংখ্যা** এবং **মিলন**—ইহারাই **জটীলতার কারণ**।

দোষের সংখ্যা, অর্থাৎ কোনও দেহে একটী দোষ অর্থাৎ সোরার সহিত আরও একটী আসিলে তাহার যে প্রকার রোগ লক্ষণ ও জটীলতা আশা করা যায়, যদি অন্য দুইটী দোষই সোরার সহিত মিলিত হয়, তবে আরও অনেক প্রকার রোগ লক্ষণ ও অধিকতর জটীলতা আশা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, কেবল সোরাদুষ্ট দেহে অন্য কোনও দোষ আসিয়াই অধিক ক্ষতি করিতে পারে না, কেন না, নবাগত দোষটীকে তখনও স্বতন্ত্রভাবে নষ্ট করিবার উপায় থাকে, তাহা না হইয়া যদি উহা সোরার সহিত মিলিত হইবার অবসর পায়, তবে আরও অধিকতর জটীলতা আসিয়া থাকে। অতএব, চাপা দেওয়া ব্যতীত জটীলতার প্রধানতঃ দুইটী কারণ, (১) **দোষ সকলের সংখ্যা**, এবং (২) উহাদের স্বতন্ত্র অবস্থার পরিবর্ত্তে **মিলন বা মিশ্রণ**।

আবার **মিলন বা মিশ্রণের তারতম্য** অর্থাৎ বিভিন্নতা আছে। নিজদেহে সোরার সহিত অন্য একটী বা দুইটী দোষের মিশ্রণের প্রকৃতি ও ফল এক প্রকার, আবার পিতৃপুরুষের দেহে ঐ মিশ্রণ হইবার পর ঐ মিলিত দোষগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া যে সন্তানসন্ততি জন্মে, সেই সন্তানসন্ততির দেহস্থ মিলিত দোষ সকলের প্রকৃতি ও ফল অতিশয় বিভিন্ন প্রকার। মনে করুন, কোনও ব্যক্তির দেহে কেবলমাত্র সোরা দোষ বর্ত্তমান আছে, এবং পরে সেই ব্যক্তির সাইকোসিস্ বা সিফিলিস্ বা ঐ দুইটী দোষই **অর্জ্জিত** হইয়া সোরার সহিত মিলিত হইল। এই মিলনের এবং যদি ঐ ব্যক্তির সন্তানসন্ততির দেহস্থ **প্রাপ্ত**দোষগুলির মিলনের, তুলনা করা যায়, তবে এই উভয় প্রকার মিলনের অনেক তারতম্য দেখা যায়। কোনও দেহে **অর্জ্জিত** দোষসকলের মিলন অপেক্ষা পিতৃমাতৃদেহের মিলিত দোষ সকল **প্রাপ্ত** হইলে, **প্রাপ্তজাতির** মিলিত দোষ সকল অধিকতর জটীলতা আনয়ন করে এবং অতি ভয়ানক ও দুর্দ্ধর্ষ রোগ সকল জন্মিবার কারণ হইয়া থাকেন। এ তত্ত্ব অতি গভীর এবং দীর্ঘকাল চিকিৎসা ও পর্য্যবেক্ষণ না করিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, সোরার সহিত সাইকোসিস্ **অর্জ্জিত হইয়া মিলিত হইলে** এক প্রকার ফল প্রসব করে, আবার সোরা ও সাইকোসিস্‌যুক্ত পিতামাতা হইতে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহাদের দেহস্থ সোরা ও সাইকোসিসের মিশ্রণ অন্য প্রকার ও আরও জটীলতর ফলপ্রসব করে। সেই প্রকার সোরার সহিত সিফিলিসের মিলন বিষয়েও জানিতে হইবে। আবার সোরার সহিত অন্য দুইটী দোষ **অর্জ্জিত হইয়া মিলন** এবং সন্তানসন্ততিদের শরীরে **মিশ্রণ,**—ইহাদের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শরীরস্থ দোষ সকলের মিশ্রণ জন্য যে প্রকার প্রকৃতি বা রোগ লক্ষণ

উদয় হয়, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে, তাহাদিগের নানা নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা স্ক্রফিউলা, কোথাও বা ষ্ট্রুমা, কোথাও বা টিউবারকুলোসিস্, ইত্যাদি নানা নাম পাওয়া যায়। এজন্য ইহাদের অর্থ সকল আমাদের জানা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এলোপ্যাথিক শাস্ত্রে সোরা, সাইকোসিস বা সিফিলিস্ নামে কোনও দোষ বলিয়া অবধারণ করা হয় নাই। তবে যে সকল শিশু স্বাভাবিকভাবে আদৌ পরিপুষ্ট হয় না, প্রায়ই সর্দ্দি, উদরাময়, জ্বর ইত্যাদি নানা প্রকার রোগে মধ্যে মধ্যে ভুগিতে থাকে, তাহাদের শরীরের অবস্থাটীকে রিকেট্‌স্, স্ক্রফিউলা, ষ্ট্রুমা ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়া থাকে; এবং যে শরীরে ক্ষয়রোগ দেখা দেয়, তাহার ঐ অবস্থাটীকে টিউবারকুলোসিস্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কোনও দোষবিশেষের জন্য কি কি প্রকৃতি ও রোগলক্ষণের আবির্ভাব হয়, ঐ শাস্ত্রে তাহা বিশদভাবে কোনও আলোচনা দেখা যায় না। তবে বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কোনও কোনও প্রাজ্ঞ চিকিৎসক স্থানে স্থানে এ সকল বিষয়ে অনেক আভাস দিয়া গিয়াছেন, যে সকল বিশেষ অনুধাবন ও প্রণিধান যোগ্য। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে, সোরা, সাইকোসিস ও সিফিলিস দোষ সকলই, যাবতীয় প্রাচীন এবং অনেক নূতন ও তরুণ পীড়ার ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আদি গুরু হ্যানিম্যান, বনিংসেন, গ্যারেন্‌সি, কেণ্ট প্রভৃতি মহামনিষী ও সুবিচক্ষণ চিকিৎসক মহাশয়গণ, সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের চিকিৎসাপ্রণালীও ঐ তত্ত্বের পোষক। ইতিপূর্ব্বে, সোরা, সাইকোসিস এবং সিফিলিসের যে সকল চিহ্ন ও নিদর্শন লিখিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা অবশ্যই অনুমান হইবে যে, একটার অধিক দোষ যে শরীরে বর্ত্তমান, তাহাতে নানাপ্রকার জটীলতাযুক্ত রোগলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং **মিশ্রণের তারতম্যে ফলেরও তারতম্য**

ঘটে। যেখানে তিনটী দোষই মিলিত, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ সাবধানে চিকিৎসা করিতে হয় ও ভাবীফল স্থাপন করিতে হয়। আবার সোরার সহিত অন্য দুইটী দোষের **অর্জ্জিত** ভাবের মিলন বরং পথে আছে, কিন্তু **পৈতৃক** মিলনের যে কি প্রকার ফল, তাহা অনুমান করাও কষ্টকর ও ভীতিপ্রদ।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে **ক্ষয়পীড়ার** দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। যে ক্ষয়পীড়ায়, রোগীর বক্ষোপ্রদেশে অর্থাৎ ফুস্ফুসে বা, গলনলীতে অথবা অন্ত্রে, **ক্ষত ও, পচন** থাকে, তাহাকে **টিউবারকুলোসিস** বলে; পরন্তু, যে ক্ষয়রোগীর তাহা থাকে না, কেবলমাত্র সার্ব্বাঙ্গীন **ক্ষয়** অর্থাৎ **ক্রমিক শীর্ণতা** প্রকাশ পায়, তাহাকে সাধারণ **ক্ষয়পীড়া** (Consumtion or Phthisis) বলা যায়। অবশ্য উভয় প্রকার বিকাশই **ক্ষয়যুক্ত ও মরণোন্মুখী**, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আজ কালের **ক্ষতযুক্ত** ক্ষয়পীড়াটী বহুপূর্ব্বে ছিল না, এজন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কেবল "রাজযক্ষ্মা" বা "ক্ষয়রোগ" শব্দেরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষতযুক্ত অর্থাৎ প্রকৃত টিউবারকুলোসিসের কারণ,— **পিতৃদেহে মিলিত সোরা ও সিফিলিস দোষ, পুত্রের দেহে টিউবারকুলোসিস্‌রূপে বিকাশ পাইয়া থাকে।** ক্ষতহীন ক্ষয়-পীড়াটীর কারণ কেবল মাত্র **সোরা** বা **সাইকো-সোরা**। **অর্জ্জিত** সিফিলিস দোষটী সোরাদোষের সহিত মিলিত হইয়া **সিউডো-সোরা** (Pseudo-Psora) নাম গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা কখনও টিউবারকুলোসিসে পরিণত হয় না। **পিতৃদেহে মিলিত** সোরা ও সিফিলিস প্রাপ্ত হইলে, পুত্রের টিউবারকুলোসিস্ বিকাশ পায়। পিতৃদেহের মধ্যে **মিলনটী ঔরসপথে** পুত্রের দেহে আসিয়া খুবই শক্তিশালী হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সিফিলিস্ পীড়া ছিল না, এজন্য আধুনিক কবিরাজী-গ্রন্থে ইহাকে "ফেরঙ্গ ব্যাধি" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা।

৫ম ভাগ

প্রাচীন পীড়ার রোগীতত্ত্ব।

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা করিতে করিতে রোগীর বিষয় অতি বিচক্ষণতা ও মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনেক অভিনব নীতি ও তত্ত্বসকল হৃদয়ে স্বতঃই স্ফুরিত হয়। সত্য নিজের আলোকে নিজেই দীপ্তীমান, অর্থাৎ ইহা আপনিই মনে প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসাকালে, ঐ সকল তত্ত্ব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব আদিগুরু হ্যানিম্যানের মনে ঐরূপ ভাবেই প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ও তাঁহার পথানুসরণকারী সকলেরই মনে ঐ ভাবেই সত্য স্ফুরণ হওয়া উচিত ও হইয়াও থাকে, তবে কেবল যাঁহারা পবিত্রভাবে ইহার নীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই উহা আশা করিতে পারেন, অন্যে পারেন না। আসল কথা, যে পথেই হউক, সত্য অনুসরণ করিলে, সত্যের আলোকই ক্রমে পথ দেখাইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রোগীতত্ত্ব সকল লিখিতে যাইবার পূর্ব্বে একটী নিবেদন করিতেছি। রোগীলিপিতে অনেক অবান্তর কথা থাকে, সেগুলি অনেক সময় লিখিতে বাধ্য হইতে হয়, মনে হয়, কি জানি, ঔষধ নির্ব্বাচন করিবার সময় কাজে লাগে। ফলতঃ অনেক বাজে কথা তাহার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে। এখানে যে সকল রোগীতত্ত্ব দেওয়া হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল অবান্তর কথা বাদ দিয়া যে গুলি প্রকৃতপক্ষে কাজের কথা ও যে গুলি রোগীর চিকিৎসার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই গুলি লিখিত হইতেছে।

এই সকল রোগীতত্ত্ব হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া না পড়িলে ও বার বার না পড়িলে, সেগুলি হৃদয়ঙ্গম হয়, না। অভ্যাস, সকল কাজের মূলশক্তি। কোনও তত্ত্বের বার বার আলোচনা করিলে যখন উহা নিজের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়, তখন সেটী শিক্ষা হইয়াছে, বলা যায়। নতুবা উপরে উপরে চলিলে ভিতরের সার পাওয়া যায় না।

১নং রোগী—বাতরোগ ও আংশিক পক্ষাঘাত।

শ্রীমতী ... ... দেবী, একটী জমিদার কন্যা, বয়স, ২৭।২৮, ৩টী কন্যা ও ১টী পুত্রের জননী, গতবার কন্যা হওয়ার পর হইতে এই রোগ হইয়াছে। **পিতার সিফিলিসের দোষ** ছিল, স্বামীপক্ষে কোনও দোষ ছিল না। রোগিণী দেখিতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, স্থূলাকায়া, "সাংসারিক কাজকর্ম্মে তত বিশেষ পটু ছিলেন না, উপস্থিত রোগের জন্য প্রায়ই শয্যাশায়িনী।"

লক্ষণ-সমষ্টি—প্রধান কথা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, এবং তৎসঙ্গে অস্থির ভাব, বিশেষতঃ রাত্রে, সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই তাঁহার সকল কষ্টের বৃদ্ধি এমন কি, রাত্রির নাম করিলেই প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হয়। কোমরে ভয়ানক বাতের যন্ত্রণা, জ্বালা, কোমরে এত যাতনা যে, তাহার জন্য মধ্যে মধ্যে সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে। বিনা কারণে বা সামান্য কারণেই প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনে হয় কি জানি কি ঘটিবে। মধ্যে মধ্যে মাথা ঘোরে, ১১ই বৈশাখ, মাথা ঘোরার জন্য পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং সিড়িতে ডান ধারের একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আহারের বড় ইচ্ছা নাই, তবে আহার করিতে হয় তাই করেন, মাত্র। পিপাসা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। বাতের বেদনা বোধ হয় ভোরের সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, কিন্তু সমস্ত রাত্রিই বেদনার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। শীত

গ্রীষ্ম বর্ষায় প্রায় সমানই। বেদনার প্রকৃতি,—খোচা মারা, চিড়িক্মারা, জ্বালা, অস্থিরতা ইত্যাদি। মাথা সর্ব্বদা ভার হইয়াই থাকে, কথনও পরিষ্কার হয় না। সকল পার্শ্বেই শুইতে পারেন, কোনও তফাৎ নাই। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল, সর্ব্বপ্রথম পক্ষাঘাতের সূত্রপাত হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও স্থান অবশ হইয়া যাওয়া, তথন হইতেই হইয়াছে। ঐ তারিখে তাঁহার পিত্রালয়ের কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ আসায় তাঁহার মনকে একেবারে উদ্বেলিত করিয়া তোলে এবং তাহার পর যেন দক্ষিণ অঙ্গটা অবশ হইয়া গেল, নাড়িতে পারা যাইত না, বাম হাত দিয়া ডান হাতটাকে নাড়িতে হইত। কবিরাজী তৈল ও ঔষধাদি ব্যবহার করায় প্রায় দুই মাসের পর ভাল হইয়াছিলেন। নিত্যস্নান করিবার প্রবৃত্তি হয়, তবে স্নান করিলে যেন বৃদ্ধি হয় মনে করেন।

উপরের লক্ষণসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। চিকিৎসা কবিরাজী ব্যতীত কিছুই হয় নাই। তাহাতে স্থায়ী উপকার হয় নাই। রোগিণীর মানসিক লক্ষণ ধরিয়া **কষ্টিকামই** নির্ব্বাচিত হইল। তাহার সঙ্গে কোমরের বেদনা থাকায়, ঐ ঔষধই ঠিক হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করি। ১৯১৫।৭ই ডিসেম্বর, কষ্টিকাম্—২০০, ১ মাত্রা।

১৫।১২,—কোনও পরিবর্ত্তন নাই। আর এক মাত্রা ঐ; কিন্তু ২২।১২ পর্য্যন্ত কোন ফল না পাইয়া কষ্টিকাম্—১০০০, ১ মাত্রা দেওয়া হয়। ৭।১।১৬—কোনও পরিবর্ত্তন নাই, **সালফার** ১০০০ একমাত্রা। ২২।১ রোগীণীর প্রায় উন্মাদের ন্যায় লক্ষণ সকল আসিয়াছে, এবং অত্যন্ত ভয়ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্বামী আমাকে যাইতে কহিলেন— আমি গিয়া বিশেষ কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না, তবে ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে, ঠিক করিয়া, কতকগুলি প্লাসেবো ডোজ্, নিত্যপ্রাতে ও সন্ধ্যায় দিবার জন্য দিয়া আসিলাম এবং রোগীণীকে যেন কোন প্রকারেই

একা রাখা না হয়, সে বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া, ফিরিয়া আসিয়া রোগিণীর ঔষধ ও লিপি ভাল করিয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। ৩১।১ সংবাদ আসিল যে রোগিণীর প্রচুর শ্বেতপ্রদর স্রাব হইয়া মনের ঠিক হইয়াছে ও 'নিত্য দুইবার করিয়া যে ঔষধ খাইতে দেওয়া হইয়াছে, সেই ঔষধ উৎকৃষ্ট ফল দিয়াছে, যেন সেই আসল ঔষধই দেওয়া হয়, পূর্ব্বের ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। বলা বাহুল্য, আমিও তাহাই করিলাম, ১৫ দিনের জন্য সেই ঔষধ পাঠাইয়া দিলাম।

১৩।২—শ্বেতপ্রদরের স্রাব অনেকটা কম হইয়া আসিতেছে এবং মনের বেশ ঠিক হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ স্ফুর্ত্তিও হইয়াছে। ঔষধ—প্লাসেবো। ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, শ্বেতপ্রদর নূতন লক্ষণ নয়,—পূর্ব্বে হইয়াছিল, কবিরাজীতে ভাল হয়। ২৪।২ সংবাদ পাইলাম যে পূর্ব্বেকার লক্ষণ সব অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রদর স্রাব আর নাই। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপা ও অতিশয় দুর্ব্বলতা এবং বিষণ্ণভাব, রাত্রে এত কষ্ট যে, রাত্রিকাটান অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে,—বিশেষতঃ কোমরব্যথার জন্য। **কষ্টিকাম্**—৫০ এম, এক মাত্রা দেওয়া হইল, এবং কহিয়া দেওয়া গেল যে, কোনও প্রকার বৃদ্ধি লক্ষণ দেখা দিলে যেন বিশেষ উৎকণ্ঠিত না হয়েন। এক মাসের মত প্লাসিবোর মোড়ক দিলাম।

২৫।৩—বিশেষ উন্নতিও নাই, বৃদ্ধিও কিছু নাই, তবে মোটামুটী একটু ভালই বোধ হইতেছে। ঔষধ আর এক মাসের মত প্লাসিবো।

১৩।৪—রোগিণীর মূল পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে, তবে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা বড় বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেবল ঠাণ্ডায় থাকিতে চান ও অস্থিরতা বিশেষতঃ রাত্রে। ঔষধ প্লাসিবো।

১৫।৪—দ্রুত সংবাদ আসিল। রোগিণী রাত্রে নিদ্রার সময় হঠাৎ পালঙ্গপোষ হইতে পড়িয়া গিয়া নাকে আঘাত লাগে ও অতিশয় রক্তস্রাব

হইতেছে, বেলা ৯টা পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ হয় নাই। এজন্য হোমিওপ্যাথি কোনও ঔষধ না দিয়া কেবল জলপটী নাকের ও কপালের উপর দিতে কহিলাম এবং "আসল ঔষধ" ৪ মোড়ক এক ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেওয়া হইল। রক্ত বন্ধ হইলে সংবাদ দিতে হইবে। সন্ধ্যায় সংবাদ পাইলাম, রক্ত বন্ধ হইয়াছে।

১৮।৫—রোগিণী বেশ ভাল আছেন, কটীদেশে বাতের বেদনা কেবল সামান্য আছে, রাত্রিতেই একটু বাড়ে, দেহে জ্বালাবোধ, এ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বেশ ভালই আছে। ঔষধ দেওয়া হইল না।

২৫।৫—আবার বৃদ্ধি লক্ষণ দেখা দিল, ইহাতে রোগিণীর স্বামী বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, ঔষধের স্থলে, কিছু উপদেশ ও প্লাসিবো।

২৯।৫—রোগিণীকে দেখিয়া জানিলাম, প্রায় সকল লক্ষণেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়াছে. **কষ্টিকাম্, সি, এম।**

১১।৮—কষ্টিকাম্ সি, এম, দিবার পর হইতে বেশ ভালই ছিলেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতে ছিলাম, এই দিন সংবাদ আসিল যে, রোগিণীর কতকগুলি শুষ্ক চুলকানি ছাড়া আর অন্য কোনও রোগ নাই। ইহার পর আর কোনও ঔষধ দিতে হয় নাই। রোগিণী বেশ ভাল আছেন।

মন্তব্য—১ কথা।—রোগিণীর যদিও সকল লক্ষণই প্রায়ই কষ্টিকামের, তবুও যেন সালফার পড়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রিয়ারম্ভ হয় নাই। কেন? ইহার কারণ কষ্টিকাম্ একটী গভীর কার্য্যকরী এণ্টিসোরিক ঔষধ হইলেও আরও গভীরতর ঔষধের প্রয়োজন, এজন্য কষ্টিকামের পর সালফার দেওয়া হইল। কিন্তু যদি কষ্টিকামই **নিশ্চিত ঔষধ বলিয়া ঠিক ধারণা** না থাকিত, তবে এস্থলে ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবার প্রবৃত্ত হইত, এবং অন্য ঔষধ দিলে অন্যায় করা হইত।

২য় কথা,—শ্বেতপ্রদর রোগটী চাপা থাকায় ঔষধের ক্রিয়ায় বাহির

হইল এবং উন্মাদ লক্ষণ বাহির হওয়ায়, মনে "নূতন লক্ষণ" বলিয়া শঙ্কা করা উচিত ছিল, কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বনে দেখা গেল যে, উহা নূতন লক্ষণ নয়। শ্বেতপ্রদরই আগে বাহির হইত, কিন্তু সালফার ১০০০ দেওয়ায় মানসিক লক্ষণটী সালফারের বৃদ্ধি বলিয়া জানা গেল,—যদি সালফার ১০০০ না দিয়া ২০০ কিম্বা ৫০০ শক্তি দেওয়া হইত, তবে বোধ হয় উন্মাদ লক্ষণ দেখা দিত না, এবং আরও পূর্ব্বে প্রদর দেখা যাইত, এখানে সালফার ১০০০ দেওয়া সঙ্গত হয় নাই—২০০ দিলেই, বোধ হয়, যথেষ্ট হইত।

৩য় কথা—উন্মাদের সঙ্গে মুখের ও চক্ষের কোনও আকারগত পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই, কাজেই কুলজ সিফিলিস দোষের যোগ বলিয়া (ভ্রম হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও) ধারণা করিবার কারণ ছিল না। কেবল মানসিক চঞ্চলতা ও একটু যেন বিব্রতভাব ব্যতীত এমন বিশেষ কোনও উন্মাদ লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই।

৪র্থ কথা—রোগিণীর শরীরে সিফিলিস দোষ বর্ত্তমান আছে ও থাকিয়াই গেল, কেননা এণ্টিসিফিলিটিক্ কোনও ঔষধ লক্ষণাভাবে দিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই।

২নং রোগী,—প্রদরের পীড়া, গ্রহণী ও শিরঃপীড়া।

শ্রীমতী............দাসী, বয়স ৪১ বৎসর, প্রায় ১২।১৪ বৎসর হইল রোগের সূত্রপাত হইয়াছে। রোগিণী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন। বিশেষতঃ সম্প্রতি কবিরাজী চিকিৎসায় আহারাদি অতিশয় কড়াকড়ির জন্য দেহ আরও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে।

লক্ষণ-সমষ্টি :—"সর্ব্বদাই শ্বেত প্রদরের স্রাব চলিতেছে, তাহার সঙ্গে শিরঃপীড়া জন্য বড় কষ্ট হয়, গ্রহণীরোগ বাল্যকাল হইতেই

আছে। কখনও কখনও সহজ মল যে না হয়, তবে একটু কিছু সামান্য ভাবেও আহারাদির ব্যতিক্রম হইলেই, ৩।৪ বার পাতলা মলত্যাগ হইয়া থাকে। ক্রমেই ঐটী বাড়িয়া এখন আর আহারীয় কোন জিনিসই প্রায় হজম হয় না। মুখে ঘা বরাবরই আছে। ঘায়ের জন্য যে কোনও জিনিস খাইবার সময় এত জ্বালা করে যে, ক্ষুধা থাকিতেও খাইতে বিরত হইতে হয়। সোয়াস্তিভাব কখনই নাই, তবে খাবার সময় কষ্ট দেখিলে লোকে কান্দিয়া ফেলে।" তিনি নিজে আর কোনও কিছু বলিতে না পারায় আমাকে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি জিজ্ঞাসার দ্বারা জানিতে হইল। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম যে—তিনি কোনও সময়েই শান্তি পান নাই, আহারের সময় বড়ই কষ্ট, যেহেতু জল পর্য্যন্ত সকল জিনিসই ঝাল বোধ হয়। মেজাজটী বড়ই খিটখিটে। হঠাৎ যদি সামান্য শব্দও হয়, তবে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয়। অন্য বিশেষ কিছু আর পাইলাম না।

আমি রোগিণীকে **বোর‍্যাক্স**,—২০০ শক্তি দিলাম, দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোনও ফল না পাইয়া আর এক মাত্রা ২০০ শক্তি দেওয়া হয়। ফলতঃ বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। আরও ১৫ দিন অপেক্ষার পরে ফল না পাইয়া এবং বিশেষ কোনও কারণ ঠিক করিতে না পারিয়া অথচ রোগিণীর অতিশয় দুর্ব্বল অবস্থার জন্য আরও উর্দ্ধতর শক্তি দিতে সাহস না হওয়ায়—বোর‍্যাক্স ২০০ জলে ২।৪টী বটীকা ফেলিয়া, এক দিন অন্তর, প্রাতে এক মাত্রা করিয়া দিতে ব্যবস্থা করিলাম। এইরূপ চারি মাত্রা দিবার পর রোগিণী কহিলেন, "কি জানি কেন, আমার সামান্য ভাল বোধ হইতেছে।" ঔষধ বন্ধ করিলাম। ১৫ দিন পর, ১৭ই জুলাই—আমি রোগিণীকে দেখিতে যাই এবং তাঁহার মানসিক উন্নতির আভাস পাইলাম। ঔষধ বন্ধ রাখাই স্থির করিলাম। ১৫ দিনের মত প্লাসিবো।

৩রা আগষ্ট—বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন পাইলাম না। **বোর‍্যাক্স**—

৫০০, ঘন ঘন, অর্থাৎ প্রাতে এক বার, সন্ধ্যায় এক বার এবং তাহার পরদিন প্রাতে এক বার দেওয়া হয়। তাহার পর ১৫ দিনের মত ফাইটাম্।

২০শে আগষ্ট—রোগিণীর অন্যান্য সকল বিষয়ই ভাল বোধ হইতেছে, তবে তাঁহার মূল রোগের অর্থাৎ প্রদরের কোনও পরিবর্ত্তন নাই। ঔষধ বন্ধ, ফাইটাম এক মাসের মত।

১৭ই সেপ্টেম্বর—রোগিণীর যে উন্নতি বোধ হইতেছিল তাহা আর নাই। **বোর‍্যাক্স**—১০,০০০, নিত্য একবার করিয়া ৪ দিন প্রাতে, এবং ১ মাসের মত ফাইটাম্।

২৫শে সেপ্টেম্বর—তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য জেদ করিয়াছেন, অত্যন্ত বৃদ্ধি। গিয়া দেখিলাম—ঔষধের বৃদ্ধি, তবে সহ্য করিতে পারিতেছেন এবং তাঁহার সমস্ত রোগলক্ষণেরই বৃদ্ধি, অন্য **নূতন লক্ষণ** একটীও নাই। তখনই ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ, কাজেই নূতন করিয়া ফাইটামের মোড়ক কতকগুলি চারি ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হইল এবং উপশম বোধ হইলে, সকালে ও সন্ধ্যায় দিতে হইবে বলিয়া আসিলাম।

৩০শে সেপ্টেম্বর—বৃদ্ধিলক্ষণ প্রায় গিয়াছে, অনেকটা ভাল আছেন—"যথা সময়ে ঘন ঘন ঔষধ দেওয়ায় সে যাত্রা রোগিণীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।" দুই মাসের মত,—এক দিন অন্তর, ফাইটাম্।

১৩ই ডিসেম্বর—সংবাদ আসিল, রোগিণীর মুখের ঘা ঠাণ্ডা লাগিয়া বোধ হয় বাড়িয়াছে, এবং প্রদরও যেন মধ্যে অনেকটা ভাল থাকার পর বৃদ্ধি পাইয়াছে। **বোর‍্যাক্স**—১০,০০০ এক মাত্রা, আবশ্যক হইলেই সংবাদ, এক মাসের মত ফাইটাম্।

১১ই ডিসেম্বর—বিশেষ "confidential" অর্থাৎ "গোপনভাবে" একখানি পত্র পাইলাম যে, রোগিণী যদিও অনেক দিকে ভালই আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রদরস্রাবে ও ঘর্ম্মে কেন অতিশয় গন্ধ হইয়াছে, এজন্য

সকলে বিশেষতঃ রোগিণী অতিশয় ভীত হইয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা— ভিতরে বোধ হয় কিছু পচিয়া গিয়া থাকিবে। আমি যাইয়া কোনও ঔষধ দিবার আবশ্যক মনে করি নাই।

১৬ই মার্চ্চ—রোগিণী বেশ ভাল আছেন, তবে ঘর্ম্মে, বিশেষতঃ হাতে পায়ে ঘাম দিলে দুর্গন্ধ হওয়া যায় নাই এবং প্রদরের স্রাব এখনও সামান্য সামান্য আছে। **স্যানিকিউলা**—১০,০০০ এক মাত্রা।

আর কোনও ঔষধ দিতে হয় নাই।

মন্তব্য—১ম কথা—রোগিণী বড দুর্ব্বল, বিশেষতঃ মানসিক দৌর্ব্বল্য বড বেশী ছিল, এজন্য সর্ব্বপ্রথমেই উচ্চ শক্তি দিতে সাহস হয় নাই। **শারীরিক** দুর্ব্বলতা অপেক্ষা যদি **স্নায়বিক** দৌর্ব্বল্য অধিক থাকে, তবে প্রথমেই উচ্চশক্তি কখনও দিতে নাই। এস্থলে, রোগিণী সামান্য শব্দেই যখন কাতর হইতেন, তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াগত দৌর্ব্বল্য, কাজেই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যথেষ্ট ছিল।

২য় কথা—বোর‍্যাক্সের নির্ব্বাচন বিষয়ে যদি সন্দেহ থাকিত, তবে ১৭ই জুলাই বা ৩রা আগষ্ট, ঔষধ পরিবর্ত্তন করা হইত এবং তাহাতে রোগিণীর আরোগ্য বিষয়ে বাধাপ্রদান হইত। চিকিৎসকের **আত্ম-নির্ভরতা বিশেষ প্রয়োজন**, এবং তাহা প্রায়ই মেটিরিয়া মেডিকার যথেষ্ট জ্ঞান থাকার উপর নির্ভর করে।

৩নং রোগী—শূলব্যথা ও শিরঃপীড়া।

শ্রীযুক্ত............কর্ম্মকার, বয়স, ৩০।৩২, ২১ বৎসর বয়সে গনোরিয়া হইয়াছিল, স্থানীয় কোনও হাতুড়ে কবিরাজের চিকিৎসা দ্বারা ভাল হইয়াছিল, তাহার পর বরাবর একপ্রকার ভালই ছিল, গত ৩ বৎসর হইতে শূলবেদনা হইয়াছে। পূর্ব্বে কমই হইত, কিন্তু গত বৈশাখ

মাস হইতে অতিশয় বাড়াবাড়ি হওয়ায়, শ্রাবণ মাসে আমার চিকিৎসাধীনে আসে। **লক্ষণ,**—শূলব্যথা, ঠিক বক্ষঃস্থলের নীচে, নাভীর উপরে,—খোঁচা মারা ব্যথা, হুলফুটান ব্যথা, পেটটী টিপিয়া ধরিলে, উবুড় হইয়া শুইলে, গরম বোতলে বা গরম কোনও জিনিষ চাপাইলে, উপশম বোধ হয়। সময়ের বড় ঠিক নাই, তবে বৈকালের দিকে প্রায়ই হইয়া থাকে। গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করিলে পেটবেদনাটী ভাল হইয়া যায়। রাত্রে আহার করিলে ভোরের দিকে কখনও কখনও জানায় কিন্তু, বৈকালের দিকে হইলেই বেশী হয়। অন্য সময়েও হয়, তবে সাধারণতঃ বৈকালে অনেক সময় কিছুতেই কোনও আরাম না পাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় এবং অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর কতকগুলি **অধোবায়ু নিঃসরণ হইলে, তখনই শরীর ভালবোধ হইয়া থাকে।** ঠাণ্ডার দিনে বড় কষ্ট বোধ হয়, ঠাণ্ডা সহ্য করিতে আদৌ পারে না। পূর্ব্বে এতটা ছিল না, কিন্তু "ধাতের ব্যারাম" হওয়ার পর হইতে ঠাণ্ডা সহ্য করা অসম্ভব হইয়াছে। কামারশালে কাজ করিবার সময় আগুণের তাপ ভাল লাগে।

ঔষধ—**ম্যাগ্‌নেসিয়া ফস্‌**—২০০ শক্তি নিত্য একবার প্রাতে, তিন মাত্রা। কোনও ফল পাইলাম না। ৪।৫ বার করিয়া নিত্যই ব্যথা হইতে থাকে। ৩০ শক্তি দুই দিন দিবার পর একটু ভালবোধ হয়, তিন দিন একটু ভাল থাকার পর, আবার নিত্যই ৪।৫ বার করিয়া হইতে থাকিল। এইরূপ ৩০ ও ২০০ শক্তি বার বার দিবাব পরও কোন ফল হইল না। **সালফার** ৩০ ও ২০০, কোনও ফল নাই। এ অবস্থায় রোগী অতিশয় কাতর হইতে লাগিল এবং হোমিওপ্যাথি ত্যাগ করিয়া ইন্‌জেক্‌সেন লইবার জন্য তাহাকে গৃহস্থের লোকেরা বিব্রত করে। আমি তাহাকে ইতিমধ্যে একমাত্রা **থুজা** ২০০ দিলাম, তাহাতে ৫।৬ দিন ব্যথা হইল না। **থুজা** ২০০ পুনরায় দিবার পর কোনও ফল আর পাওয়া গেল না।

আমি রোগীকে ও তাহার বাড়ীর লোককে স্থির হইবার জন্য উপদেশাদি দিয়া কেলি-কার্ব্ব ১০০০ একমাত্রা দিয়া, কি উপায়ে তাহার লুপ্ত গনোরিয়া পুনরায় প্রকাশ করিতে পায়া যায়, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য কথা, কেলি-কার্ব্ব দিবার পরদিন হইতেই আস্তে আস্তে পেটের বেদনা যেমন কম হইতে লাগিল, এদিকে তাহার গনোরিয়া স্রাবটী দেখা দিতে লাগিল এবং ১৫।১৬ দিন পরে আর সে ব্যক্তি শূলবোগী রহিল না,—এক্ষণে গনোরিয়ারোগী হইয়া দাঁড়াইল। আমি আর কোনও ঔষধ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া এক শিশি ফাইটাম্ দিলাম, প্রাতে ও সন্ধ্যায় খাইবে। স্রাব চলিতেছে, উহার সঙ্গে আবার একটি উপসর্গ আসিয়া দেখা দিল,—তাহার শিরঃপীড়া,—কিন্তু জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, তাহার "গনোরিয়ার পূর্ব্বে শিরঃপীড়া ছিল, ঠিক এই প্রকারই ছিল, তাহা গনোরিয়ার জন্য কিম্বা কবিরাজী ঔষধ খাওয়ার ফলে আর জানিতে পারে নাই।" প্রায় দুইমাস ধরিয়া স্রাব ও শিরঃপীড়া চলিয়া, স্রাব বন্ধ হইল, কিন্তু শিরঃপীড়া চলিতে থাকিল। কোনও ঔষধ নাই। আরও একমাস পরে শিরঃপীড়া গেল, স্রাব ত, ইতিপূর্ব্বেই গিয়াছে, কিন্তু আবার পেটের ব্যথা ফিরিয়া আসিল, দেখিয়া কেলি-কার্ব্ব ১০০০, আর একমাত্রা! ১০।১২ দিন অপেক্ষায় কোনও ফল না পাইয়া কেলিকার্ব্ব ১০০০ আরও একমাত্রা দিয়া, প্রায় এক মাস অপেক্ষা করাতেও কোন ফল নাই। কেলি-কার্ব্ব ১০ এম তিন দিন তিন মাত্রা দিবার ৭।৮ দিন পরে স্রাব পুনরায় দেখা দিল, শিরঃপীড়া আসিল, পেটের ব্যথাও ভাল হইল। এরূপ ভাবে প্রায় ছয় মাসের অধিক দিন ধরিয়া আসা যাওয়া চলিতে থাকে। অর্থাৎ কোনও দিন ভাল, কোনও দিন মন্দ থাকিয়া, শেষে তিনটীই অপসারিত হইল এবং ইহার পর অর্থাৎ যখন আর কোনও কষ্ট বা লক্ষণ রহিল না, তখন পুনরায় লক্ষণ-সমষ্টির আবর্ত্তন হয় কিনা

জানাইবার জন্য উপদেশ দিয়া সকল ঔষধ বন্ধ করা হইল। ফলতঃ আর সংবাদ আসে নাই, এবং বরাবরই ভাল থাকার সংবাদ পাইয়াছি।

মন্তব্য।—(১) সাইকোটীক্ রোগীর **নিজার্জ্জিত** গনোরিয়া হইলে, তাহার **স্রাবটী পুনরাগমন না করিলে তাহাকে আরোগ্য বলা যায় না।**

(২) এই রোগীর ক্রমপশ্চাৎগতিতে লক্ষণগুলির পুনরাবির্ভাব হইবার ব্যাপার বড় চমৎকার।

(৩) এখানে স্থানীয় লক্ষণের এবং রোগীর নিজের ধাতুগত লক্ষণের হ্রাসবৃদ্ধির কোনও বৈষম্য ছিল না, অর্থাৎ রোগীর বেদনাস্থানেও গরম স্বেদাদি উপশম করে এবং রোগী নিজেও গরমই ভালবাসে, এই যে রোগীর নিজের গরম ভালবাসা, ইহা তাহার গণোরিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে ছিল না, কাজেই ইহা অতি মূল্যবান্ লক্ষণ। যাহা হউক, শরীরের পীড়াস্থানের হ্রাসবৃদ্ধি এবং রোগীর নিজের ধাতুগত হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষণের মধ্যে বৈষম্য থাকিলে, ধাতুগত লক্ষণই প্রাধান্য পাইত এবং তদনুসারেই ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইত।

(৪) "অধোবায়ুর সামান্য নিঃসরণেও উপশম",—এটী কেলি কার্ব্বের বিশিষ্ট ও নিদর্শক লক্ষণ।

(৫) রোগীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা নিম্নতর শক্তিতে বেশ লক্ষিত না হওয়ায় কেলি কার্ব্ব প্রথমেই ১০০০ শক্তি দেওয়া হয়। যখন ১০০০ শক্তিতে আর প্রতিক্রিয়া হইল না, তখন ১০ এম দিবার ক্ষেত্র উপস্থিত হইল। যদি ১০ এম এর পর, অনেক পরে, লক্ষণশূন্যতার অবস্থারও পরে, আবার আবর্ত্তন হইত, তবে সি-এম দিবার ক্ষেত্র হইত, কিন্তু তাহা হইল না। ফলতঃ **ইহার দ্বারা জানা গেল না,**—যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল কিনা। পুনরাবর্ত্তনটী **বন্ধ হইবার** 'পর আরও একটী উচ্চতর শক্তির প্রয়োগ হইবার পরেও, যদি লক্ষণ আবর্ত্তন

না পাওয়া যাইত, তবেই 'নিশ্চয় জানা যাইত যে রোগী আরোগ্য হইয়াছে। **ইহাই বৈজ্ঞানিক সত্য।**

*৪নং রোগী,—জরায়ুর মুখে টিউমার এবং অর্শোপীড়া।

শ্রীমতী..............দাসী, বয়স ৪৩ বৎসর, ৩টী কন্যার মাতা, ৩য় কন্যা আজ ৭ বৎসর হইল হইয়াছে। ৩টী কন্যা ২ বৎসর পরে পরে হইয়া গত ৭ বৎসর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। উপস্থিত পীড়া,—অর্শ হইতে রক্তস্রাব ও যাতনা এবং জরায়ুব মুখে টিউমার হইয়াছে। ১৯১৭। জুন মাস,—আমার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হন।

রোগিণীর পীড়া ও চিকিৎসার ইতিহাস এখানে বলা প্রয়োজন, এজন্য লিখিলাম। "১৯ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রথম গর্ভ হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে আমি যেন বেশ ভালই ছিলাম, আমার ১ম কন্যার জন্মের পর হইতেই যাবতীয় রোগের সূত্রপাত হইয়াছে। ১ম কন্যার জন্মের ৭ মাস পরে ঋতু হইয়াছিল, সেবার এত যন্ত্রণা হইয়াছিল যে, মনে করিলে আমার প্রাণ এখনও শিহরিয়া উঠে। এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকা হয়, তিনি ঔষধাদি দিবার ফলে, আমি তিন দিন দারুণ যাতনার পর একটু শান্তি পাইয়াছিলাম ও আমার অস্থিরতার অবসান হয়। স্রাব আদৌ হয় নাই। অথবা অতি কেবলমাত্র সামান্য সামান্য রক্তের দাগ লাগিয়াছিল। সে যন্ত্রণা,—কাটিয়া ফেলা, ছিঁড়িয়া ফেলা, ছুঁচ ফোটা এবং তৎসঙ্গে কম্প, এই সকল লক্ষণ ছিল। যাহা হউক তাহার পরের মাসেও ঐ প্রকার যাতনা, ঐ ডাক্তার বাবু আসিয়া কতকগুলি গরম জলের বোতল পেটে দেওয়াইয়া ঔষধ খাইতে দিলেন। আমাদের মনে আছে যে, যাহাতে বেশ যথেষ্টরূপে রক্তস্রাব হয়, সেই ভাবেরই ঔষধ দেওয়া হয়। ডাক্তার বাবু

যত্নের কোনও ত্রুটী করিলেন না, ফলতঃ অবস্থাটী প্রায় গত মাসের মতই হইল, কিন্তু যাতনা আরও বেশী, অর্থাৎ এবার ঔষধের দ্বারা সেরূপ উপশম হইল না। ৩য় মাসেও ঐ প্রকার, এবার দুইটী পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা হইল। ৩।৪ মাস ব্যবহার করিয়াও কোন ফল না পাইয়া কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাসের চিকিৎসাধীনে থাকি। প্রায় ৮ মাস তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া যাতনার কোনও উপশম পাই নাই, যদিও রক্তস্রাবের পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইতেছিল মাত্র। তাহার পর, সেখানে কবিরাজী চিকিৎসা, পরে আবার এলোপ্যাথি চিকিৎসা, ইত্যাদি অনেক প্রকার হইয়াছিল, ইতিমধ্যে ২য় কন্যা গর্ভে আসিল। প্রসবের ছয় মাস পরে আবার ঐ প্রকার কষ্ট, এবার তাহার সঙ্গে আরও একটী উপসর্গ আসিয়া দেখা দিল,—সেটী অর্শ। অর্শ কাহাকে বলে তাহা জানিতাম না, কেন না, আমার পিতামাতার কি কোনও ভাইবোনের এ রোগ হয় নাই এবং আমি কাহারও এ অসুখ দেখি নাই। আবার, আমার অদৃষ্টগুণে এরূপ দাঁড়াইল যে দুইটী ঋতুকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্শের যাতনা ও অল্প অল্প রক্তস্রাব হইত,—যাতনাই অধিক, স্রাব তত নাই। ঋতুস্রাবও প্রায় হইত না, কেবল যাতনা। এ সময় আমার বাবা আমায় এক সময় দেখিতে আসিয়া, অগত্যা মেডিকেল কলেজে থাকিয়াও যদি চিকিৎসার সুবিধা হয়, তাহাও চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। আমার স্বামী মহাশয়কে আমার এই অসুখের জন্য যে কত কষ্ট ও খরচ বহন করিতে হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে আমি একটী কুঠরী ভাড়া করিয়া প্রায় ছয় মাস ছিলাম, ও নানাপ্রকার চিকিৎসা হইয়াছে এবং কত প্রকারের পেটেণ্ট ঔষধ যে ডাক্তার বাবুদের উপদেশে আমায় খাওয়ান হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহা হউক কোনও চিকিৎসায় ও কোনও ঔষধেই ফল না পাইয়া প্রায় এক বৎসর কাল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সকলেই উপদেশ দেওয়ায় ওয়ালটিয়ারে গিয়া

ছিলাম। সেখানে জল বায়ুর গুণে অন্য দিকে আমার দেহের উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে অতি অল্পদিন থাকার পরেই আমার ৩য় বার গর্ভ হয়। কাজেই ঋতুর সম্বন্ধে উন্নতি অবনতি বুঝিবার উপায় ছিল না। আবার প্রসবের পর আট মাসের মধ্যেই ঋতু খোলে। আশ্চর্য্য কথা, সেই সকল পীড়ার যাতনা ঠিক পূর্ব্ববৎ; তবে ঋতুর যাতনার আর যেন ততটা তীক্ষ্ণতা ছিল না, এই পর্য্যন্ত। আমার মনে হয়, যাতনা ভোগ করিয়া করিয়া অভ্যাস হইয়া যাওয়ার জন্যই তীক্ষ্ণতা কম বলিয়া মনে হইতেছিল। এই পর্য্যন্ত যত চিকিৎসককে দেখান হইয়াছে, সকলেই উপদেশ দিয়াছেন যে অর্শ চিকিৎসা না করানই ভাল, "উহাকে থাকিতে দাও, অর্শের পীড়া সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই"। কিন্তু মানুষের এই পীড়ার ঔষধ সৃষ্টি হয় নাই, ইহা যেন আমার কেমন কেমন মনে হইত। যাহা হউক, অনেক দিন ঔষধ বন্ধ করিয়াছিলাম, গত বৎসর কলিকাতায় পুনরায় শ্রীযুক্ত কেদার দাস মহাশয়কে দেখান হইল, তিনি কহিলেন—"তোমার জরায়ুর মুখে একটা বড় টিউমার হইয়াছে, এখন ইহাকে ক্রেপ করিতে হইবে, আমি বুঝিলাম যে ছুরী দিয়া চাঁছিয়া ফেলার নামই ক্রেপ করা। ফলতঃ আমি বুঝিলাম আজ কয়েক মাস হইতে তলপেটটা বড়ই ভারী ভারী মনে করিতাম, তাহার কারণই এই। যাহা হউক, ক্রেপ করিতে আমার সাহস হইল না, এ সময় আমার নিত্যজ্বর ও শরীর অতিশয় অবসন্ন হইতে লাগিল, মনের সাহসও ছিল না। শুনিলাম যে হোমিওপ্যাথিতে নাকি ইহার ভাল ঔষধ আছে, এজন্য কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডি, এন, রায় এবং সাহেব ডাক্তার ইউনান, এই দুই জনকে একত্র করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাঁহাদের চিকীৎসাধীনেও প্রায় ৭ মাস থাকিয়া কোনও ফল না পাইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, এখন বাঁচি বা মরি। আর এক কথা, চিকিৎসক নিকটে থাকায় অনেক সুবিধা, তাহা ছাড়া, ঐ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দুই জনের নিকটেও আপনার

নামের প্রশংসা শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস যে, ফল হইলে আপনার নিকটে হইবে, ইত্যাদি।"

অবশ্য আমি এই রোগিণীর ইতিহাস শুনিয়া তাঁহার চিকিৎসার ভার লইতে একটু দ্বিধা করিতেছিলাম, কিন্তু দুইটী কারণে সে দ্বিধা অপসারিত হইল, ১মতঃ চিন্তা করিলাম যে, বিজ্ঞ চিকিৎসক দুইজনে এতদিন দেখিয়াছেন, তাহা হইলেই যে মনে করিতে হইবে যে, যেহেতু তাঁহারা ফল দেখাইতে পারেন নাই, অতএব আমরা হোমিওপ্যাথি অপারক, ইহা আমার মনে আনিতেও কষ্ট হইল। ২য়তঃ রোগিণীর বয়স অতি অল্প সুতরাং ঠিক মত ঔষধ পড়িলে অবশ্য ফল হইবে। এই দুইটী চিন্তা আসিয়া আমার মনকে প্রোৎসাহিত করিল, আরও এক কথা ধৈর্য্যের একেবারেই অভাব নাই, কেননা ইহাই, রোগিণী ও তাঁহার স্বামীর শেষ চেষ্টা। আমি লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

লক্ষণ সমষ্টি—"নিত্য সন্ধ্যার সময় জ্বর আসে, একদিনও বাদ যায় না, মুখে স্বাদ পাই না। অত্যন্ত অরুচি, কোনও জিনিষ খেতে ইচ্ছা নাই, আজ প্রায় ১॥০ বৎসর এই প্রকার জ্বর হইতেছে, শেষ ৩।৪ মাস নিত্যই আসে, ১ ঘণ্টা কি ১॥০ ঘণ্টা থাকে, প্রায় সর্ব্বদাই শীত শীত ভাব থাকে, সামান্য সময় বাদে একটু ঘাম হইয়া জ্বরটা ত্যাগ হয়, কিন্তু শরীর যেন নিংড়াইয়া দেয়। তলপেটে যাতনা আছেই, তবে পূর্ব্বের মত ততটা প্রচণ্ড নাই, এই পর্য্যন্ত। কন্ কন্, খিঁচে ধরা, টেনে ধরা, টিস্ টিস্ করা, এই প্রকার যাতনা হয়, চাপিয়া ধরিলে উপশম হয়, খাম্‌চে ধরা ও তাপ দিলে উপশম হয়। আবার সময়ে সময়ে ঐ স্থানটীতে এত টাটানি হয় যে ছুঁতে পারা যায় না। অনেক সময় রাত্রে পেটের ঐ স্থানের ব্যথা ও কনকনানির জন্য বিছানা হইতে উঠে বেড়াইতে হয়। সে সময় মনে হয়, আমার জন্য যখন গৃহস্থের লোকের ও স্বামীর এত কষ্ট ও খরচ, তখন এ জীবন রাখার চেয়ে না রাখাই ভাল, কিন্তু মরিতে ভয় হয়। ফলতঃ

শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরের খোলা বাতাসে যাইলে আমার অনেকটা ভাল লাগে, আর আমি খোলা বাতাসই ভালবাসি, তবে এই শরীর, ইহার উপর পাছে আবার ঠাণ্ডা লাগে, এই জন্য গায়ে ঢাকা রাখিয়া অনেকক্ষণ খোলা বাতাসে বসিয়া থাকি, ঘরে ঢুকিতে ইচ্ছা হয় না, কেননা যদিও পেটের ব্যথার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, কিন্তু রাত্রে যে কষ্ট বেশী হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। প্রায়ই মাথা ঘোরে,—মাথাটী বামদিকে নোয়ালেই মাথাটী চক্র দেয়। আর একটী কষ্টকর লক্ষণ আমার আছে, সেটী আমি ঠিক ধরিতে পারি না, সময়ে সময়ে সন্ধ্যাকালে রাত্রে এবং কোনও প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিলে, কি সামান্য চিন্তা করিলেও, মনে হয় যেন শরীরের সমস্ত রক্ত উপরের দিকে জোরে উঠে গেল, আর কি যেন হয়ে যায়, তখনই একটু কপালে সামান্য ঘাম দেয় ও সে অবস্থাটী ভাল হইয়া যায়।" রোগিণীর স্বামীর নিকট জানিলাম—"মেজাজ খুব ভালই ছিল, আজ ৪।৫ বৎসর বড়ই খিট্‌খিটে হইয়াছেন এবং সর্ব্বদাই বিমর্ষ, বিষণ্ণ থাকেন, আর ঔষধ খাইতে চান না, বলেন, 'মরাই আমার পক্ষে ভাল'। রোগিণীর কাণে মধ্যে মধ্যে দুর্গন্ধ পূঁয দেখা দেয় ও আমার মনে হয় মুখেও দুর্গন্ধ থাকে, তবে গন্ধটী কাণের পূঁযের জন্য অথবা তাঁহার মুখের গন্ধ, ঠিক করিতে পারি না।"

"অর্শে অতিশয় দরদ,—স্পর্শ করিলেই যাতনা বাড়ে, ও রক্ত এবং রস পড়ে, খোঁচামারা ব্যথা। যে দিনে অর্শের যাতনা বাড়ে, সেদিন রাত্রে আমায় বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়, পাছে অর্শের স্থানটী বিছানায় ঠেকে, তাহা হইলে অতিশয় যাতনা হইবে। অর্শের স্থানে সামান্য তাপ দিলে ভাল লাগে বটে, কিন্তু যখন অতিশয় যাতনা হয়, তখন খোলা বাতাসে আসিলেই ভাল বোধ হয়, বিছানায় বেশী কষ্ট। ঋতুবিশেষে বড় একটা হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাই না, তবে বর্ষাতে বা বর্ষার শেষেই বাড়ে, দেখিয়াছি।"

২৬।৬—**অরাম্ মেটালিকাম্**,—১০০০ এক মাত্রা প্রাতে, ১৫ দিন পরে সংবাদ দিতে কহিলাম ও নিত্য একটী মাত্রা করিয়া ফাইটাম্।

৯।৭—কোনও উপকার নাই, আরও একমাত্রা **অরাম্** ১০০০, ১৫ দিন পরে সংবাদ চাই।

২৩।৭—কোনও উপকার নাই, **থুজা**, ১০০০, এক মাত্রা—১৫ দিন পরে সংবাদ দিবার কথা।

৩০।৭—৬ দিন পরেই সংবাদ পাইলাম, রোগিনী রাত্রে বেশ ঘুমাইতেছেন এবং যাতনা অনেক কম হইয়াছে। ফাইটাম্ আরও কতকগুলি দিলাম এবং ১৫ দিন পরে সংবাদ দিতে কহিলাম।

১৪।৮—ক্রমেই ভাল বোধ হইতেছে, পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুধাও বাড়িয়াছে। কিন্তু মন যেন আরও বিষণ্ন। **অরাম্ মেটালিকাম্**,—১০ এম। প্রচুর পরিমাণে ফাইটাম্—এক মাসের মত।

১০।৯ সংবাদ আসিল, রোগিণীর যাতনা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলতঃ আজ ৪।৫ দিন হইল আর জ্বর আসে নাই, অন্যান্য বিষয় ভাল। কোনও ঔষধ নাই, ফাইটাম্। আরও এক মাস পরে সংবাদ চাই।

৮।১০—পেটে বেদনার স্থানে যাতনা বড় নাই, কচিৎ কখন দেখা দেয়, অন্যান্য পক্ষে ভালই আছেন। ফাইটাম্,—এক মাসের জন্য।

১০।১১—কর্ণের অতি দুর্গন্ধ পূঁয অতিরিক্ত নির্গত হইতেছে এবং অনেক দিন হইতে যাহা দেখা যায় নাই, অর্থাৎ ঋতুস্রাব দেখা দিয়াছে, স্রাব নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় যাতনা আছে। ফাইটাম্।

১১।১০—সর্ব্বপ্রকারেই ভাল আছেন—ফাইটাম্।

১৯।১২—ঋতুস্রাব যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু টিউমারটী এখনও শক্ত আছে, যাতনাদি অনেক দিন হইতেই নাই। আমি নিজে রোগিণীকে দেখিয়া আসিলাম, পূর্ব্বের রোগিণী বলিয়া চিনিতে পারা অতি কঠিন। অর্শের বেদনা যাতনাও নাই।

৩।১।১৮—পূর্ব্বের মত টিউমারের উপর যাতনা অনুভব হইতেছে এবং দেহের অনেক স্থলে ছোট বড় কতকগুলি আঁচিল দেখা দিয়াছে। ফাইটাম্।

২৪।১।১৮—এবারের ঋতুস্রাব তেমন যথেষ্ট হয় নাই, এবং টিউমারের যাতনা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়। **অরাম্ মেটা**—সি, এম, এক মাত্রা ও প্লাসিবো দুই মাসের মত।

উহা ব্যতীত টিউমারের জন্য আর ঔষধ দিতে হয় নাই। তিন মাস পরে টিউমার হাতে অনুভব করা যায় নাই। কাণে পুঁযও হয় নাই। এক্ষণে কেবল কতকগুলি আঁচিল জন্য **থুজা** ১০০০ এক মাস পরে পরে দুইটী মাত্রা দিতে হয়। তাহার পর রোগিণী নির্ম্মল আরাম প্রাপ্ত হন।

মন্তব্য। (১) এই রোগিণীর চিকিৎসা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। যদিও সাইকোসিস্ বা সিফিলিসের কোনও **ইতিহাস** প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তবুও **সাইকোসিসের প্রাধান্যযুক্ত সিফিলিস্ দোষ** ছিল বলিয়া লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করে। সোরার ত কথাই নাই।

(২) রোগিণীর লক্ষণাদি বিশেষতঃ শারীরিক লক্ষণগুলি দেখিয়া হোমিওপ্যাথিতে নূতন ব্রতীগণ **ম্যাগনেসিয়া ফস্** না দিয়া থাকিতেন না এবং হয় ত না দেওয়ার জন্য আমাকে দোষ দিবেন। কিন্তু মানসিক লক্ষণই পুরাতন পীড়ার নির্দ্দেশক, এজন্য এবং ম্যাগ্নেসিয়া ফসের এতটা গভীর কার্য্য নয় যে, সে টিউমার তৈয়ার করিতে পারে, এজন্য উহা দেওয়া হয় নাই। রোগিণীর সর্ব্ব প্রথম অবস্থায় বোধ হয় ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ দিলে আর কোনও বাড়াবাড়ী হইত কি না, তাহাও বলা যায় না।

(৩) রোগিণীর সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্ দোষ স্বামীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল, যেহেতু তাঁহার প্রথম গর্ভের পর হইতেই পীড়ার আরম্ভ।

(৪) সাইকোসিসের প্রাধান্য জন্য থুজা দিবার পরে আরোগ্য ক্রিয়া আরম্ভ হয়, কিন্তু থুজার বিশেষ লক্ষণ না থাকায়, বিশেষতঃ অরামেই

রোগিণীর মানসিক লক্ষণ থাকায়, থুজা আর না দিয়া, অরাম্ দেওয়া হয়। যেমন তরুণরোগে নির্ব্বাচিত ঔষধের কার্য্য না হইলে সালফার দিয়া প্রতিক্রিয়া আনিয়া, পরে লক্ষণাদির সাদৃশ্যমত ঔষধই দিবার প্রথা, এক্ষেত্রেও সাইকোসিসের প্রতিষেধক থুজার সেই প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল। ১৪ ৮—তারিখের রিপোর্টের যে সংবাদ—"মন যেন আরও বিষণ্ণ", ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে থুজা না দিয়া অরাম দেওয়াই সঙ্গত, ইহাই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(৫) রোগিণীর স্থানীয় হ্রাসবৃদ্ধি এবং রোগীহিসাবে ধাতুগত হ্রাস বৃদ্ধি, বিপরীত প্রকারের, এজন্য ধাতুগত লক্ষণ দ্বারাই চালিত হইতে হয় এবং তাহার ফলে অর্শের জন্যও আর স্বতন্ত্র ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় নাই। এমন কি, রোগিণীর যদি আরও ২।৪টী রোগলক্ষণ থাকিত, যথা, শূল, শিরঃপীড়া ইত্যাদি, তাহা হইলেও আর অন্য কোনও স্বতন্ত্র ঔষধ দিতে হইত না। অরামের দ্বারাই সকল গুলিই আরাম হইত, কেননা অরাম্ **রোগিণীর** ঔষধ, কোনও **রোগের** জন্য দেওয়া হয় নাই।

(৬) কলিকাতার দুইজন বিখ্যাত চিকিৎসক সারাইতে পারগ হন নাই বলিয়া আমার এই রোগিণী হাতে লইতে অস্বীকার করিলে অন্যায় হইত। কলিকাতার চিকিৎসক মহাশয়দিগের অপারগতার কারণ, তাঁহাদের নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই। তাঁহারা যথেষ্ট কৃতবিদ্য হইলেও, সময় কম, এজন্য হয়ত নির্ব্বাচনে ভুল হইয়া থাকিবে।

(৭) যে ক্ষেত্রে, মধ্যে অন্য কোনও ঔষধ না দিলে ঠিক নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হয় না, সেখানে মধ্যের ঔষধটীকে কতদিন সময় দিতে হইবে এবং কখন তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করা কেবল পর্য্যবেক্ষণের উপরই একান্ত নির্ভর করে। **মানসিক লক্ষণের উন্নতি অবনতিই একমাত্র জ্ঞাপক।**

*৫নং রোগী—পুরাতন জ্বর ও প্রতিশ্যায়— "দুরন্ত কালাজ্বর" বলিয়া কথিত।

শ্রীযুত..............দত্ত, বয়স্—২১ বৎসর, ১৫ বৎসর বয়সের সময় সর্ব্বপ্রথম ম্যালেরিয়া জ্বর হয় এবং পল্লীগ্রামের সাধারণ রীতি অনুসারে, এলোপ্যাথিক ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান হইয়াছিল ও ১২।১৪ দিন পরে আরোগ্য হয়। কিন্তু তখন হইতেই তাহার শরীরটী নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। যৌবনসুলভ চপলতা দোষ পূর্ব্বেই ছিল। এক্ষণে তাহার ফলে এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের পরে, রোগীর প্রতিরাত্রিতে ২।১ বার করিয়া স্বপ্নে রেতঃস্খলন হইতে আরম্ভ করিল এবং কাজেকাজেই শরীর ও মন একেবারে অবসন্ন হইয়া উঠিল। রোগীর মাতা একজন বিশিষ্টা বিদূষী রমণী, তিনি জানিতে পারিয়া ছেলের পড়াশুনা বন্ধ করিয়া কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করান। কলিকাতার চিকিৎসা প্রথম এলোপ্যাথী, মধ্যে কবিরাজী, তাহার পর এলোপ্যাথীর বেশীর ভাগ ইন্‌জেক্‌সেন্ ও ডুস দ্বারা চিকিৎসা হয়। চিকিৎসার ফলে তাহার ঐ পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য সামান্য "ঘুস্‌ঘুসে" জ্বর নিত্যই সন্ধ্যায় আসিতে লাগিল। ২।১ ঘণ্টা বাদে ঘর্ম্ম হইয়া ত্যাগ হইত এবং আর একটী রোগলক্ষণ দেখা দিল, যাহা অতিশয় কষ্টদায়ক। ভোরের সময় রোগী শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবামাত্রই অবিরত হাঁচি ও কাশি, নাসিকার ও চক্ষে জল পড়া ইত্যাদি এবং স্নানাহারের পরেই আর থাকে না। আবার সন্ধ্যার সামান্য পূর্ব্ব হইতে রাত্রির আহার ও শয়ন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার অবিরত হাঁচি, কাশি, নাসিকার ও চক্ষের জল পড়া ইত্যাদি হইতে থাকিল। একজন বিজ্ঞ কবিরাজ কহিয়াছিলেন যে, ইহাকে প্রতিশ্যায় বলে এবং ইহা হইতে দারুণ যক্ষ্মারোগ আসিতে পারে। রোগীর মাতা অতিশয় ভীতা হইয়া তাহাকে লইয়া পশ্চিমে বায়ু পরিবর্ত্তন করেন, কিন্তু বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও রোগীর রোগলক্ষণের

কোনও পরিবর্ত্তন না হওয়ায় রেলওয়ে কোম্পানীর ধার শোধ করিয়া বাড়ী ফিরেন। কেবলমাত্র কোনও প্রতিকারেই কোনও ফল না পাওয়ায় তিনি একবার হোমিওপ্যাথী দেখাইবেন এই সংকল্প করিয়া আমাকেই চিকিৎসকরূপে নির্ব্বাচন করিলেন।

আমি নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল, অথচ আহারের জন্য নয়, কেননা ক্ষুধা বেশ আছে, এমন কি, রোগীর অবস্থা হিসাবে ক্ষুধাটী প্রায়ই অস্বাভাবিক মনে হয়। অত্যন্ত শীত কাতর, সর্ব্বদাই শীতের ভয়ে বিব্রত এবং প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকাই ভালবাসে। স্নানে তত ইচ্ছা নাই, অথচ স্নান করিলে তাহার কষ্টকর লক্ষণ সকলের বৃদ্ধিও হয় না। রাত্রিতে নিদ্রা ভাল হয় না, কেননা রোগের জন্য একটী ভয়ানক দুশ্চিন্তা সর্ব্বদাই ত থাকেই, রাত্রিতে বেশী হয় ও নিদ্রা না হওয়ায় চিন্তাগুলি আসে। কি চিন্তাগুলির জন্যই ঘুমাইতে পারে না, তাহা যেন ঠিক করিতে পারে নাই। কোষ্ঠ প্রায়ই বদ্ধ, কখনও কখনও তরল মলও হয়। গলার মধ্যে কি যেন একটী কাগজের মত, কি ন্যাকড়ার মত, রহিয়াছে মনে হয়, সেটী গেলাও যায় না, বাহিরেও আসে না। রোগী দর্পণের সাহায্যে এবং তাহার মাতার দ্বারা ঐ স্থান পরীক্ষা করাইয়া কিছুই দেখিতে পায় নাই, অথচ ঐটীর জন্য বড়ই অসুবিধা বোধ হয়। নিদ্রাভঙ্গের পর যতক্ষণ গরম শয়নঘরের মধ্যে রোগী থাকে, ততক্ষণ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ জানা যায় না, ঠিক যেন অতি সহজ মানুষ, কিন্তু বাহিরে আসিবা মাত্রই তাহার হাঁচি ও কাশির আরম্ভ হয়, নাসাপথ দিয়া ও চক্ষু দিয়া অবিরত জল পড়িতে থাকে। আবার স্নান ও আহার করিলে যেন বেশ সহজ লোকের মত মনে হয় এবং ঐ সকল প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ আদৌ থাকে না। দিনের বেলায় নিদ্রা হয় না। সর্ব্বদাই এটা ওটা করে, কোনও কাজ করিতে না পারিলেও চুপ করিয়া থাকা কষ্টকর।

বৈকালে শরীরটী "জড়সড়" হইয়া আসে, যেন কোনও বল নাই, শীতভাব ত আছেই, তাহার উপর কি যেন ভয়ানক অসোয়াস্তির ভাব,—তাহার কারণ বলা বা বর্ণনা করা অসম্ভব। সময়ে সময়ে ঘরের মধ্যে জ্বরের সময় সর্ব্বাঙ্গেই জ্বালা অনুভব করে, কিন্তু গায়ের ঢাকা খুলিতে ইচ্ছা হয় না। বৈকাল ৪।৫ টা হইতে যতক্ষণ বাহিরে থাকা যায়, ততক্ষণ প্রতিশ্যায় জন্য কষ্ট হয়, সন্ধ্যার পর ঘরের মধ্যে আসিলে কতক কম হয়,—কিন্তু আহার করিবামাত্রই একেবারে আর কিছুই থাকে না। গলায় একটী কাগজ বা ন্যাকড়া থাকার অনুভবটীর জন্য তাহার সকল সময়েই কষ্ট হয়। ক্রিমির উৎপাত প্রায়ই থাকে, গুহ্যদ্বার চুলকায় এবং স্বপ্নদোষ অনেকটা কম হইলেও সপ্তাহে ২।৩ দিন হইবেই। রোগীর পিপাসা আদৌ নাই, গলা ও মুখ শুষ্কবোধ হয়, এজন্য গরম জল ব্যবহার করিতে হয়।

১৭ই পৌষ—২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২১ সাল,—রোগীলিপি পাঠ ও চিন্তা। এই রোগীর প্রায় সকল লক্ষণই **আর্স-আইওড্কে** লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু এত দুর্ব্বল অবস্থায় এবং রোগের, বিশেষতঃ প্রতিশ্যায়ের, প্রাবল্যের সময় এত গভীর কার্য্যকারী ঔষধ দিলে ফলটী তত মধুর হইবে না, এজন্য সর্ব্বপ্রথম **স্যাবাডিলা** দেওয়াই সঙ্গত মনে করিয়া, নিত্যই প্রাতে স্যাবাডিলা—২০০, এক মাত্রা করিয়া খাইবে ও উপশম বোধ অর্থাৎ প্রতিশ্যায়লক্ষণ সকল কতক কম বোধ হইলেই বন্ধ করিবে, এবং সন্ধ্যায় এক মাত্রা করিয়া ফাইটাম্ দেওয়া রহিল এবং উপদেশ বিশেষ করিয়া দেওয়া রহিল যে, প্রাতের ঔষধসেবন আবশ্যক হইলে বন্ধ করিলেও সন্ধ্যায় ঔষধ যেন কদাচই বন্ধ করা না হয়, কেননা ইহাতে অতি গভীরভাবে ফল দিয়া থাকে।

১।১।২২—প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ অনেক কম, কিন্তু জ্বরটী বৃদ্ধি হইয়াছে। (এটী নূতন লক্ষণ বলিয়া যেন ভ্রম না হয়, এলোপ্যাথিক ঔষধাদির

দ্বারা যে চাপা দেওয়া হইয়াছিল, সেই চাপটী খুলিয়া গিয়াছিল মাত্র) জ্বরের লক্ষণাদির মধ্যে অন্য পরিবর্ত্তন নাই, কেবল রাত্রে সময় সময় বেশী ঘর্ম্ম হইতেছে। দুই বেলাই ফাইটাম্।

১৪।১।২২—প্রতিশ্যায়র লক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে,—**স্যাবাডিল্লা**—১০০০, তিন দিন প্রাতে ১ মাত্রা, ফাইটাম্ পূর্ব্ববৎ।

২৭।১।২২—প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ প্রায়ই নাই। অন্যান্য লক্ষণ তাই আছে, তবে গলার মধ্যে ন্যাকড়া থাকার ভাবটী নাই। ফাইটাম্। অন্য কোনও ঔষধ দেওয়া হইল না।

৯।২।২২—দেখা গেল, প্রতিশ্যায়ের কোনও লক্ষণই নাই, মেজাজ অতিশয় খিট্‌খিটে, সর্ব্বদাই খাইতে চায়। শীতভাবও আছে, সময়ে সময়ে জ্বালাও আছে। **আর্সেনিকাম্ আইওডেটাম্**—২০০, ১ মাত্রা সন্ধ্যায় ৮টার সময়, এবং প্রাতে ফাইটাম্। সপ্তাহ পরে আরও ১ বার ঐ ঔষধ খাইবে এবং তাহার সাত দিন পরে, সংবাদ প্রয়োজন।

২০।২।২২—জ্বর খুবই কম হইয়াছে, নিশিঘর্ম্ম নাই,—ফাইটাম্।

৮।৩।২২—সামান্য সামান্য জ্বর আসিতেছে, কোনও দিন ফাঁক যায়, তবে প্রায়ই আসে। **আর্সেনিক্ আইওড্** আরও ১ মাত্রা—২০০ শক্তি। আর কোনও ঔষধ দিতে হয় নাই। রোগী ইহাতে নির্ম্মল আরোগ্য হয়, এমন কি স্বপ্ন-দোষ লক্ষণ ঐ দুটি ঔষধের কাহারও মধ্যেই **না থাকা সত্ত্বেও** ঐ লক্ষণ আরোগ্য হইয়াছিল এবং অন্য কোনও ঔষধ দিতে হয় নাই।

মন্তব্য।—(১) রোগীর শারীরিক অবস্থা যদি দুর্ব্বল হয়, তবে বিশেষ সাবধানে কার্য্য করিতে হয়, এবং ৩০ শক্তির উপরে কোনও গভীর কার্য্যকরী ঔষধ দিবার সাহস না করাই ভাল।

(২) যদি বর্ত্তমান নানাপ্রকার লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি এরূপ অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক থাকে যে, সাধারণ ঔষধের দ্বারা সেগুলি উপশম

হইতে পারে, তবে অগ্রে সেগুলির উপশম করিয়া লইতে হয়, তাহার পরে ধাতুগত লক্ষণসাদৃশ্যে বেশ সুগভীর কার্য্যকরী ঔষধ ব্যবহার করিবার অনেক প্রকারে সুবিধা পাওয়া যায়।

(৩) আর্সেনিকাম্ আইওডেটামের লক্ষণ প্রথমে ছিল, কিন্তু সেজন্য এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিতে নাই যে, স্যাবাডিলার কার্য্য হইয়া যাইবার পর উহাই দিতে হইবে, বরং ইহাই নিরপেক্ষভাবে স্থির করিয়া রাখিতে হয় যে, স্যাবাডিলার পর **যেরূপ লক্ষণ-সমষ্টির আবির্ভাব** হইবে, তাহাই দিব, ফলতঃ এণ্টিসোরিক ব্যতীত কখনও রোগীর সম্পূর্ণ নিরাময় আসিবে না। এই প্রকাব চিন্তাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিন্তা।

(৪) প্রশ্ন হইতে পাবে, এ রোগীকে ২০০ শক্তির অধিক প্রথমেই বা কেন দেওয়া হইল না এবং শেষেও যখন দেওয়া হয় নাই, তখন কি বোগী সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়াছে? উত্তর এই যে, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল বলিয়া, তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে ২০০ শক্তির অধিক দিবার সাহস করা হয় নাই। তাহাতে যখন ক্রিয়া হইয়াছে, তখন ঠিকই করা হইয়াছে বলিতে হয়। তবে আরও উচ্চতর শক্তি দিলে "হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি" দেখা দিত এবং ক্রিয়া যে না হইত, তাহা বলা যায় না। শেষে যে আরও উচ্চতর শক্তি দেওয়া হয় নাই, তাহার কারণ—"আর কিসের উপর দিব? লক্ষণ কই?" **লক্ষণ পুনরাবির্ভাব না হইলে দিবার ক্ষেত্র উপস্থিত হয় না।** তবে যদি কখনও ঐ লক্ষণ-সমষ্টি পুনরায় আসে, তবেই ঐ ঔষধ উচ্চতর শক্তিতে দিবার সময় আসিবে। ফলতঃ সেরূপ আসার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এস্থলে একেবারে সম্পূর্ণ নিরাময় হইল কিনা, সে বিষয়ে অবশ্যই একটু সন্দেহ থাকিল, কিন্তু উপায় কি?

(৫) ধাতুগত লক্ষণের উপর ঔষধ নির্ব্বাচনের সুবিধা এই যে, ইহাতে **রোগী** সারে, কাজেই যে রোগলক্ষণের চিকিৎসার জন্য রোগী আসে, তাহা বাদে যদি অন্য কোনও রোগলক্ষণও থাকে, তবে

তাহাও অপসারিত হইয়া থাকে। (৪নং রোগীতত্ত্ব ৫ম মন্তব্য দ্রষ্টব্য।) স্বপ্নদোষ ত সারিয়াই গেল এবং ইহা ব্যতীত যদি অন্য আরও কোন রোগলক্ষণ থাকিত যাহা থাকা সত্ত্বেও রোগীর ধাতুগত লক্ষণ-সমষ্টি অনুসারে ঐ ঔষধই প্রযুজ্য হয়. তবে যে কোনও রোগ-লক্ষণ থাকুক না কেন, সকলই আরাম হইবে। ইহাই প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক তত্ত্ব এবং হোমিওপ্যাথিতে ইহাই সুবিধা।

(৬) রোগীর আরোগ্যের সময় কেবলমাত্র নিজের কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য অথবা রোগীর কল্যাণ করিবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াও, **লক্ষণ-সমষ্টির পুনরাবির্ভাব না পাইলে**, কখনও উচ্চতর শক্তির ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নয়। তাহাতে ইষ্ট ত হয়ই না, ক্ষেত্র বিশেষে অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

*৬নং রোগী—গণ্ডমালার অপসারণ ফলে ক্ষয়কাশ।

১৯২১।৩রা মে।—

শ্রীযুক্ত.........বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ৩০।৩১ বৎসর, "গত বৎসর হইতে অর্থাৎ আজ ৯ মাস হইল, ক্ষয়কাশের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৯১৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম আমার গলার দুই দিকেই কতকগুলি গণ্ড মালা বড় হইয়া উঠে এবং গলার ভিতরেও বেদনা হয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্রয় লইয়াছিলাম, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারা তিন চারি জন ডাক্তার যুক্তি করিয়া কতকগুলি প্রলেপ লাগাইবার ঔষধ এবং দিনরাত্রিতে ৪।৫ বার কুলকুচা করিবার জন্য এক প্রকার ঔষধ দেন। তাহাতে আমার কোনও উপকার না হওয়ায় মেদিনীপুরের সিভিল সার্জ্জনকে দেখাইয়াছিলাম, তিনিও ঐ প্রকার ব্যবস্থা অনুমোদন করায় আমি

কলিকাতা সহরের দুই এক জন ডাক্তারকে প্রথম দেখাই ও শেষে মেডিক্যাল কলেজের যিনি সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক সার্জ্জেন, তাঁহার নিকট যাই, তিনি কহিলেন যে ইহার অপারেসন্ অর্থাৎ কাটিয়া ফেলা ব্যতীত অন্য কোনও চিকিৎসা এ পর্য্যন্ত কোনও ফলদায়ক হয় নাই, অতএব অস্ত্রপ্রয়োগই একমাত্র উপায়। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে আমার চারিটী গ্ল্যাণ্ডে অপারেসন করা হয় এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে আরও দুইটী তুলিয়া ফেলা হয়। আমি এই অপারেসনে বিশেষ সোয়াস্তি বোধ করিয়াছিলাম এবং আমার গলার মধ্যে যে সকল কষ্ট ও অসুবিধা বোধ হইত, তাহা সমস্তই মন্ত্রের মত ভাল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জুলাই মাসের প্রথমেই যে অপারেসন হয়, তাহার পর হইতেই আমার সামান্য সামান্য কাশির সূত্রপাত হয়, আমি সে কথা ঐ সার্জ্জেন সাহেবকে বলিয়াছিলাম. তিনি কহিলেন —"হাঁ অপারেসনের পর কাহারও কাহারও হইয়া থাকে, সে জন্য চিন্তা কি আছে, কড্‌লিভার অয়েল যথেষ্ট পরিমাণ খাওয়া হইলেই কাশির বেগ আর থাকিবে না" এবং তদনুসারে তিনি আমাকে দুই প্রকার কড্‌লিভার অয়েলের ব্যবস্থা করিলেন। আমি দুই বেলা কড্‌লিভার অয়েল ব্যবহার করিতে থাকিলাম, কিন্তু কাশির ত কোনও সুবিধাই হইল না, বরঞ্চ আমার পেটের গোলমাল উপস্থিত হইল। তিনি আমাকে উক্ত কড্‌লিভার অয়েলের মাত্রা ক্রমেই বাড়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সহ্য না হওয়ায় আমি আর মাত্রা বৃদ্ধি করি নাই, ইতিমধ্যে অক্টোবর মাসের প্রথমেই যখন আরও দুইটী গ্ল্যাণ্ড তোলান হয়, তখন ডাক্তার সাহেব নিজেই আমার রক্তপরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"You are very unfortunate, Babu, you are fast running into a galloping Phthisis." আমিত শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম। আরও ৪।৫ জন

ডাক্তার ও দুই জন উপযুক্ত কবিরাজকে দেখাইয়া উহাই সাব্যস্ত হইল যে, আমার যক্ষ্মাই হইয়াছে, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন "বাবা, খোদার উপর বাহাদুরী করাটী কি আর চিকিৎসা গো, তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল, বাবা?" এক্ষণে জানিলাম যে, নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছি, ঐ বৃদ্ধ কবিরাজটীই আমাকে হোমিওপ্যাথির আশ্রয় লইবার জন্য উপদেশ দিলেন, কেন না, তাঁহার একটী পুত্র সম্প্রতি কোনও দুরারোগ্য রোগে হোমিওপ্যাথিতেই আরোগ্য হইয়াছেন। এক্ষণে আমার যাহা কর্ত্তব্য, করুন," ইত্যাদি।

বর্ত্তমাণ লক্ষণসমষ্টি :—পাতলা দোহারা চেহারা, শ্যামবর্ণ, লম্বাটে, তারাগুলি কটা, চক্ষু বড় বড়, নাকে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য চলিতেছে না, মুখের দ্বারাই নাকের কার্য্য চলিতেছে। ঠাণ্ডা দ্রব্যে একান্ত অভিলাষ, ঠাণ্ডা পানীয়, ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা জলে স্নান, ঠাণ্ডা ঘরে শয়ন ইত্যাদি সকলই পছন্দ করেন, ক্ষুধা বেশী, অথচ গায়ে বল নাই, রাত্রে ঘরের মধ্যে কাশির অতিশয় বৃদ্ধি, ফাঁকের বাতাসে বেড়াইলে উপশম রাখে, রাত্রে সামান্য সামান্য জ্বর ও ঘর্ম্ম হইয়া থাকে, বড় দুর্ব্বল। পিপাসার জোর বড় বেশী, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল, ঠাণ্ডাই বরাবর ভাল লাগিত এবং ক্ষুধাও বেশ ছিল। আমার নিকট লক্ষণাবলি লিখাইবার সময় রোগী একস্থানে স্থির হইয়া বলিতে পারিলেন না, কেবল বেড়াইয়া বেড়াইয়া সকল কথা কহিতে লাগিলেন।

৩।৫।২১—**আইওডিয়াম্** ২০০ শক্তি এক মাত্রা,—সাত দিন পরে সংবাদ দিলেন, কোনও উপকার হয় নাই, **আইওডিয়াম্** ২০০ এক আউন্স জলে চারিটী গ্লবিউল দিয়া দুই বার নাড়া দিয়া খাইতে দিলাম, ইহাতেও ৭।৮ দিন অপেক্ষা করিয়া কোনও ফল পাইলাম না। এক্ষণে, **টিউবারকুলিনাম্ বোভিনাম** ২০০ একমাত্রা দেওয়া হয়, ইহাতে কাশির বেগটী সামান্য কম হইল মাত্র, রোগী কোনও উপশম বোধ

করিলেন না। ১৪ দিন পরে **আইওডিন** ৩০, নিত্য প্রাতে এক মাত্রা, তিন দিন দেওয়া হইল, তাহার ফল ১৫ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও পাওয়া গেল না। এই সময়ে রোগীর ইষ্টদেব আসিয়া আমাকেই বিশেষতঃ উদ্ধার করিলেন, কেন না, তিনি রোগীকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া শান্তি করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া আমার অনুমতি চাহিলেন, আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ও তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অনুমতি দিলাম। বলাই বাহুল্য, বাড়ীতে গিয়া শান্তির পরে কিছু কম এক মাসের মধ্যে রোগীও শান্তি পাইয়াছে। দয়াময় নারায়ণ আমার অখ্যাতি নিবারণ জন্য রোগীর ইষ্টদেবকে আনাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

মন্তব্য। এলোপ্যাথির দ্বারা চিকিৎসায় রোগীর কি প্রকার সর্ব্বনাশ সাধন হইতে পারে, ইহা তাহারই একটী অতিশয় সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে স্থানে পীড়া হইয়াছে, সেই স্থানটী বা **পীড়ার ফলটী অপসারিত করিয়া** দিলে রোগীর ভয়ানক **অনিষ্ট করাই** হইয়া থাকে। ইহাকেও সাধারণ লোকে, এলোপ্যাথির শিক্ষানুসারে, **আরোগ্য** কহিয়া থাকে। এখানে গণ্ডমালার বিবৃদ্ধিগুলি রোগের **ফলমাত্র**, এবং রোগের ফলমাত্রকে তিরোধান করানই আরোগ্য হইতে পারে না। **রোগীর** চিকিৎসায় যদি রোগ আরোগ্য হয়, তবেই গণ্ডমালার স্ফীতিই হউক বা অন্য কোনও প্রকার ফলই হউক, আপনিই অপসারিত হয়।

৭নং রোগী…মুখ দিয়া রক্ত উঠে।

১৯১৪।১৩ই আগষ্ট।

শ্রী………ভৌমিক, বয়স ৪৫ বৎসর হইবে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায়, খিট্‌খিটে মেজাজ, গত বৎসর জুন মাস হইতে মধ্যে মধ্যে **রক্ত বমন** হইয়া আসিতেছে। প্রথমে, কবিরাজী চিকিৎসা হইয়াছিল, তাহাতে

৩।৪ মাস একটু ভাল ছিলেন। গত নভেম্বর হইতে মাসে ৩।৪ দিন রক্ত বমন হইতেছে, উপশম হয় নাই। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ২।৫ দিনের জন্য হইয়াছিল, কিন্তু রোগীর ঐ ঔষধ সহ্য হয় না, অতিশয় উগ্রবোধ হয়, এজন্য তাহা ত্যাগ করিয়া বিনা ঔষধেই আছেন।

রোগীর ধাতুগত লক্ষণ আদৌ নাই, নানা চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও কাজের লক্ষণ পাওয়া যায় নাই। কেবল মেজাজ একটু খিট্‌খিটে, বাকি সকলই সাধারণ লক্ষণ। এ অবস্থায় কেবল রক্তবমনের লক্ষণ ধরিয়া সর্ব্ব প্রথম **ইপিকাক্** দেওয়া হয়, তাহাতে কোনও ফল না পাইয়া শেষে **মিলেফোলিয়াম্** ২০০, তিন মাত্রাতেই রক্তবমন বন্ধ হইয়া গেল। অবশ্য ইহাতে **রোগী** সারিল না, কেবল ঐ **রোগলক্ষণটী** অপসারিত হইল। যেখানে অন্য কোনও **বিশেষ** লক্ষণ না পাওয়া যায়, সেখানে এরূপ করা ব্যতীত অন্য উপায় কি আছে ?

*৮-নং রোগী……বহুমূত্র ও ফিশ্চিউলা।

১৯১৬।২১শে মার্চ্চ।

শ্রী………পট্টনিবাস, বয়স ৩৬।৩৭ বৎসর, দোহারা, বরং একটু মোটাসোটা, গৌরবর্ণ, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্, সর্ব্বদাই লেখাপড়ার এবং মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকেন। ১৯০৭ সাল হইতে ফিশ্চিউলা হইয়াছে এবং গত বৎসর হইতে তাঁহার বহুমূত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। ফিশ্চিউলার জন্য তাঁহার তত অসুবিধা না থাকিলেও তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, ঐ জন্যই শরীর ক্রমে খারাপ হইতেছে, ফলতঃ বহুমূত্রের জন্যই তাঁহার অতিশয় অসুবিধা, উহারই চিকিৎসা বিশেষ প্রয়োজন।

ইতিহাস—রোগীর যখন ২৫।২৬ বৎসর বয়ক্রম, তখন গ্রীষ্মের শেষে এক বৎসর তাঁহার অনেকগুলি ফোঁড়া হইয়াছিল। ঐ সকল ফোড়া

পৃষ্ঠদেশেই অধিক হইয়াছিল, অন্য ফোড়াগুলি বেশ সারিয়া গিয়াছিল কিন্তু পৃষ্টদণ্ডের শেষে, গুহ্যদ্বারের ঠিক উপরের দিকে, একটী বড় ফোড়া হইয়াছিল, সেটী কখনও সারে, কখনও বাড়ে, এই প্রকার হইয়া অনেক দিন থাকে, মধ্যে মধ্যে একটু দরজ ও বেদনা হয়, সামান্য পূঁজ বাহির হইয়া ভাল হইয়া যায়, আবার ২।১ মাস পরে ঐ প্রকার হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমাগত সামান্য রস পড়িতেই থাকিল। এক বৎসর পরে একবার কাটান হইয়াছিল, কিন্তু যিনি অপারেসন করিয়াছিলেন, তিনি কহিয়াছিলেন যে এটী কাটিলেও বোধ হয় সারিবে না, তাঁহার বোধ হয় যে ঐটী ফিশ্চিউলায় পরিণত হইবে। ফলতঃ তাহাই হইল। আর কাটান হয় নাই, ঐ প্রকারই আছে। ১৯১৫ সালের শীতকালের প্রারম্ভ হইতে অতিরিক্ত প্রস্রাব হইতে থাকে, প্রথম প্রথম ৮।১০ দিন আদৌ মলত্যাগ হইল না, জোলাপেও পরিষ্কার হইল না, তাহার পর হইতেই অতিরিক্ত প্রস্রাব হইতে লাগিল।

বর্ত্তমান রোগলক্ষণ ও রোগীলক্ষণ—ফিশ্চিউলার স্থানটী দেখিয়া জানিলাম, একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহার ধারগুলি অতিশয় শক্ত হইয়াছে; দরজ সামান্য আছে, আজকাল আর স্পর্শাসহিষ্ণুতা নাই, হরিদ্রাভ ও রক্তযুক্ত পিচ্ছিল ও অতি দুর্গন্ধ পূঁয অবিশ্রান্ত অল্প অল্প করিয়া নির্গত হইতেছে। ছিদ্রটী অতি সূক্ষ্ম হইলেও আক্রান্ত স্থানটী অনেকখানি, প্রায় একটী টাকার পরিমাণ স্থান, উচ্চ ও শক্ত হইয়া রহিয়াছে। স্থানটী একটু গরম বোধ হইল। ফিশ্চিউলার যাতনা, মলত্যাগের পরেই অত্যন্ত বেশী। অন্যান্য সময়ে যে না থাকে, তাহা নয়, কিন্তু মলত্যাগের পরে পরেই কাটাছেঁড়ার ন্যায় অত্যন্ত কষ্ট ও অনেকক্ষণ ধরিয়া হইয়া থাকে। শীতকালে এবং বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বড় কষ্ট হয়, বর্ষাকালে কতকটা কম। মল কঠিন হইলেও যেমন এবং তরল হইলেও তেমন, কষ্ট প্রায়ই সমান থাকে। মেজাজ অতিশয় রুক্ষ,

বিশেষতঃ উচ্চ শব্দে চটিয়া যান। হাতে ও পায়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম প্রায়ই হইয়া থাকে।

বহুমূত্রের বিশেষ কোনও লক্ষণ পাইলাম না, তবে পিপাসা বেশী, এবং প্রস্রাব বারেও বেশী ও পরিমাণেও বেশী, অতিশয় দুর্গন্ধ। রোগীর দুগ্ধ একেবারেই সহ্য হয় না। পেটের পীড়া অর্থাৎ তরল্‌মল প্রায়ই হয়। তবে দুগ্ধ পান করিলে আরও বাড়ে। রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারেন না, কিন্তু গরমের দিনেও ভাল থাকে না।

১৯১৬।২৪শে মার্চ্চ—**নাইট্রিক্ এসিড্**—২০০, নিত্য প্রাতে এক মাত্রা, চারি দিন এবং প্লাসিবো। ১৫ দিন অপেক্ষায় কোনও উপকার না পাইয়া ঐ ঔষধ ৫০০ শক্তি একমাত্রা—৭।৮ দিন পরে প্রস্রাব কতক কম বলিয়া মনে হয়।

২৬।৪—**নাইট্রিক এসিড্**—১০০০, এক মাত্রা—১০ দিন পরে সংবাদ পাওয়া যায়, প্রস্রাব কম হইয়াছে এবং রোগীর মনের প্রফুল্লতাও যেন দেখা দিয়াছে। ফাইটাম্ একমাত্রা করিয়া ২০ দিনের মত।

২৪।৫—প্রস্রাব যে পরিমাণ কম হইয়াছিল তাহাই আছে, দুর্গন্ধও পূর্ব্ববৎ। **নাইট্রিক এসিড্**—১০০০ আরও ১ মাত্রা।

১৮।৬ বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন না পাইয়া **হিপার সালফার**—২০০ একমাত্রা ও ২০ দিনের মত ফাইটাম্।

৩।৭—পূর্ব্ববৎ। **নাইট্রিক এসিড্**—১০ এম। যথেষ্ট প্লাসিবো।

১৩।৭—রোগীর প্রস্রাব ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে, পিপাসাও অনেক বাড়িয়াছে। ফাইটাম্। ১৫ দিনের মত।

২৬।৭—সংবাদ ভাল, প্রস্রাব ৩।৪ দিন একটু বেশী বেশী হইয়াছিল, এক্ষণে অনেক ভাল, প্রায় স্বাভাবিক। ফাইটাম্।

১৮।৮—প্রস্রাবের অসুখ প্রায় নাই, তবে ফিস্‌চিউলা মধ্যে

অনেকবার বাড়াকমা হইয়াছে, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঔষধ কেবলমাত্র দুই মাসের মত প্লাসিবো।

১৫।৯—ফিশ্চিউলা পূর্ব্ববৎ এবং প্রস্রাবের অসুখ নাই। প্লাসিবো আরও ২০ দিনের মত।

২৪।৯—সংবাদ আসিল যে, প্রস্রাব আবার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ফিশ্চিউলার স্থানটীতে বড় যাতনা হইতেছে। **নাইট্রিক এসিড্—৫০** এম—একমাত্রা ও তিন মাসের মত প্লাসিবো।

২১।১২—রোগী একখানি নোটবহি লইয়া আসিয়া দেখাইলেন যে, এই তিন মাসের মধ্যে মাত্র দুইবার ফিশ্চিউলার বেদনা জানাইয়াছিল, প্রস্রাবের কোনও গোলমাল নাই এবং আশ্চর্য্য কথা,—প্রস্রাবের গন্ধ এবং ঘর্ম্মের গন্ধ কোন্ দিন হইতে নাই, তাহা তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই। ফলতঃ দুর্গন্ধ নাই এবং হাতে পায়ে ঘাম যত হইত, তত আর হয় না। ঔষধ—প্লাসিবো।

৩।২—অন্যান্য সকল লক্ষণই ভাল, তবে ফিশ্চিউলার লোপ হয় নাই এবং হাতের তালুতে ও পায়ের পাতায় অতিশয় জ্বালা বোধ হয়, এত শীতেও ঐ দুইটী স্থানে ঢাকা দিতে পারেন নাই। **সালফার—১০০০** এক মাত্রা।

১৬।৩—জ্বালা নাই এবং ফিশ্চিউলাতে বড় বেদনা ও অবিরত পূয ক্ষরণ হইতেছে। "উহা বোধ হয় সারিবে না।" ঔষধ **নাইট্রিক এসিড্**—সি এম্, একমাত্রা এবং তিন মাসের ফাইটাম্।

১৩।৬—ফিশ্চিউলার মুখ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্থানটীতে গ্লাসের সাহায্যে দেখা গেল যে, মুখটী সামান্য ফাঁক আছে, কিন্তু পূঁয রক্ত আদৌ নাই এবং সেই শক্ত ও উচ্চ স্থানগুলি স্বাভাবিক হইয়াছে। আর কোনও ঔষধ দিতে হয় নাই।

মন্তব্য—(১) দুইটি একেবারে স্বতন্ত্র পীড়া, একই ঔষধে আরোগ্য

হইল। কেন? **রোগীর বিশেষ লক্ষণ** অনুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে যদি দেহে ১০টী রোগলক্ষণও থাকে, তথাপিও সব গুলিই সারিবে, যেহেতু রোগ ধরিয়া ঔষধ নয়, রোগীর ধাতুগত লক্ষণ ধরিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন হইয়াছে।

(২) **সর্ব্বপ্রথমে** যে রোগলক্ষণ দেখা দিয়া থাকে, তাহা প্রকৃত আরোগ্যের পথে সর্ব্বশেষে আরাম হয় এবং যেটী **সর্ব্বশেষে** হইয়াছে, সেটী সর্ব্বপ্রথম আরোগ্য হইয়া থাকে, ইহাই নিয়ম এবং এই নিয়ম এই রোগীতে বেশ পরীক্ষিত হইল।

(৩) বর্ত্তমান রোগীতে সোরা ও সাইকোসিস্ দোষই বিশিষ্টভাবে থাকার লক্ষণ পাওয়া গিয়াছিল। ফলতঃ লক্ষণসমষ্টির উপরেই ঔষধ নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল এবং তাহাই আমাদের অধিকার।

(৪) প্রস্রাবে দুর্গন্ধ থাকাটী একটী অতি আবশ্যকীয় **রোগীলক্ষণ**, এটীকে **স্থানীয়** লক্ষণ বলিয়া যেন ভ্রম করা না হয়। **রোগীর জন্যই** প্রস্রাবের গন্ধ, **স্থানীয়** ভাব কখনই নয়।

* ৯নং রোগী......সিফিলিস্ দোষহেতু অনেকগুলি পীড়া,—অর্জ্জিত সিফিলিস্।

১৯১৩।১৪ই জুন :—

শ্রী..................অধিকারী, বয়স ২৯.৩০ বৎসর হইবে। ১৮।১৯ বৎসর বয়সে সঙ্গদোষহেতু বেশ্যালয় গমনজনিত সিফিলিস্ আক্রমণ হয়। পিতামাতা পাছে জানিতে পারেন, এই ভয়ে এলোপ্যাথিক ইঞ্জেক্সন্ এবং স্থানীয় ক্ষতাদির জন্য মলম লাগাইয়া তখন ঐ রোগটী চাপা পড়ে এবং রোগীর ধারণা হইয়াছিল যে, তাহার ঐ পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য হইয়াছে। দুই বৎসর পরে যখন বামদিকে একটী বাঘী উঠিল, তখনই

তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল যে, পীড়া কখনই নিঃশেষ হয় নাই, ফলতঃ ইতিমধ্যেই পিতামাতার নিকট গুণবান্ পুত্রের গুণ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং একজন উৎকৃষ্ট এলোপ্যাথিক চিকিৎসককে আনাইয়া ইহার প্রকৃত প্রতীকার করিবার অনুরোধ করা হয়। তিনি বাঘীটী যত্ন করিয়া কাটিয়া ১০।১৫ দিন অনেক পরিশ্রম করিয়া নাকি রোগীর ভিতরে যাবতীয় দূষিত দ্রব্য ঐ ক্ষত মুখে বাহির করিয়া দিয়া পিতামাতাকে নিঃশঙ্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, ছেলের দেহটী এবার নির্ম্মল হইয়াছে এবং নির্ম্মলকে আরও নির্ম্মল করিবার জন্য ৪।৫টী সালসার বোতল ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া নিজের কর্ত্তব্যের শেষ করেন। ফলতঃ সিফিলিস্ মহাশয় এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের হুকুম অমান্য করিয়া এবার একেবার নাকে গিয়া তাহার ক্রিয়া স্থান ঠিক করিল এবং ঐ স্থানের ক্ষত ও রোগীর তালুতে ক্ষত জন্মাইয়া, চিরকালের মত রোগীকে নাকি "খোনা" করিবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া ফেলিল। এদিকে মাথার চুলগুলি উঠিয়া গেল এবং নাক দিয়া ও মুখ দিয়া অতি দুর্গন্ধ পূঁযস্রাব হইতে আরম্ভ করিল। এ অবস্থায় এলোপ্যাথি ডাক্তার বাবুরা অস্ত্র চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিলে, কতকটা ভয়ে এবং কতকটা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের নিশ্চয়তাব সহিত তাঁহারা যে সকল দৃঢ় আশ্বাস দিয়াছিলন, সে গুলি কার্য্যক্ষেত্রে মূল্যহীন বলিয়া প্রমাণ হওয়ায়, উহাদের কথার উপর অবজ্ঞা করিয়া, শেষে হোমিওপ্যাথিকে একবার পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ পীড়ার কোনও প্রতীকার আছে কিনা? আমি একটুখানি নরম-গরম, মিঠে কড়া, একটী নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রাস লেক্‌চার দিয়া রোগীর পিতাঠাকুর মহাশয়কে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহার ছেলের যতদূর সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তাহার প্রতীকার একমাত্র হোমিওপ্যাথিই করিতে পারে, নতুবা যে ভাবে চলিয়া আসিতেছেন, ঐরূপ ভাবে চলিতে

থাকিলে কুষ্ঠপীড়া আসিতে বহু বিলম্ব নাই। পিতা মহাশয় বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি, এজন্য হ্যানিমানের অর্গাননের অনেকগুলি সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহাকে রোগ, রোগী, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ের আসল সত্য বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি বেশ মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং, এমন কি, যদি তাঁহার পুত্রের জীবননাশও হয়, তথাপি তিনি আর অন্যপথ অবলম্বন করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ছেলেটীর গঠন সুন্দর ও ছোহারা অর্থাৎ মোটাও নয়, শীর্ণও, নয়। মুখশ্রী এত পীড়া সত্ত্বের উজ্জ্বল পরিষ্কার, নিজে সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেই ভালবাসে, মেজাজ তত ভাল নয়, অল্প কারণেই হঠাৎ রাগিয়া উঠে। রোগী ঠাণ্ডাকে বড় ভয় করে এবং সর্ব্বদাই পাছে ঠাণ্ডা লাগে, এজন্য বিশেষ সাবধানে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা জলে স্নান, ইত্যাদি পছন্দও করে না। মধ্যে মধ্যে পেটের পীড়া হইয়া থাকে, সামান্য কারণেই পেট খারাপ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে তাহার প্রায়ই পাতলা মল ও আমাশয় হয়। আগেই লিভারের স্থানে ছুঁচ ফোটা ব্যথা ২।৩ দিন হইয়া তাহার পর উদরাময় দেখা দিয়া থাকে। যে কোনও কষ্টের সময় তাহার শয়নে বৃদ্ধি, এজন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। চিরকালই একটু অস্থির প্রকৃতিও বটে। মাথা ভার হইয়াই থাকে, বিশেষতঃ কপালটীতে ব্যথা আছেই। রাত্রিতে ১২টার পর আর ঘুম হয় না, বিছানায় থাকিতেও পারে না। বর্ষাকালে সর্দ্দি লাগিয়াই থাকে, নাক বুজিয়া যায়, মুখ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও তুলিতে বাধ্য হয়। নাকে ও তালুতে যে ক্ষত ছিল, তাহা যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাহা টকটকে লাল বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু বড়ই দুর্গন্ধ, রোগী নিজেও দুর্গন্ধ বোধ করে ও অন্যেও করে। চট্‌চটে এবং সুতার মত পূঁয নির্গত হয়। মধ্যে মধ্যে জ্বালাও করে,

ফলতঃ গরম জিনিষই ভাল লাগে। রোগী গ্রীষ্মকালটীকেই বেশী অপছন্দ করে। বাতের বেদনাও মধ্যে মধ্যে হয়। এই সকল লক্ষণ জানিয়া—আমি তাহাকে নিম্নলিখিত ভাবে চিকিৎসা করি।

১৬।৬।১৩—**কেলি বাইক্রোমিকাম**—১০০০ শক্তি, নিত্যই এক মাত্রা, চারি দিন দিবার পরই, উপশম বোধ হওয়ায়, বন্ধ।

২৮।৬।১৩—সামান্য উপশম বোধই আছে, আর কোন উন্নতি নাই, "যাহাতে দুর্গন্ধটা আগে যায়, মশাই, তাই করুন"। **কেলি-বাই**—২০০, নিত্য প্রাতে এক মাত্রা—তিন দিন, দিবার ব্যবস্থা ও ১৫ দিনের ফাইটাম্।

১৪।৭।১৩—বেশ উপকার হইয়াছে, রোগীর নাকের ও তালুর ক্ষত অনেক ভাল, দুর্গন্ধও কম। **কেলি-বাই**—২০০ বা অন্য কোনও ঔষধ এক্ষণে দিতে হইবে?—এ বিষয়ে নিকটবর্ত্তী একটি নূতন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক জানিতে চাহিলেন, কেননা এ সময় রোগীর স্থানে স্থানে বাতের বেদনা যেন দেখা দিতে থাকে। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, যখন একদিকে উপকার হইয়াছে, তখন ক্ষত অপেক্ষা অধিক বাহ্যতর লক্ষণের যদি আবির্ভাব হয়, তবে জানিতে হইবে, যে উহা ঔষধেরই আরোগ্য পথের ক্রিয়া। অতএব কোনও ঔষধই দিতে হইবে না। প্লাসিবো—১৫ দিনের মত।

২৭।৭।১৩—রোগীর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইয়া বড় কষ্ট হইতেছে "ঔষধ চাই," দুই বেলা প্লাসিবোর ব্যবস্থা। এই সময় হঠাৎ একটী বাদ্‌লা ও প্রচণ্ড ঝড়ের জন্য অনেকেরই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতেছিল। রোগী তিন দিনের পর আরোগ্য হয়।

৬।৮।১৩—রোগীর ক্রমোন্নতি বন্ধ হওয়ায়, **কেলি-বাই**—২০০ আরও তিন দিন দিবার ১০।১২ দিন পর পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন না পাইয়া **কেলি-বাই**—১০০০ এক মাত্রা।

৭।৯।১৩—ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে ; নাকটা যেন পড়িয়া যাওয়ার মত হইয়াছিল, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল দেখা গেল। ফলতঃ সামান্য সামান্য বাতের বেদনা ও সামান্য সামান্য জ্বর নিত্য বৈকালে হইতে লাগিল। **আর্সেনিকাম এলবাম**—২০০—চারি মাত্রা, সপ্তাহে দুই বার দেওয়ায় আরাম হয়। অল্প দিন অর্থাৎ ১৫।২০ দিন পরে ঐরূপ হওয়ায়, আরও ২।১ মাত্রা দিতে হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় তিন মাস রোগীর বাড়ী হইতে কোনও সংবাদ পাই নাই, ফলতঃ ভালই আছেন। এস্থানে রোগী নির্ম্মল আরোগ্য হইয়াছেন, কেন বলা যায় না, তাহা তাহার সুপণ্ডিত পিতাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায়, তিনি চিকিৎসা পুনরায় চালাইবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং রোগীর লিপি হইতে ধাতুগত লক্ষণের সমষ্টি লইয়া **কেলি-আর্স**—১এম দিয়াছিলাম। ইহাতেও স্থানীয় ক্ষত অর্থাৎ সিফিলিসের ক্ষত বাহির হইল না। ১০এম একমাত্রা দিবার ১৫।২০ দিন পরে ঐ ক্ষত ফিরিয়াছিল এবং প্রায় তিন সপ্তাহ ক্ষত থাকে ও অন্য কোনও ঔষধ না দেওয়া সত্ত্বেও আরোগ্য হয়। ক্ষত আরোগ্য হইল, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন গেল না। ফলতঃ রোগী বা তাহার পিতা মহাশয় বড় আগ্রহ না দেখান জন্য, আর চিকিৎসা চালাইতে পারি নাই।

মন্তব্য—(১) সিফিলিস্ দোষটী সোরার সহিত মিলিত না হইলে বাঘী (বিউবো) দেখা দেয় না। এজন্য দেখা যায় যে, বাঘী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল সিফিলিস্ **পীড়া** জনিত ক্ষত নিশ্চিহ্ন আরোগ্য করিলেই সিফিলিস্ **দোষটী** আসিতে পায় না এবং সোরার সহিত মিলিত হইয়া অন্যান্য রোগলক্ষণের সৃষ্টি করিবার আর অবকাশ পায় না। এক্ষেত্রে সে সুবিধা ঘটে নাই।

(২) ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসক মহাশয়েরা কেবল **চাপা** দিয়াছিলেন মাত্র। চিকিৎসার দ্বারা সিফিলিস্ দোষ নির্ম্মল করিবার সাধ্যও

তাঁহাদের নাই এবং আদৌ প্রয়োজন বলিয়া উপদেশও দেন নাই।

(৩) ক্ষত লক্ষণ গুলির উপরেই সর্ব্বপ্রথম ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কেন না সেগুলি তখন প্রধান। তবে রোগীর ধাতুগত লক্ষণ সমষ্টির উপর ২য় নির্ব্বাচন না করিলে সিফিলিসের স্থানীয় ক্ষত বাহির হয় না, এক্ষেত্রে হইল না, এজন্য **কেলি আর্সে'র** প্রয়োজন হইয়াছিল। এ সময় সোরার দ্বারা যেন ক্রিয়া রোধ হইতেছিল বলিয়া **সালফার** দেওয়ার প্রয়োজন হয়। তাহার ক্রিয়ায় কেবল সোরার রোগ সৃষ্টি করিবার শক্তিটীকে যেন এ পথে আসিতে না দিয়া মোড় ফিরিয়া অন্য দিকে অন্য পথ ধরিতে পারে, এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল এবং তাহার ফলে কেলি-আর্স নিজের ক্রিয়া করিতে অবসর পাইয়া সিফিলিসের ক্ষতগুলি পূর্ব্বাকারে ফিরিয়া আনিতে সক্ষম হইল।

(৪) ক্ষত সারিবার একটী **নিদর্শন**—তাহার দাগগুলিও না থাকা এবং নিকটবর্ত্তী চর্ম্মের স্বাভাবিক বর্ণগ্রহণ; তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত রোগী হিসাবে আরোগ্য হওয়াটী ঠিক হয় না। এক্ষেত্রে বর্ত্তমান রোগীটী আর চিকিৎসা করিতে না পাওয়ায় সে সুবিধা পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ কেলি-আর্সের উচ্চতর শক্তি আরও প্রয়োগ করিতে পাইলে, বোধ হয়, সে ফল লাভ হইতে পারিত। কিন্তু ইহা আমার ধারণামাত্র, এজন্য ইহার কোন মূল্য আছে কি না, তাহা বিচার্য্য।

(৫) ৪র্থ মন্তব্যের শেষে যে ধারণার কথা লিখিয়াছি, অর্থাৎ কেলি-আর্সেরই উচ্চতর শক্তির দ্বারা দাগ পর্য্যন্ত আরোগ্য করিবার কথা কহিয়াছি, তাহা এক্ষেত্রে অবশ্য প্রযুজ্য, কেননা রোগীর তখনও ঐ ঔষধেরই লক্ষণসমষ্টি ছিল। কিন্তু যদি অন্য কোনও ঔষধের লক্ষণাবলি উপস্থিত হইত, তবে কেলি-আর্সকে বাদ দিয়া লক্ষণসাদৃশ্য অনুসারে

যে ঔষধ নির্ব্বাচিত হইত, তাহাই দেওয়া উচিত হইত এবং তাহা দ্বারাই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইত।

*১০নং রোগী,...........উন্মাদ, প্রতি গর্ভেই উন্মত্ত হইবার প্রকৃতি এবং অন্যান্য রোগ।

১৯১৮।২৪শে ফেব্রুয়ারী।

শ্রীমতী............দেবী,স্বামী কালিপাহাড়ীর কোনও কলিয়ারীতে, কলিয়ারী সংক্রান্ত চাকুরী করেন। রোগিণীর বয়স ৩০।৩১ বৎসর। অতিশয় নম্রস্বভাবা, বুদ্ধিমতী, গৌরী, শীর্ণা, (রোগের জন্য, রোগের পূর্ব্বে দোহারা), কর্ম্মপটু এবং ধর্ম্মপ্রাণা। তাঁহার ৪র্থ বার গর্ভাবস্থায় আমি জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ৩টী গর্ভের ৩য় বা ৪র্থ মাস হইতে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বামী পুরুলিয়ার সাবজজ আদালতে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া শোনেন যে, আমার দ্বারা তাঁহায় পত্নীর চিকিৎসা হইলে আরোগ্য সম্ভাবনা, এজন্য বৈকালে আমার নিকট আসিয়া সকল কথা পরিচয় দেন, এবং তাহার পর আমি তাঁহার বাটীতে গিয়া রোগিণীকে দেখিয়া লিপি তৈয়ার করিয়া আনি। প্রত্যেক গর্ভেই উন্মাদলক্ষণ বড়ই আশ্চর্য্যজনক, ও চিকিৎসকের পক্ষে বড়ই কৌতুহলের বিষয়। এজন্য আমি অত্যধিক যত্নসহকারে রোগিণীর চিকিসার ভার গ্রহণ করি। যাহা হউক, আরও একটী বিষয় এখানে বলা উচিত যে, যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে স্বামীর বা তাহার পূর্ব্বপুরুষের এবং স্ত্রীর পিতৃকুলে কোনও প্রকার দোষের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেবল যে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, রোগিণীর একটী খুল্লতাত উন্মাদ রোগে জলমগ্ন হইয়া ইচ্ছা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং রোগিণীর পিতা গ্রহণী রোগে তিন বৎসর ভোগ করিয়া মারা যান। স্বামীর

পিতার শ্বাস-কাশের পীড়া ছিল এবং তাহাতেই নিউমোনিয়াদি ২।১টী উপসর্গ আসায় মৃত্যু হইয়াছিল। অন্য আর কোনও বিশেষত্ব পাওয়া যায় নাই। স্বামী নিজে কয়লাখাদের নিচে অধিকাংশ সময় থাকিয়া কাজ করেন, পূর্ব্বে সারভেয়ার ছিলেন, এক্ষণে ম্যানেজার হইয়াছেন।

রোগীলিপি :—বিবাহ হইবার (১৩ বৎসর) পূর্ব্বে তাঁহার মাতা কহিতেন যে, বাল্যকাল হইতেই সামান্য সামান্য শ্বেতপ্রদর স্রাব হইত, বিবাহের পূর্ব্বেই তাহা একজন কবিরাজের চিকিৎসায় আরাম হইয়াছিল। বিবাহের পর ৩।৪ মাস পরেই তিনি রজঃস্বলা হন এবং প্রথম হইতেই অতিশয় বেদনার সহিত সামান্য মাত্র ২।১ দিন স্রাব হইয়া বন্ধ হইত। এইরূপ ৩।৪ বৎসর থাকার পর তাঁহার কবিরাজী চিকিৎসায় কতক উপশম হইবার পরে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় ২।৪ মাস স্রাব একটু বেশী হইতে থাকে, যন্ত্রণাও সামান্য কম হয়, এরূপ সময়ে ১ম গর্ভ হয়। ৪র্থ মাসে উন্মাদ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। সে উন্মাদের লক্ষণাদি স্বামী বলিতে পারিলেন না; কেন না, তিনি চাকুরীস্থলে ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী বাড়ীতে ছিলেন। প্রসবের প্রায় এক মাসের পরে প্রসূতির ঠিক হয় যে, তাঁহার একটী সন্তান হইয়াছে। ১ম ও ২য় গর্ভের মধ্যে ৪ বৎসর ব্যবধান—এই ৪ বৎসর তাঁহার ঋতুস্রাব প্রায়ই ছিল না, সামান্য দাগ লাগিত মাত্র। কোষ্ঠবদ্ধ যদিও তাঁহার অতিশয় স্বাভাবিক লক্ষণ অর্থাৎ বাল্যকাল হইতেই আছে, তবুও এই সময় হইতে অতিরিক্ত হইল, প্রায় ৩।৪ দিন পরে মল হইত। আরও একটী নূতন লক্ষণ দেখা দিল—মাসে এক বার বা দুই মাসে একবার, নাকে সর্দ্দি হইত এবং সেজন্য তাঁহার বড়ই কষ্ট হইত। সর্দ্দির সময় এবং অন্য সময় রৌদ্রে বাহির হইলে শিরঃপীড়া হইত এবং নিচের দিকে চাহিতে পারিতেন না। শিরঃপীড়ার সময় স্থিরভাবে দরজা ও জানালা খুলিয়া দিয়া নির্জ্জনে শয়ন করিয়া থাকিতেন। এগুলি ব্যতীত এ সময় আর কোনও

লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। চিকিৎসা কখনও এলোপ্যাথি কখনও কবিরাজী হইয়াছিল, বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ২১।২২ বৎসর বয়সে ২য় গর্ভ হইয়াছিল এবং ৪র্থ মাস হইতেই উন্মাদলক্ষণ দেখা দিল। এবারকার লক্ষণ সকল স্বামী নিজেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তিনি "সূচী বাই", অর্থাৎ সর্ব্বদা জল লইয়া থাকাই প্রধান লক্ষণ বলিয়া বলিলেন, সামান্য কারণেই অসূচীবোধ হইত বলিয়া প্রায়ই স্নান করিতেন। সর্ব্বদাই ঘোর বিষণ্ণতার সহিত এবং অতিশয় ব্যস্ততার সহিত কাজকর্ম্ম করিতেন এবং কেহ কিছু বলিলেই সর্ব্বাগ্রে ভয়ানক রাগ করিতেন ও তাহার পরেই ক্রন্দন, এবং তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিত। কেহ যদি স্বামীকে বা অপর (যে ব্যক্তির কথায় প্রথমে রাগিয়াছেন) কাহাকেও তীব্র ভৎসনা করিত এবং রোগিণীকে কেহ যেন কদাচই বিরক্ত না করে বলিয়া শাসন করিত, তবেই চুপ করিয়া অনেক-বার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার পূর্ব্বভাব ধারণ করিতেন। সামান্য ক্রন্দনে চক্ষু দিয়া প্রচুর জল বাহির হওয়া দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইত। স্মৃতিশক্তি আদৌ ছিল না, প্রাতে কি করিয়াছেন, বৈকালে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিতেন না। অন্য কোনও লক্ষণ বড় ছিল না। ৩য় গর্ভের সময় (২৫।২৬ বৎসরে) ঐ সকল লক্ষণযুক্ত উন্মাদই হইয়াছিল। ৪র্থ বার আমি নিজেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। স্নানে অতিশয় অভিলাষ এবং মেজাজ রুক্ষ ও বিষণ্ণ; অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ, মাথায় ও কপালে বেশী ঘাম হইত।

২৮।১।১৮—**নেট্রাম মিউর—২০০** নিত্য প্রাতে এক মাত্রা—৫ দিন দিবার পর বন্ধ থাকিবে। এক মাস পরে সংবার চাই। ঔষধ দিবার ১১।১২ দিন পরেই প্রসব হন। প্রসবের পর স্বেদ, ঝাল ইত্যাদির জন্য প্রায় এই মাস হোমিওপ্যাথি ঔষধ বন্ধ রাখা হয়।

১৪।৪।১৮—**নেট্রাম মিউর—২০০**, সপ্তাহে একবার, প্লাসিবো

যথেষ্ট। এক মাস পরে কোষ্ঠবদ্ধ যেন একটুখানি উপশম বোধ হওয়ায় ঔষধ বন্ধ রাখা হইল। ফলতঃ এক মাস বন্ধ রাখার পরও কোনও ক্রমোন্নতি দেখা গেল না।

১৭।৬—**নেট্রাম মিউর**—১০০০ একমাত্রা,—১৫ দিন পরে সংবাদ, কেবল কোষ্ঠবদ্ধের সামান্য উন্নতি মাত্র। আরও ১৫ দিন পরে—

১৮।৭—**নেট্রাম মিউর**—১০ এম, জলে দিয়া সমস্ত দিনে ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চারি বার দেওয়া হয়। ফাইটাম্ যথেষ্ট।

২৭।৭—সংবাদ পাইলাম যে, রোগিণী শিরঃপীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন—গিয়া জানিলাম যে, "প্রধান লক্ষণ, হাতুড়ীর ঘা মারা মত মাথার যাতনা, আজ ছয় দিন মলত্যাগ হয় নাই এবং সেদিনে যে সর্দ্দি হইয়াছে, তাহার জন্য নাক দিয়া প্রায় জলবৎ সর্দ্দি অবিরত ঝরিতেছে, কিন্তু তথাপি ঠাণ্ডাই ভাল লাগে।" ঔষধ বন্ধ—প্লাসিবো ইচ্ছামত যথেষ্ট এবং কতকগুলি প্লাসিবোর মাত্রা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হইল, যতক্ষণ শিরঃপীড়া থাকিবে, তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া চাই।

১৩।৮—রোগিণী অনেকটা ভালেই আছেন, কোষ্ঠবদ্ধ প্রায় নাই, নিত্যই মল হইতেছে। মনের একটু স্ফূর্ত্তিবোধ হইয়াছে। ঔষধ নাই।

১৪।৯—মধ্যে একদিন সামান্য শিরঃপীড়া হইয়াছিল, "পূর্ব্বেকার স্বতন্ত্র ঔষধ ২।৪ মাত্রা ছিল, তাহাতেই সারিয়া গিয়াছে।"

২১।৯—সর্ব্বাঙ্গেই "আমপাত্ত" বাহির হইতেছে, অতিশয় চুলকানি,—ঔষধ বন্ধ।

১২।১০—মানসিক স্ফূর্ত্তি আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই, কাহারও সহিত বড় কথা বলেন নাই। বিষন্নভাব অতিশয় বেশী। কোষ্ঠবদ্ধ। নেট্রাম্ মিউ—সি, এম, একমাত্রা—৫।৬টী গ্লবিউল।

২৪।১১—ঋতুস্রাব দেখা দিয়াছে, প্রসবের পর এই প্রথম, যাতনা নাই, স্রাবও অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। প্লাসিবো।

২২।১২—ঋতুস্রাব আরও বেশী, সর্ব্ব বিষয়েই ভাল, তবে কোমরে, পাছায় এবং বগলে অনেক চুলকানি ও স্থানে স্থানে দাদের মত বাহির হইয়াছে ও হইতেছে।

আর ঔষধ দেওয়া হয় নাই। আগামী গর্ভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া, আবশ্যক হইলে পুনরায় ঔষধ সেবন আরম্ভ হইবে। বলাই বাহুল্য, যথা সময়ে ২।৩ বৎসর পরে গর্ভ হইয়াছিল, কিন্তু আর উন্মাদ লক্ষণ না আসায়, রোগিণীর স্বামী চিকিৎসার আর কোনও প্রয়োজন আছে, মনে করেণ নাই। ফলতঃ রোগিণী ভালই আছেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সর্দ্দি হইবার অভ্যাসটী যায় নাই। আমাব মনে হয় আরও চিকিৎসা না হইলে রোগীহিসাবে ত সারিলই না, এবং কি জানি সর্দ্দি হওয়ার স্বভাব হইতে আরও অন্য কোনও মন্দ লক্ষণও উপস্থিত হইতে পারে।

মন্তব্য—(১) অতঃপর চিকিৎসা করাইলে, আমার ধারণা—টিউবারকুলিনাম—২০০ হইতে আরও উচ্চতর শক্তি পর্য্যন্ত দিতে হইত, তাহাতে সর্দ্দির অভ্যাসটী যাইত এবং রোগিণীও নির্ম্মল আরোগ্য হইতেন। তবে ইহা আমার ধারণা মাত্র, ইহার মূল্য বড বেশী নয়।

(২) গর্ভের সহিত উন্মাদের কি সংযোগ ছিল, তাহা আমি ঠিক করিতে পারি নাই। বোধ হয়, গর্ভাবস্থায় আরও অধিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণের অবসর পাইলে ধরিতে পারিতাম।

(৩) এই রোগিণীর চিকিৎসাকালে এপিস্, সিপিয়া ও টিউবার-কুলিনামের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। কেলি কার্ব্বও অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার রোগীর প্রয়োজন হয়। লক্ষণসমষ্টির উপর সর্ব্বদাই নির্ভর করে।

(৪) অনেক সময় একটী প্রাচীন পীড়ার রোগীতে, একটীর অধিক ঔষধ প্রয়োজন হয়, ফলতঃ প্রথম নির্ব্বাচিত ঔষধের কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হইয়া যাইবার পর যে ঔষধের লক্ষণ আসিবে, তাহাই দিতে হইবে,

লক্ষণসমষ্টি না পাইলে অন্য উপায় কি ? নতুবা, লক্ষণ না পাইলেও নেট্রাম্ মিউএর রোগীকে এপিস্ বা সিপিয়া দিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তবে, প্রায়ই অমুপূরক ঔষধ সকলের মধ্যে কোনওটীর লক্ষণই সাধারণতঃ আসিয়া থাকে।

(৫) এই রোগিণীর দেহে সোরা ও সাইকোসিস্ দোষ বর্ত্তমান। মধ্যে মধ্যে সর্দ্দি হয়, এটী সাইকোটিক্,—মনে করিলে দোষ নাই, তবে একটী কথা আছে। সর্দ্দিটী সাইকোটিক্ বটে, কিন্তু **প্রায়ই সর্দ্দি হইবার অভ্যাসটী** টিউবারকুলার দোষ হইতে জন্মে।

---

*১১নং রোগী—লোহিতজ্বর ও ক্রিমিদোষ।

১৯১৫।২রা ফেব্রুয়ারী

শ্রী............নন্দী, জাতিতে ময়রা, ব্যবসা—ময়রার দোকান চালান ও নানাপ্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ার করা, বয়স ২৪।২৫ বৎসর। চারি বৎসর কাল ধরিয়া জ্বর এবং তৎসঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাভ হইয়া যাওয়া, ক্রিমির দোষ, বুকধড়্ফড়ানি ইত্যাদিতে কষ্ট পাইতেছে। সর্ব্বপ্রথম, ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে, সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর হয়, এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় জ্বরটী বন্ধ হইয়া যায়, তাহার ২।৩ মাস পর হইতে, মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ ৩।৪ মাস পরে পরে, নিত্য বৈকালে সামান্য সামান্য জ্বর হয় ও গোটা দেহটী হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়, আহারে আদৌ রুচি থাকে না, ক্রিমির দোষ ঘটে, ইত্যাদি। তাহার ও তাহার বাটীর লোকের ধারণা যে, প্রায়ই অগ্নিতাপে কাজ করিতে হয়, এজন্যই হইয়াছে। যাহা হউক, অনেক প্রকার জড়ী বড়ী, কবিরাজী, এলোপ্যাথি চিকিৎসা হইবার পর, আমার নিকট আসে ও নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি লিখিয়া লই।

মধ্যে একটী কথা বলিলে ভাল হয়। উপরে যাহা লিখিত হইল, উহা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট, কেননা, একটী নাম পাইলেই

যথেষ্ট হয়। আমাদের তাহা হয় না। ঐ সকল যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা কেবল **অবস্থা ও রোগের ফল মাত্র**, কেহই **লক্ষণ** নয়। যে যে লক্ষণ লিপিবদ্ধ হইল, সেগুলি না হইলে কেবল উপরোক্ত গুলির দ্বারা কখনই হোমিওপ্যাথির ঔষধ নির্ব্বাচন হইতে পারে না।

লক্ষণ লিপি—রোগীর জ্বরের প্রধান কষ্ট,—মাথাবাথা, ঘাড়ের দিকে, প্রায়ই সকালেই বেশী; মনে হয় যেন মাথাটী ফাটিয়া যাইবে, আর যদি ফাটে, তবে ঘাড়েই ফাটিবে, মনে হয়; আরও মনে হয় যেন শরীরের সবটুকু রক্ত মাথার দিকে উঠিতেছে, হঠাৎ ঐ প্রকার অনুভব হয়; মাথার উপরে, মধ্যে মধ্যে ছোট ও বড় ফোড়া হয়, তাহাতে বড় কষ্ট ও কেবলই রক্ত পড়ে। কখনও কখনও রক্তবাহ্যে হয়, পেটে কিছু থাকে না এবং বমির সঙ্গে কখনও কখনও রক্তবমিও হয়। হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গটী হরিদ্রাভ হইয়া যায়। জ্বরটী ২।৫ দিন নিত্য বৈকালে ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া হয় এবং তাহার সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাভ হইয়া যায়, দুর্গন্ধ, তরল মল ও কখনও কখনও তাহার সঙ্গে কাল কাল রক্ত থাকে। নিদ্রাটী অতিশয় কষ্টকর। নিদ্রা প্রায়ই ভাল হয় না, না হইলেই যেন ভাল হয়, কেন না যদি রাত্রে ২।১ ঘণ্টা নিদ্রা হয়, তবে তাহার মধ্যে এত ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিতে হয়, যে তাহার জন্য ভয়ে হঠাৎ ঘুমটী ভাঙ্গিয়া যায় ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুকটি দুদ্দুর্ করিতে থাকে। রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া যায় যে, সর্ব্বদাই কাঁপিতে থাকে। এই প্রকার ৭।৮।১০ দিন থাকিয়া আবার প্রায় ১মাস বেশ ভাল থাকে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে আরও বেশী দিন ধরিয়া ভাল থাকিত, ক্রমে ভাল থাকার সময়টী কমিয়া কমিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসরই ফাল্গুন ও চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত বড় বেশী বাড়াবাড়ি হয়, বর্ষাকালে ও শীতকালে অনেকটা ভাল থাকে। রোগীর মেজাজ বড় খারাপ, সহজেই রাগে এবং সেই রাগ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। লিভারের স্থানটী খুবই শক্ত হইয়াছে, এবং বেদনা জন্য

দক্ষিণপার্শ্বে আদৌ শয়ন করিতে পারে না। আহারে রুচি নাই, দুগ্ধ বেশ পছন্দ করে। ইহা ব্যতীত, আর একটী অদ্ভুদ্ লক্ষণ আছে, রোগীর ঘর্ম্ম আদৌ নাই। জ্বর যদিও বেশী উঠে না, কিন্তু জ্বরের ত্যাগ কালে অথবা অনেক পরিশ্রম করিলেও ঘাম কখনও হয় না। অগ্নি-তাপে কাজ করিতে বড় কষ্ট হয়, কিন্তু ব্যবসার জন্য করিতে বাধ্য হয়। এজন্য উননের সাম্‌নে একটু কিছু আড়াল দিতে হয়, যাহাতে তাপটী বেশী না লাগে।

৫।২।১৫—ক্রোটেলাস্ ২০০ শক্তি, সপ্তাহে এক বার, সন্ধ্যার পর, ব্যবস্থা হইল। তবে ঔষধ খাইতে খাইতে, ঐ ৫।৭ দিন ব্যাপী জ্বরের প্রকোপ হইলে ঔষধ বন্ধ থাকিবে এবং প্রকোপটী শেষ হইবার পরেই এক মাত্রা খাইবে, এক মাস পরে সংবাদ দিবার কথা থাকিল।

২।৩।১৫—ঔষধ সেবনের পর, মাত্র একবার ঐ প্রকার প্রকোপ হইয়াছে, এখনও বিশেষ কোনও উন্নতি লক্ষণ দেখা যায় নাই। ঔষধ চারি মাত্রা দেওয়ার পর বন্ধ থাকিবে এবং ইহার পরে জ্বর হইলে জ্বরের সময় আমাকে যেন ডাকা হয়।

৬।৫।১৫—জ্বর হইয়াছে, পূর্ব্বের মত বর্ণ খারাপ ততটা হয় নাই এবং বিশেষ কথা, রক্তবাহে বা বমন আদৌ হয় নাই, তাহা ছাড়া একটু অধিকদিন ব্যবধানে জ্বরটী হইয়াছে। ঔষধ ঐ, ১৫ দিন ব্যবধানে দুই মাত্রা।

২১।৮।১৫—জ্বর সেরূপ টের পাওয়া যায় নাই, সামান্য বিবর্ণতা দেখা দিয়াছে মাত্র, রোগীর ইতিমধ্যে অনেকটা বল সঞ্চয়ও হইয়াছে। লিভারে বেদনা সামান্তই আছে। ক্রোটেলাস—৫০০,—এক মাস পরে পরে, দুই মাত্রা। এ পীড়ার জন্য আর ঔষধ দিতে হয় নাই।

১৭।১১।১৫—রোগীর ম্যালেরিয়া জ্বর, শীত করিয়া আসিয়াছে, পূর্ব্ব প্রকারের জ্বর নয়, তরুণ জ্বর, নেট্রামের লক্ষণ পাইয়া নেট্রাম

২০০,—দুই মাত্রাতেই বন্ধ হইয়া যায়। আর কোনও ঔষধ দিতে হয় নাই।

মন্তব্য।—এই রোগীটীর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা না হইলে প্রাণের আশা ছিল না। ইতিপূর্ব্বে যিনি যাহা চিকিৎসা বলিয়া করিয়াছেন, সকলেই কেবল "লিভারটীর দোষেই জ্বর" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই লিভারের উপরে নানা প্রকার প্রলেপাদি দেওয়া এবং ভিতরেও যাহাতে লিভারটী "ভাল" হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। এ ধারণাটী সম্পূর্ণ ভ্রম। যাঁহারা বলেন যে লিভারের জন্য জ্বর, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, লিভার পীড়িত হয় কেন? লিভারটীর পীড়া কাহার জন্য? প্রকৃত কথা, **পীড়ার জন্যই** লিভারের ক্রিয়া সুচারুরূপে হইতে পারে নাই এবং পীড়ার জন্যই রোগীর নানা প্রকার কষ্ট ও জ্বর। রোগই সকলেরই কারণ। কাজেই লিভারের দোষ কখনই কারণ নয়, পীড়ারূপ কারণের কার্য্য বা ফল। শারীরিক কোনও যন্ত্রবিশেষের দোষে কোনও পীড়া হয় না। বরং **পীড়ার জন্যই** যন্ত্রবিশেষ তাহার নিরূপিত স্বাভাবিক কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। **জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলাই পীড়া।**

* ১২নং রোগী,—এজ্‌মা বা হাঁপানী।

১৯২২।১৭ই সেপ্টেম্বর।

শ্রীযুক্ত.........হালদার, রেলওয়ে কর্ম্মচারী, বয়স ৩৫।৩৬, সুগঠন, স্থূলদেহ, নির্ম্মল গৌরবর্ণ। আজ প্রায় ১২ বৎসর কাল হাঁপানিতে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার ধারণা, এ রোগ সারে না, কেননা তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে ১০০ বোতলের অধিক, তিনি এই কয় বৎসরে কড্‌লিভার অয়েল খাইয়াছেন এবং ৬টী ইন্‌জেকসেন লইয়াছেন, ইহাতেও যখন যায় নাই, তখন ইহা "শিবের অসাধ্য" ব্যাধি। বাস্তবিকই তিনি

নাকি কোন্ মহাদেবের মণ্ডপে "হত্যা"ও দিয়াছিলেন এবং মহাদেব যে ঔষধটী বলিয়া দেন, তাহা নাকি তার পরদিন একেবারেই ভুলিয়া যান এবং পুনরায় "হত্যা" দেওয়ায় আর মহাদেবের অনুগ্রহ হয় নাই। আমাকে কেবল একদিন রাত্রে তাঁহার হাঁপের অত্যন্ত বাড়াবাড়ির সময় ডাকেন, যাহাতে একটু সাময়িক উপশম দিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা হয়। স্থায়ী ভাবে চিকিৎসা করান পরে বিচার্য্য। যাহা হউক, আমি লক্ষণাদি দৃষ্টে **কার্ব্বো ভেজ ২।১টী** মাত্রা দেওয়ায় সে রাত্রে তিনি একটু ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার এত শীঘ্র উপশম নাকি ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই, সেজন্য একবার হোমিওপ্যাথিটাকে পরীক্ষা করিবার মতলব হয়। এ চিকিৎসায় তাঁহার আদৌ শ্রদ্ধা নাই, ও ছিল না, তাহার কারণ, পূর্ব্বোল্লিখিত এত কড্‌লিভার অয়েলে যখন কিছুই হয় নাই, তখন এই হোমিওপ্যাথিক ক্ষুদ্র বটীকাতে ফলের আশা করা একেবারেই বাতুলতা। ফলতঃ তাঁহার বৃদ্ধ পিতা পাগল বলিয়া পরিগণিত হইতেও রাজী হইয়া আমার উপর স্থায়ী চিকিৎসার ভার দিলেন। আমি যখন হাঁপানির লক্ষণ বাদে, রোগীর শরীরের ও মনের অন্যান্য লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়া লিপিবদ্ধ করি, তখন রোগী অতিশয় হাস্য পরিহাস করিয়া মনে মনে একেবারে সাব্যস্তই করিলেন যে আমার ন্যায় পাগল ও বুজ্‌রুক আর দুটী নাই। যাহা হউক, আমি নিম্নলিখিত লিপি করিয়াছিলাম।

লক্ষণ-লিপি—হাঁপানির বাড়াবাড়ির সময় রোগীকে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া থাকিতে হয় এবং কপালে অতিরিক্ত ঘাম হয়, একজন লোককে সর্ব্বদাই পাখার বাতাস করিতে হয়, রোগীর প্রাণের ভিতরে অতিশয় ব্যাকুলতা আসে। মনে হয়, যেন আর প্রাণ থাকে না, যেন মরিয়াই যাইব, এত নিশ্বাসের কষ্ট। প্রাতঃকালের দিকে, ভোরের সময় থোবা থোবা শ্লেষ্মা উঠে এবং শ্বাসকষ্ট কতকটা কম বোধ হয়।

প্রতি রাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে। আবার এদিকে, হাতের তলা, পায়ের তলা এবং মাথার তালুতে ভয়ানক জ্বালা, এজন্য জল দিয়া মধ্যে মধ্যে ঐ স্থান গুলি ভিজাইতে হয়। রোগী ক্রমেই দুর্ব্বল হইতেছেন এবং অনেকটা দুর্ব্বল হওয়ায় জীবনে আরও নৈরাশ্য আসিয়া পড়িয়াছে। মেজাজ বড খিট্খিটে, সামান্য কিছু বলিলেই অতিশয় রাগ করেন ও সে রাগ সহজে যায় না। বংশ এবং নিজের জীবনেতিহাস হইতে বিশেষ কোনও সাহায্য পাইলাম না, তবে এই মাত্র জানা গেল যে রোগীর আঙ্গুলের ফাঁকে, কনুই এ, হাঁটুর নিচে ও পায়ের পাতায় বাল্যকালে খুব মোটা মোটা খোস হইত, তাহাতে অনেক পূঁয জমিত ও প্রাতঃকালে সেগুলি ছুঁচের দ্বারা গালিয়া ও সাবান এবং গরম জলের সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হইত। অনেক দিন প্রায়ই প্রতি বৎসব বর্ষাকালে ও আশ্বিন মাসে ঐরূপ হইত, শেষে কবিরাজী ঔষধ খাওয়া ও ডাক্তারী মলম ব্যবহার করিয়া সারে। বেশ বড় বড় কালো দাগও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

১৯।৯।২২—**কার্ব্বো ভেজ**—২০০, নিত্য একমাত্রা প্রাতঃকালে, তিন দিন দিবার পর অনেক উপকার বোধ হইল এবং প্রায় ২০।২৫ দিন আর হাঁপের কষ্ট হইল না, প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠিতে লাগিল ও মনে হইল যেন রোগী আরোগ্যের পথে আসিতেছে, কিন্তু ১৬।১০ তারিখে সংবাদ আসিল যে, পূর্ব্ব রাত্রিতে অতি ভয়ানক টান গিয়াছে, এরূপ টান আর পূর্ব্বে কখনই দেখা যায় নাই। পুনরায় **কার্ব্বো ভেজ**—২০০, দেওয়াতে কোনও ফল হইল না। ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিয়া ২৪।১০—**সালফার**—৩০, ২০০, ক্রমে ক্রমে দেওয়াতেও কোনও ফল হইল না।

৩।১১—**কার্ব্বো ভেজ** ৫০০, এবং ১০।১২ দিনের মত প্লাসিবো।

১৫।১১—রোগীকে দেখিতে গিয়া মনে বড়ই বেদনা হইল, প্রায়

আসন্ন মৃত্যুর অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, আমার ঔষধ দেওয়া নিশ্চয়ই ভুল হইয়াছে। নির্ব্বাচন ঠিক হইলে কখনই এরূপ ফল হইত না। রোগীর লিপিখানি উত্তমরূপে বার বার পাঠ করিয়াও কোন সাহায্য পাইলাম না। ইতিমধ্যে রোগী আমায় পরিচয় দিলেন যে, "সময় পাইয়া আমার অর্শোপীড়ারও যাতনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অত্যন্ত কষ্ট, ইহার কোনও উপায় করিলে বড় ভাল হয়। হাঁপের বড় কিছু হইবে না।" আমার নিজের রোগীলিপির অসম্পূর্ণতায় মনে বড় ক্ষোভ আসিল। যাহা হউক, এতক্ষণে একটী উপায় পাইলাম এবং তখন ১৬।১১—**নেট্রাম সালফ**—১০০০ এক মাত্রা দিলাম, জল দিয়া নিত্য প্রাতে নাড়িয়া নাড়িয়া এক বার করিয়া দিবার পর, ২য় দিনে অর্থাৎ ১৭।১১ তারিখের রাত্রে, হাঁপের টানের অনেক উন্নতি বোধ হয় এবং ৩য় দিনে হাঁপ প্রায় নাই, ও ১৯।১১ তারিখে টান আদৌ দেখা দিল না। কতকগুলি প্লাসিবো রাখিয়া আসিলাম।

৮।১২—"অদ্য রাত্রে বোধ হয় জানাইবে, কেননা, বৈকালে বুকটী ভারবোধ হয়, অদ্য যেন বুকটী ভারবোধ হইতেছে। সে রাত্রিতে সামান্য টান হইয়াছিল।"

৯।১২—প্রাতঃকালে **নেট্রাম সালফ**—১০০০, আর একমাত্রা—পূর্ব্ববারের মত না দিয়া ৪।৫টী গ্লবিউল মুখে দেওয়া হয়। ইহার পরে আর শ্বাসকষ্ট জানায় নাই কিন্তু অর্শোরোগের বিশেষ কোনও উপশম হয় নাই। ৩।৪ মাস পরে লক্ষণানুসারে **নাইট্রিক এসিড**—১০০০ দিয়াছিলাম, মনে ধারণা ছিল, রোগীটিকে এবার রোগীহিসাবে এণ্টিসোরিক্ এবং এণ্টিসাইকোটিক্ চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করিব, কিন্তু রোগী অল্পদিন পরেই টঙ্গুলায় বদলী হইয়া যাওয়ায় এবং আর কোনও আগ্রহ না দেখিয়া অগত্যা চিকিৎসা ঐখানেই শেষ হইয়াছিল।

মন্তব্য।—(১) শ্লেষ্মাবহুল হাঁপানি প্রায়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

সাইকোটিক, এবং এন্টিসাইকোটিক ঔষধ, লক্ষণসমষ্টি অনুসারে না দিলে উপায় নাই। তবে যেখানে রোগীর লক্ষণানুসারে, প্রকৃতি ও হাঁপের লক্ষণ একত্রে, এন্টিসাইকোটিক্ ঔষধ না পাওয়া যায়, সেখানে লক্ষণ-সাদৃশ্যানুসারে ঔষধ দিয়া, মধ্যে মধ্যে এন্টিসাইকোটিক্ ঔষধ দিতে হয়। যদিও সেরূপ ক্ষেত্র নির্ম্মলারোগ্য আশা করা যায় না, তবে অনেক উপশম হয়।

(২) যেখানে শ্লেষ্মাপ্রধান হাঁপ নয়, সেখানে লক্ষণানুসারে ঔষধ দিবার পর, এবং সেই ঔষধ এমনকি অতি গভীর কার্য্যকারী এন্টিসোরিক্ ঔষধ হইলেও, প্রায় টিউবারকুলিনাম্ বোভিনাম্ বা ব্যাসিলিনাম্ না দিয়া আমার হাতে কোনও রোগীকে সারাইতে পারি নাই। অন্যের অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহা জানি না।

(৩) হাঁপানি রোগীর চিকিৎসা বড়ই কঠিন, কেন না ইহা একটী দোষ হইতে প্রায়ই উৎপন্ন হয় না এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রায় সাধারণ লক্ষণগুলি পরিস্ফুট থাকে ও বিশেষ লক্ষণ লুক্কাইত থাকে, সহজে ধরা পড়ে না।

*১৩নং রোগী,—কেরিজ বা অস্থিক্ষয় এবং তাহার সঙ্গে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ।

১৯২০।২৪ ডিসেম্বর।—

শ্রী.........দত্ত দাঁ—জাতি তামুলী, বেনেতি মসলার দোকান আছে, তাহারই ব্যবসা করে এবং সামান্য চাষের কার্য্যও করিয়া থাকে। বয়স ৪০ ৪২ বৎসর হইবে, আজ ১০।১২ বৎসর হইতে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তাহারই নিকটবর্ত্তী আরও দুইটি আঙ্গুলের অস্থিক্ষয় হইয়াছে। সর্ব্ব-প্রথমে একটী সামান্য ফুস্কুড়ী হয়, তাহা হইতে ক্রমাগত রস ও রক্ত নির্গত

হইতে থাকে, নানাপ্রকার মলম ও চাপান লইয়া কিছু না হওয়ায় হাঁসপাতাল হইতে ঔষধ আনিয়া লাগান হয়, শেষে অস্ত্র করাইয়া কিছু-দিনের জন্য যেন ভাল থাকে। ২।৩ মাস পরে আবার সেই স্থানেই ছোট একটী স্ফোটক হইয়া পুনরায় রস ও রক্ত ঝরিতে থাকে। ডাক্তারেরা কহিলেন—আবার কাটিতে হইবে, তাহাই হইল, আবার ২।৪ মাস ভাল থাকিয়া ঐ প্রকারই হইল, তখন ডাক্তার বাবুরা ২।৪টী বোতল সালসা খাওয়া ও ঐ স্থানটী আবার কাটান উপদেশ দিলেন, তদনুসারে কার্য্য হইল, কিন্তু কোনও স্থায়ী উপকার না পাইয়া রোগী এলোপ্যাথিক সার্জ্জেনের হাতে আর যাইল না। লোকে বলে হোমিওপ্যাথিকে স্থায়ী উপকার হইবে, আর কাটাইতে হইবে না। এইটীই তাহার প্রধান আশ্বাস হইয়া উঠিল। যাহা হউক, রোগী আমার নিকটে আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল।

ক্ষতলক্ষণ—দুর্গন্ধ সাদাটে ময়লা পূঁয ক্ষরণ হইয়া থাকে, এবং অতিশয় জ্বালা, ছুঁচফোটান বা হুলফোটান মত যাতনা, ঠাণ্ডাতে, ঠাণ্ডাজলে কষ্ট বাড়ে, গরমে ভাল থাকে, এমন কি, ঠাণ্ডা বাতাসেও কষ্ট হয়। ক্ষতস্থানটী সামান্য স্পর্শ করিলেও ভয়ানক যাতনা ও দরদ্ হয়। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে এক খানি গরম কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইতেছিল এবং তাহাতে বেশ আরাম বোধ হয়। ফলতঃ যতই বাঁধিয়া রাখা হউক, সর্ব্বদাই অতি দুর্গন্ধ পূঁয ঐ বাঁধন ভেদ করিয়া গড়াইতে থাকে।

রোগীর **ধাতুগত লক্ষণ**—মধ্যে মধ্যে সর্দ্দি লাগে, ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, বিশেষতঃ শীতকালে যেন হাড় পর্য্যন্ত কন্ কন্ করে, ঠাণ্ডাতে মুখ, ঠোঁট, গাল, পা, হাত, সকল জায়গাই ফাটে। মেজাজ বড় রুক্ষ, হঠাৎ ক্রোধ হয় এবং বড়ই একগুঁয়ে। জিজ্ঞাসা করার পর কহিল—"হাঁ আমার প্রস্রাবে অতিশয় দুর্গন্ধ।" আর নির্ব্বাচনের

কোনও গোল থাকিল না, তবে ক্ষতের পুঁযটী রক্তমাখান হইলেই যেন আরও ভাল হইত। যাহা হউক, ক্ষতটী হইতে এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রলেপাদি অতি পরিষ্কারক্ষপে ধৌত করাইয়া এবং বাঁধিয়া রাখিতে হইলে অন্য কোন নূতন বস্ত্রে হইবে, উপদেশ দিয়া, ২৭।১২।২০—**নাইট্রিক এসিড**—৩০, নিত্য এক মাত্রা, প্রাতে। ক্ষতে কোনও ঔষধ বা প্রলেপাদি একেবারে নিষেধ, যদি বিশেষ আবশ্যক বোধ করে, তবে যে তৈল রোগী নিত্য মাখে, তাহাই দুই এক ফোঁটা দিতে পারা যায়, তাহাও না দিলেই ভাল হয়। সাত দিন ঔষধ খাইবার পর ঔষধ বন্ধ করিয়া প্লাসিবো চলিবে।

১১।১।২১—জ্বালা অত্যন্ত বাড়িয়াছে, রোগী বড অস্থির হইয়াছে। কোনও ঔষধ দেওয়া হইল না:

১৪।১।২১—সংবাদ পাওয়া গেল যে রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তীব্র জ্বালার জন্য বিশেষ অস্থির হইয়াছে। এই প্রকার অস্থিরতা দেখিয়া **আর্সেনিকাম্ এল্বাম**—২০০, দুই মাত্রা ৮ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া হইল, উহাতেই এতটা অস্থিরতা ও তীব্র জ্বালা নিবারণ হইবার পূর্ব্বভাব আসিল।

২০।১।২১—ক্ষতের কোনও উন্নতি পাওয়া গেল না, পূঁযস্রাব সমানই চলিতেছে। **নাইট্রিক এসিড্**—২০০, ২ দিন অন্তর ১ মাত্রা, ৩ মাত্রা দিবার কথা বলিয়া, যথেষ্ট প্লাসিবো দেওয়া গেল।

৫।২।২১—দেখা গেল যে, পূঁযের মাত্রা যেন কিছু কম হইয়াছে, বাকি সকল লক্ষণ তাহাই আছে। ঔষধ দেওয়া হইল না।

২০।২।২১—বিশেষ কোনও উন্নতি না দেখিয়া **নাইট্রিক এসিড**—২০০, আবার ১ দিন অন্তর ১ মাত্রা, মোটে ৩ মাত্রা।

৬।৩।২১—কোন ও উন্নতি নাই,—**সালফার** ২০০, এক মাত্রা।

২১।৩।২১—কোনও উন্নতি নাই,—**নাইট্রিক এসিড**—৫০০, এক মাত্রা।

৮।৪।২১—নিজেই রোগীর ক্ষত দেখিয়া জানিলাম যে দরদ্ ততটা নাই এবং পূঁযের মাত্রা অনেক কম হইয়াছে ও বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায় নাই। ঔষধ—প্লাসিবো।

২৪।৪।২১—ক্ষতটী ভাল হইয়াছে, এরূপ ভাল মধ্যে মধ্যে আপনিই হইয়া থাকে, এজন্য বিশেষ কিছু বলা যায় না।

১১।১০।২১—প্রায় ৬ মাস পরে আবার ঐ স্থানে একটী ছোট ফস্কুড়ী মত হইয়া সামান্য দরদ্ হইয়াছে, দেখিয়া উহা যে কতদূর পর্য্যন্ত হয় এবং কি কি লক্ষণে হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য কোনও ঔষধ দিলাম না।

১৯।১০।২১—জানা গেল যে ইহার মধ্যেই ক্ষতটী অতি সামান্য হইবার পর আপনিই সারিয়াছে। **নাইট্রিক এসিড**—১০০০ একমাত্রা। আর ঔষধ দিতে হয় নাই। তবে রোগীভাবে সারাইবার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, তাহা করিবার অবসর পাই নাই।

ঐ রোগীর কোনও অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের হানি হয় নাই, কেবল তিনটী অঙ্গুলি ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল সার্জ্জেন সাহেবের অস্ত্রোপচারের ফলে।

মন্তব্য।—(১) এই রোগীর মূত্র লক্ষণ না পাইলে নাইট্রিক এসিড্ অনেকের মনে না আসার কথা। হয়ত অনেকে হিপার সাল্‌ফার দিবার কথা বলিতে পারেন, কিন্তু হিপারের পূঁয ঘন, ও এত দুর্গন্ধ নয়। মূত্র লক্ষণ না পাইলেও নাইট্রিক এসিড না দিলে অন্যায় হইত।

(২) কেরিজ বা নিক্রোসিস অতি গভীর পীড়া, ইহার মূল,—সোরার সহিত সিফিলিসের মিলন এবং সেই মিলনটী আবার পারদের অপব্যবহারে দৃঢ়তর হয় ও এই জাতীয় পীড়ার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ৫০০ শক্তির পূর্ব্বে যেন কোনও ঝঙ্কারই হইল না।

(৩) এই ক্ষেত্রে রোগীর রোগের ফলটা সারিল কিন্তু রোগী সারিল না, রোগী সারাইতে হইলে এন্টিসোরিক্ ও এন্টিসিফিলিটিক্ চিকিৎসা প্রায় ৩।৪ বৎসর ধরিয়া করিবার প্রয়োজন ছিল।

১৪নং রোগী,—জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও বহিরাগমন এবং তদানুসঙ্গিক ব্যাধিলক্ষণাদি।

১৯১৮।১২ই অক্টোবর।

শ্রীমতী.........দেবী, বয়স ৩৮।৩৯ বৎসর, শ্যামাঙ্গিনী এবং স্থূলকায়া; প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে একটী প্রসবের পর হইতে তাঁহার জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে এবং বাহিরে আসিয়াছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কোনও ফল হয় নাই এবং তাঁহার বিশেষ অসুবিধা নিবারণের জন্য এলোপ্যাথিক ডাক্তারদিগের পরামর্শ অনুসারে একটী পেসারী অর্থাৎ যাহাতে বাহিরে আসিতে না পারে এজন্য একটী দাবনী ব্যবহার করিতেছেন। তাহার ফলে গমনাগমনের যে অসুবিধা ছিল, তাহা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার আনুসঙ্গিক পীড়াসমূহের জন্য স্থায়ী চিকিৎসা প্রয়োজন। কবিরাজী চিকিৎসা করিয়াও কোনও ফল পান নাই। হোমিওপ্যাথিতে কোনও উপকার হয় কিনা, পরীক্ষা করিবার মানসে তিনি কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক—ডাঃ ইউনানের নিকট গমন করেন, তিনি আরোগ্যের আশা দিয়াছেন; কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করান প্রয়োজন; অথচ পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলকে লইয়া কলিকাতায় থাকা ও চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা তাহার দুঃসাধ্য বলিয়া আমার নিকট চিকিৎসা করাইতে মানস করিয়াছেন। আমি তাঁহার চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ঐ পেসারীটী ব্যবহার করিতে আদৌ পাইবেন না এবং তাহাতে তিনি যদি অস্বীকার করেন তবে আমার দ্বারা

চিকিৎসা হইবে না, একথার প্রস্তাব করিয়া উহা ত্যাগ করিতে সম্মত হইলে পর নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করি।

রোগিনীর লক্ষণাবলী :—সর্ব্বদাই গাত্রদাহ, সিমেণ্ট দেওয়া ঠাণ্ডা মেজেতে শুইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং কোনও শয্যায় শয়ন করিতে না পারিয়া তিনি ঐ প্রকার মেজেতেই শয়ন করেন, কেবল শীতকালে দারুণ শীতের সময় একটা পাতলা শয্যার প্রয়োজন হয়। স্নান না করিয়া কোনও প্রকারেই থাকিতে পারে না। পেটের ভিতর ও মাথার তালুতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্বালা, সময়ে সময়ে তলপেটে জলপটী দিতে হয়। মনের কোনও ঠিক নাই, মধ্যে মধ্যে একা চুপ করিয়া বসিয়া চিৎকার করিয়া কান্দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লোকজনে কি বলিবে, ভাবিয়া কান্দিতে পারেন না। জরায়ুতে সর্ব্বদাই জ্বালা আছে, নাড়ীটী বাহিরে আসায় মনে হয় যেন, তলপেটে কিছুই নাই। আস্তে আস্তে চলিলে ফিরিলে বড জানা যায় নাই, নতুবা ঐ স্থানে বড়ই কষ্ট অনুভব, তাহা ছাড়া, বেশী নডাচড়া করিলে যেন আঠামত কি এক প্রকার ঘন রস নির্গত হইতে থাকে। পেসারী থাকায় অনেকগুলি কষ্ট ছিল না, কিন্তু খুলিয়া ফেলায় সে কষ্টগুলি আসিয়াছে। "আমার এই রোগের পূর্ব্ব হইতেই দুধের নাম করিলেই বমি আসে, খাওয়ার ত কথাই নাই।" পেটের পীড়া মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধেরই ধাতু। ক্ষুধা এক প্রকার আছে। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট বৈকাল হইতেই আরম্ভ হয় ও রাত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তবে ঘর ছাড়িয়া ফাঁকের বাতাসে আসিলে অনেকটা উপশম বোধ হয়। ঋতুস্রাব প্রায়ই অতি অল্প। এ সমস্ত লক্ষণাবলি প্রায়ই **পালসেটীলাই** নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলেও আমি উত্তমরূপে বিচার করিয়া, ঐ ঔষধ দিবার মানস করিয়া ১৯১৮।২৬শে অক্টোবর, **পাল্‌স**—১০০০, একমাত্রা প্রাতে দিই। স্যাক্ ল্যাক্ যথেষ্ট। এক মাস পরে সংবাদ দিতে হইবে, যদি ১৫

দিনের মধ্যে কোনও প্রকার উপকার বোধ না হয়, তবে সংবাদ দিতে হইবে, নতুবা উপকার হইলে, এক মাস পরে সংবাদ চাই।

১৯১৮।১৪ই নভেম্বর, জ্বালার সামান্য উপশম ব্যতীত অন্য কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। স্যাক্ ল্যাক্ দেওয়াই আছে, তাহাই চলিবে। আরও ১৫ দিন পরে সংবাদ দিবার কথা রহিল।

২৯।১১—কোনও উপশম নাই। **পাল্‌স্—১০০০**, এক মাত্রা, —চারি দিন, স্যাক্ ল্যাক্।

২৬ ১২—কোনও উপশমও নাই, বৃদ্ধিও নাই। **সালফার—১০০০** একমাত্রা—

১৫।১।১৯—কোনও পরিবর্তন নাই, **পাল্‌স্—৫০০**, সপ্তাহে এক মাত্রা, উপশম হইলে বন্ধ, ৪ মাত্রা দেওয়া রহিল।

১৬.২।১৯—কোনও পরিবর্তন নাই। **পাল্‌স্—১০ এম**, ও এক মাসের স্যাক্ ল্যাক্।

২৫।৩।১৯—কোনও উপশম না পাইয়া উভয় পক্ষেই একটু আশ্চর্য্য হইলাম এবং রোগিণী পেসারী পুনরায় ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু চিকিৎসা আবশ্যক হইলে তাহা ব্যবহার চলিতে পারে না। ঔষধ,—**কেলি সালফ—৫০০**, একমাত্রা।

২৬।৩।১৯—উপশম বোধ হইয়াছে, রোগিণীর মনে যেন আনন্দ আসিতেছে এবং জ্বালা যেন কম,—স্যাক্ ল্যাক্।

৭।৪।১৯—সামান্য উপশম যাহা পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই আছে, আর বৃদ্ধি হয় নাই। **কেলি সালফ—৫০০**।

২৬।৪।১৯—রোগিণী সকল দিকেই ভাল বোধ করিতেছেন এবং তাহার পূর্ব্বদিন হইতে অতি প্রচুর ঋতুস্রাব হইতেছে, রোগিণীর জীবনে এত ঋতুস্রাব কখনও হয় নাই। স্যাক্ ল্যাক্।

২৭।৪।১৯—আরও একটী সংবাদ আসিল যে, প্রাপ্ত ঋতুতেই নাড়ীটী

ভিতরে অল্প পরিমাণে আপনিই প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, এবার যেন প্রায় সকল টুকুই ভিতরে গিয়াছিল। আজিও তাহাই আছে।

১।৫।১৯—নাড়ী বাহিরে আসিয়াছে, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম।

১৮।৫।১৯—রোগিণী ভালই বোধ করিতেছেন—অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য লক্ষণ নাই। স্যাক্ ল্যাক্।

২৬।৫।১৯—পুনরায় ঋতুমতী হইয়াছেন, স্রাবও নিতান্ত কম নয়, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা সামান্য কম বটে।

১।৬।১৯—এবার নাড়ীটী সম্পূর্ণ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং আজিও সেইরূপ আছে।

১৩।৭।১৯—পুনরায় নাড়ীটী বাহির হইয়াছে—**কেলি সালফ—১০০০**, এক মাত্রা। তিন মাসের মত স্যাক্ ল্যাক্। রোগিণীকে আর ঔষধ দিতে নাই, সর্ব্ব বিষয়ে ভাল আছেন।

মন্তব্য।—(১) রোগিণীর সকল লক্ষণ পাল্সের থাকা সত্ত্বেও কেন উপকার হইল না, বিশেষতঃ নানা শক্তিতে ব্যবহার হইবার পরেও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই,—ইহার কারণ সোরা। ফলতঃ সাল্ফার দেওয়াতেও পাল্সের দ্বারা উপকার হওয়া যেন উচিত ছিল মনে হয়, কিন্তু তাহাও হয় নাই। এস্থলে দুই প্রকার মীমাংসা করিতে পারা যায়। (১) সালফার বোধ হয় অন্য শক্তিতে দিলে উপকার হইত। তবে তাহা হইলেও পাল্সের দ্বারা এই রোগিণী আরাম হইতেন কিনা সন্দেহ। (২) অথবা সালফারের সহিত লক্ষণসাদৃশ্য না থাকায় কোনও কার্য্যই হইল না।

(২) এই রোগিণীতে আরোগ্যের গতিটী বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য, কেননা, সর্ব্বাগ্রেই মনে, তাহার পর, তাহা অপেক্ষা বাহ্যতর স্থানে অর্থাৎ ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তন এবং সর্ব্বশেষে বাহ্যত প্রদেশে উপশম।

* ১৫নং রোগী,—ক্ষয়কাশ।

১২।৪।২৭—

শ্রী........উপাধ্যায়, বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর, একেবারেই শুষ্ক ও লাবণ্য-বিহীন, শীর্ণ এবং অত্যন্ত ক্রোধী। রোগী,—মেধাবী এবং একটী স্কুলের পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যে স্কুলে কার্য্য করিতেছিলেন, সেখানে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিয়া স্কুলের সম্পাদক মহাশয় গত ৬ মাস পূর্ব্বেই তাঁহাকে অবসর দিয়াছেন। রোগী নানাস্থানে চিকিৎসা করাইয়া, বিফলমনোরথ হইবার পর, সর্ব্বশেষে আমার নিকট আসেন।

ইতিহাস ও লক্ষণসমষ্টি—বাল্যকালে সঙ্গদোষে টোলে অধ্যয়ন করিবার কালে তিনি অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয় সেবা করিয়াছেন, এবং কোনও ঔষধের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এ কার্য্য যে অন্যায় কার্য্য, সে বিষয়ে তাঁহার চৈতন্য হয়, তাহা ছাড়া ২।১ জন বন্ধুও তাঁহাকে এ কার্য্য হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে তাঁহার এই কার্য্য হইতে পরিণাম অতি ভীষণ হইবে, এ কথাও বলিয়াছিলেন। সেই অবধি উপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদয়ে একটী দারুণ নৈরাশ্যের করাল ছায়া নিপতিত হইল এবং জগতের সকল জিনিসের মধ্যে তিনি কেবল নৈরাশ্যই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যক্ষারোগে মারা গিয়াছেন, তাঁহার খুল্লতাত উন্মাদ রোগে এখনও ভুগিতেছিলেন ও তাঁহাকে বাঁকুড়া এসিলামে রাখা হইয়াছে, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী গ্রহণীরোগে দীর্ঘকাল যাতনা ভোগ করিয়া, মাত্র গতবৎসর দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এই সকল পীড়ার মধ্যে কোনও একটী নিশ্চয়ই হইবে, এই ধারণা তাঁহার মনে একেবারে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২০।২১ বৎসর। তিনি নানাপ্রকার চিন্তার মধ্যেই সর্ব্বদা কাল কাটাইতেন। ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, তিনি

তাঁহার স্ত্রীর সহিত একদিনের জন্যও সৎব্যবহার পান নাই। তিনি যে এজন্য সময়ে সময়ে অনুতপ্ত না হইতেন তাহা নয়, তবে স্বাভাবিক নিরতিশয় কোপনস্বভাব এবং উপরোক্ত কারণে সর্ব্বদাই একটা বিষাদের ছায়ার ভিতর অবস্থিতি করিতে থাকায়, সংসারের কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। ২৮।২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার ১টী পুত্র হইয়া ১০ মাস বয়সে তড়কা হইয়া মারা যায়, ইহাতে জীবনটা একেবারে বিষময় হইয়া উঠিল। বর্ত্তমানে তাঁহার ২টী কন্যা মাত্র। তাঁহার মানসিক অবস্থা ত ঐরূপ, তাঁহার শারীরিক স্বচ্ছন্দতা অনেকদিন হইতেই নাই। কোমরে সর্ব্বদাই ভয়ানক ব্যথা এবং রাত্রিতে, প্রায় প্রতিরাত্রিতে, স্বপ্ন-দোষ ঘটে, ইহাতেই তাঁহার শরীর দিন দিন অবসন্ন হইতেছে। তাঁহার মুখ-খানি দেখিলেই তাঁহার ভিতরের অবস্থা যেন স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইত। চক্ষু কোটরগত, চারিদিকে কালদাগ ও অতিশয় মলিন এবং বিষণ্ণ। সমস্তদিনই কাশিতে হয়, সামান্য ঠাণ্ডায়, সামান্য পরিশ্রমে, সামান্য আহারাদির অনিয়মে ভয়ানক কাশির বৃদ্ধি হয়। রাত্রিতে নিদ্রা ভাল হয় না, যেটুকু হয়, তাহাও স্বপ্নপূর্ণ; দিবারাত্রির মধ্যে তাঁহার শান্তি নাই।

এই সকল লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌, ইত্যাদি সমস্ত রীতিমত পরীক্ষার পর, আমি তাঁহাকে উত্তমরূপে সাহস দিলাম যে, তাঁহার ক্ষয়কাশ বা যক্ষ্মা, কিছুই হয় নাই, তিনি শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন। তিনি শুনিয়া এটা কেবল স্তোকবাক্য বলিয়াই বুঝিলেন, বিশেষতঃ যেহেতু তাঁহার একটী সহোদর যখন এই রোগে মারা গিয়াছেন। ডাক্তার কবিরাজও যাঁহারা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ কোনও উপকার করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু তিনি অতি দুরাচারী, পাপী, অসংযত, এজন্য মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী, ইত্যাদি বাক্যে নৈরাশ্য যথেষ্টই দিয়াছিলেন, ফলতঃ সকলেই একবাক্যে যক্ষ্মা বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রোগীর চেহারা, অন্য পর্য্যন্ত স্বপ্নদোষের লক্ষণ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার এই রোগে মৃত্যু,

ইহাই জানিয়া, রোগীকে বিশেষ পরীক্ষা না করিয়াই, সকলেই একটী দুরন্ত রোগের নামকরণ করিয়া দিয়া নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন এবং রোগীর যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। যাহা হউক, রোগীর পূর্ব্বপুরুষের পূর্ব্বইতিহাস বিশেষ কিছুই পাইলাম না। আমি অন্যের মতামত দূরে নিক্ষেপ করিয়া অতি স্বাধীনভাবেই ঔষধ নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮।৪।১৭—ষ্টাফিসেগ্রিয়া—২০০ শক্তি, নিত্য প্রাতে একমাত্রা, ৭দিনের জন্য রহিল, ৭দিন পরে সংবাদ দিবেন।

২৫।৪।১৭—কোনও পরিবর্ত্তন নাই, প্লাসিবো ১৫ দিনের মত।

১০।৫।১৭—কোনও পরিবর্ত্তন নাই। ষ্টাফিসেগ্রিয়া—১০০০, নিত্য ১ মাত্রা, ৩ দিন। স্যাক্ ল্যাক্। ২১ দিন পরে সংবাদ।

২।৬।১৭—স্বপ্নদোষ কমিয়াছে—"কি জানি কেন, আমার মন যেন বলিতেছে, ডাক্তার বাবু, আমি আপনার হাতেই ভাল হইব," বলিয়া রোগী অনেকটা আশ্বস্তভাব দেখাইলেন। স্যাক্ ল্যাক্, ১৫ দিনের মত।

১৬।৬।১৭—স্বপ্নদোষ কমিয়াছিল, আবার সেইমতই হইতেছে। টিউবারকুলিনাম—২০০ একমাত্রা। ২১ দিনের স্যাক্ল্যাক্।

৭।৬।১৭—অনেক ভাল আছেন, স্বপ্নদোষ নাই, এমন কি, চেহারায় যেন সামান্য পরিবর্ত্তনও দেখিলাম। স্যাক্ ল্যাক্।

২২।৬।১৭—২।১ বার স্বপ্নদোষ হইয়াছে জানিয়া ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—১০০০ আর একমাত্রা। স্যাক্ ল্যাক্ ২১ দিনের মত।

৯ ৭।১৭—রোগী অনেক ভাল আছেন, কিন্তু কাশির কোনও উপকার হয় নাই। স্যাক্ ল্যাক্।

ইহার পর হইতে রোগী অন্যভাবের মত উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাশি ব্যতীত অন্য কোনও কষ্ট আর ছিল না, কিন্তু জানি না, কতদিন আরম্ভ হইয়াছে, ফলতঃ নিত্যই সন্ধ্যার দিকে সামান্য সামান্য জ্বর অনুভব

হইতে লাগিল, প্রাতে ৯৭°২ সন্ধ্যায় ৯৯°.৯, কোনও কোনও দিন ১০০°.৫ পর্য্যন্ত উর্দ্ধমাত্রায় উঠিত, ফলতঃ ২।৩ ঘণ্টার পর ত্যাগ হইত। হ্রাসবৃদ্ধির কোনও লক্ষণই ছিল না। জ্বরের কথা তিনি জানিতেই পারিতেন না। যে লাবণ্যটুকু ফিরিয়াছিল তাহা প্রায় গিয়াছে, রোগী ও তাঁহার পত্নী একেবারে নৈরাশ্যে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আমি ১২।৮।১৭ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রোগীর অবনতি ব্যতীত উন্নতি পাইলাম না। তখন ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য বুঝিলাম।

১২।৮।১৭—**টিউবারকুলিণাম—৫০০** একমাত্রা, ১ মাসের মত প্লাসিবো দেওয়া হইল।

১০।৯।১৭—কাশি কমিয়াছে, জ্বর, প্রাতে ৯৭°, সন্ধ্যায় ৯৯° চলিতেছে। আরও ১ মাসের স্যাক্ ল্যাক্।

৮।১০।১৭—রোগী পূর্ব্বের মতই আছেন, জ্বর, প্রাতে ৯৭° সন্ধ্যায় ৯৯°। **টিউবারকুলিনাম—১০০০** একমাত্রা, ১ মাসের মত স্যাক্ ল্যাক্ দেওয়া হইল।

১০।১১।১৭—রোগীর জ্বর প্রাতে ৯৬°.৫, সন্ধ্যায় ৯৮°, কাশি অনেক কম, প্লাসিবো।

৯।১২।১৭—রোগীর জ্বর নাই, প্রাতেও ৯৭°, সন্ধ্যায়ও ৯৭°, কাশি অনেক কম। প্লাসিবো ২ মাসের মত।

১৫।২।১৮—কাশি আছে, সামান্যই,—পূর্ব্বের ন্যায়, তবে জ্বর নাই। **টিউবারকুলিনাম**—১০ এম, একমাত্রা। এখন হইতে প্রথমতঃ তিন মাস পরে, ১০ এম, ৩ মাত্রা এবং চারি মাস পরে সি-এম, ২ মাত্রা দিবার পর রোগী নির্ম্মল আরোগ্য হয়েন। আমি ইহার আরোগ্যে অতিশয় আনন্দ পাইয়াছিলাম। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পত্নীসমাগম একেবারে নিষেধ ছিল। আরোগ্য হওয়ার পর তাঁহার ১টী পুত্র হইয়াছে ও জীবিত আছে।

মন্তব্য—(১) এই রোগীর চিকিৎসা অতিশয় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। এ সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই অতিশয় ধৈর্য্যশীল না হইলে আরোগ্য আশা করা যায় না।

(২) চিকিৎসক হইয়া রোগীকে কখনও তাহার কৃত অন্যায়ের জন্য ভর্ৎসনা করিতে নাই। যাহা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা হইতে বিরত করিবার জন্য উপদেশ দিতে হইবে এবং বলিতে হইবে যে "মনুষ্যই অন্যায় করে, না জানিয়া হইয়া গিয়াছে, সেজন্য কি আছে? আপনি ভাল হইবেন, কোনও চিন্তা নাই।" চিকিৎসকের ভালবাসা ও ক্ষমার ভাবটী যেন রোগী প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রোগীর নিজের কৃত পাপ অপেক্ষা ডাক্তার কবিরাজের নৈরাশ্যব্যঞ্জক বাক্যে অধিক অনিষ্ট করিয়াছিল।

(৩) যৌবনসুলভ অন্যায়ের জন্য রোগীর শরীরে যে অনিষ্ট হইয়াছিল ও যখন হইয়াছিল, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীরে টিউবারকুলার দোষ বপন হইয়াছে এবং এই দোষের জন্যও উক্ত পাপে প্রবণতা দিয়াছিল। যাহা হউক, পাপের ফলস্বরূপ যে সকল ব্যাধিলক্ষণ আসিয়াছিল সেগুলি আরোগ্য হইবার পরেই তাঁহার টিউবারকুলার বিষটী অঙ্কুরিত শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করিতে দেখা গিয়াছিল।

(৪) টিউবারকুলার বিষের প্রধান দোষ এই যে, "লক্ষণ" প্রায়ই থাকে না, এই জন্যই এই দোষটী এত মারাত্মক।

(৫) এরূপ স্থলে জানিতেই হইবে যে, এই দোষের মূল পূর্ব্বপুরুষে নিহিত।

(৬) এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ৯৮টী রোগীতে টিউবারকুলিনাম্, ২০০, ৫০০, ১০০০, ১০ এম, ৫০ এম ও সি, এম, এবং ক্ষেত্রবিশেষে, আরও উচ্চতর শক্তিতে, বিবেচনা মত প্রত্যেক শক্তির ২।৩টী করিয়া

মাত্রা, ২।৩।৪।৫।৬ মাস অন্তর অন্তর দিয়া, রোগীকে আরোগ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই, দেখিয়াছি।

(৭) এই সকল রোগী চিকিৎসা করিবার সময় স্ত্রী-সমাগম একেবারে বর্জ্জনীয় বলিয়া উপদেশ দিতে হয়। এই সকল রোগী অত্যন্ত রমণেচ্ছু হইয়া থাকে, এজন্য বিশেষ সাবধান হইতে হয়। যে বাড়ীতে রোগী থাকিবে, সে বাড়ীতেও পত্নী থাকা অভিপ্রেত নয়, স্থানান্তরে পাঠানই সুবিধাজনক : এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

(৮) এরূপ ভাবে চিকিৎসা করিবার সুবিধা প্রায়ই পাওয়া যায় না। আজকাল ইঞ্জেকসেন্ উঠিয়া লোককে অতিশয় চঞ্চলপ্রকৃতি করিয়াছে। চিকিৎসক শিক্ষা দেন ও লোকেও শোনে যে, ইন্জেকসেন্ সর্ব্বব্যাধিনাশক, এবং তাহার ফলে উপযুক্ত সময়টী ইহাতে নষ্ট করে।

(৯) এই সকল রোগীর পত্নী ও পুত্রকন্যাদিগের চিকিৎসা একান্ত কর্ত্তব্য, তবে প্রায়ই সে সুযোগ হয় না। সুযোগ পাইলে করিতে হয়, এমন কি, করাই একেবারে কর্ত্তব্য, একথা যেন মনে থাকে এবং উপদেশ দিতেও ভুল না হয়।

(১০) পত্নী বা পুত্রকন্যাদিগের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রকৃতিগত লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য। সকলেরই যে টিউবারকুলিনাম্ই প্রয়োজন হইবে, এমন কোনও কথা নাই।

---

* ১৬নং রোগী,—ত্রিমূর্ত্তির একত্র সমাবেশ—সোরা, সাইকোসিস্ ও সিফিলিস্। রোগলক্ষণের মধ্যে কোনওটীর বড় অভাব নাই।

১৯১৬।৯ই ফেব্রুয়ারী।—

শ্রী..................ঘোষ, জাতি কায়স্থ, বয়স ৩১ বৎসর, বাল্যকালে নানা কুসঙ্গে পড়িয়া চরিত্রহীন হইয়াছিলেন, এবং আমোদ আহ্লাদে

রত হইয়াই ৪।৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। অতি অল্প বয়সে পিতৃ বিয়োগ হয় এবং প্রচুর সম্পত্তি ও জমিদারীর আয়, তাহা ছাড়া নগদ টাকাকড়িও যাহা কিছু পিতার সঞ্চিত ছিল, সেগুলির মালিক হইয়া একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার কোনও বাধাই ছিল না। কলিকাতার মত সহরে অনেক সময়েই থাকা, কেবল জমিদারী আদির জন্য যে সকল কর্ম্মচারীগুলি নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের আবশ্যক হইলেই কোনও সময় ২।৩ দিনের জন্য পল্লীগ্রামে তাঁহার বাসভবনে আসিতে হইত, বাকি সমস্ত সময়টুকু অবাধে কলিকাতায় বসিয়া নিজের কতকগুলি কুসঙ্গী বন্ধু লইয়া নীচ আনন্দে কালাতিপাত করিতেন। মাতৃদেবী বহুপূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করেন। যাহা হউক, ভগবৎদত্ত ইন্দ্রিয়গুলির অসৎ ব্যবহার করিলে অতি অল্পদিন মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়া আসে। এমন কি, একদিন উচ্চদরের চিকিৎসক একজন নাকি বলিয়া ফেলিলেন, "আপনি আরও এই পথে থাকিলে শীঘ্রই মারা যাইবেন, কেননা আপনার লিভারটী নষ্ট হইতে বসিয়াছে।" তাহা ছাড়া, সুখভোগের অধিকাংশ জিনিষই তিনি বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিলেন। ঘোষ মহাশয় বড়ই বিপন্ন হইলেন। এই প্রকার যে তাঁহার অবস্থা ঘটিবে, ইহা তাঁহার কখনও ধারণামাত্র ছিল না। যাহা হউক, হটাৎ একদিন প্রাতঃকালে কতক খানি তাজারক্ত বমন হওয়ায় তাঁহার বিশেষরূপে ধ্যানভঙ্গ হইল। এখনও পয়সা খরচ করিলেই আরোগ্য হইবে, এই দাম্ভিকতা মনের মধ্যে উঠিয়া সুপথে আসিতে কিছুদিন বাধা দিয়াছিল। যাহা হউক, ইহার বহুপূর্ব্বেই গণোরিয়া ও সিফিলিস্ পীড়া হইয়াছিল। কিন্তু আমোদাদির ব্যাঘাত পাছে অধিক দিন ধরিয়া হইয়া পড়ে, এজন্য প্রত্যেক চিকিৎসককেই তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "যত শীঘ্র ঐ ঐ রোগ যিনি আরোগ্য করিতে পারিবেন, তিনি তত উচ্চ পুরস্কার পাইবেন"। বস্তুতঃ তিনি

নাকি কোনও চিকিৎসককে ১০০০৲ টাকা একদিনেই দিয়াছিলেন, যেহেতু চিকিৎসক মহাশয় জার্ম্মেণী হইতে এমন একটী অতি মূল্যবান ইন্‌জেক্‌সন্‌ ঘোষ মহাশয়ের জন্য স্পেশাল ইন্‌ডেণ্ট করিয়াছেন এবং ঐ ইন্‌জেক্‌সন্‌টীর নাকি এমনই শক্তি যে, চিরজীবনে আর তাঁহার শরীরস্থ গণোরিয়া, ও সিফিলিন্‌ দোষ মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিবে না। ফলতঃ চিকিৎসক ধুবন্ধরের নিষেধবাক্য এবং সুবোধ ও সুশীল রোগীর আশা, ভঙ্গ করিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ মূর্ত্তি অতি প্রচণ্ড লক্ষণাদির সহিত দেখাইতে ছাড়িল না। ক্রমেই তাহা লিখিত হইতেছে। উপস্থিত তাঁহার উদরাময় এরূপ ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিল যে কলিকাতায় থাকা তাঁহার পক্ষে অতি বিপজ্জনক বলিয়া সকল চিকিৎসকেই একবাক্যে কহিলেন এবং বায়ু পরিবর্ত্তনে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়া বিদায় দিলেন। রোগী কোনও সময় আমাকে কহিয়াছিলেন—"কলিকাতার চিকিৎসক-দিগের বেশ একটু বাহাদুরী আছে। যখন কোনও মাংসল রোগী তাঁহারা পান, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বেশ করিয়া চুষিতে আরম্ভ করেন, শেষে যখন দেখেন যে এবার রোগী বুঝি যায় যায়, তখন অতি গম্ভীরভাবে তাহাকে চেঞ্জে পাঠাইবার পরামর্শ দিয়া নিজেদের দায় হইতে অব্যাহতি লয়েন, এবং রোগীকেও দেখান যে তাঁহার উপকারার্থে তাঁহারা যথেষ্টই করিয়াছেন, উপস্থিত চেঞ্জে পাঠানই প্রয়োজন এবং যদিও তাহাতে তাঁহাদের বিষম ক্ষতি, কিন্তু তবুও নিঃস্বার্থ যুক্তি দিতে চিকিৎসক হইয়া কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। ফলতঃ আমার ন্যায় মূর্খ আরও আছে কিনা জানিনা,ইত্যাদি ইত্যাদি"। তিনি উৎকট উদরাময় লইয়া বাড়ী আসিলে দেশের জল বাতাসে অনেকটা ভাল বোধ করেন এবং আর কলিকাতায় যাইতে অস্বীকার করেন। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় আসাম চিফকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকিল, তিনি কবিরাজী অথবা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করাইবার উপদেশ দেন। এক্ষণে শ্রীমানের

যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে পত্নী বা শ্বশুরের পরামর্শ শোনা চলিতে পারে, কেননা যে সকল সঙ্গী কলিকাতায় তাঁহার অর্থে নিত্যই আনন্দ করিয়াছেন ও উদরপূর্ত্তি করিয়াছেন, তাহারা নাকি অবকাশ অভাবে অনেক সময় সংবাদ লইতে পারেন নাই এবং কখনও কখনও এমন কথাও তাঁহারা লিখিয়া থাকেন যে, তাঁহারা শ্রীমান্‌কে অনেকবার নিষেধ করিয়াছিলেন যে এ পথে আর বেশী দিন না থাকাই ভাল। শ্রীমান্ তাঁহাদের সুপরামর্শ তখন শোনেন নাই, এজন্যই নাকি এত কষ্ট। যাহা হউক দেশের একজন বেশ কৃতবিদ্য ও বিজ্ঞ কবিরাজের নিকট সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা হইয়াছিল, তাঁহার দ্বারা বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় অবশেষে যখন রোগী শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, তখন আমার হাতে আসেন ও আমি নিম্নলিখিত লক্ষণ ও অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।

রোগীলিপির অবিকল নকল—"আমি একটী নরাধম পশু, জগতে এমন কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়সেবা নাই, যাহা আমি করি নাই। অতঃপর কেবল ব্রাহ্মণের কৃপা ও আশীর্ব্বাদই ভরসা।" আমি এস্থলে তাঁহাকে বৃথা কথোপকথন হইতে বিরত করিয়া কেবল কাজের কথাই কহিতে বলি। তিনি কহিলেন, "আমার ২১ বৎসর বয়সে গণোরিয়া ও তাহার ৫।৬ মাস পরে সিফিলিস্ হইয়াছিল। ইন্‌জেকসন্ ও ঔষধাদির সেবন ও প্রলেপাদির দ্বারা উপশম হইয়াছিল। ফলতঃ তখন হইতেই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তখন হইতে এটা, ওটা, নানা পেটেণ্ট ও নানা চিকিৎসকের নানাপ্রকার প্রেসক্রিপ্‌সনের ঔষধ খাইয়া আসিতেছি। ডাঃ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকারই আমার প্রধান চিকিৎসক ছিলেন, বাকি অন্য ২।৫টী বড় বড় চিকিৎসকও মধ্যে মধ্যে দেখিয়াছেন। ২৭ বৎসর বয়স হইতেই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। ২৪ বৎসর বয়সের সময় আমার একদিন কাশিতে কাশিতে অনেকখানি রক্ত

উঠে, ও তখন হইতে যদিও আমি সাবধান হইয়াছিলাম, তবুও মদ্যপান করিলে ক্রমেই আরোগ্য হইব, এরূপ পরামর্শই আমার বন্ধুগণ দিতে থাকায় আমি ২৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়সেবা ত্যাগ করি নাই। আজ ৪ বৎসর আমি কোনও প্রকার আমোদে যোগ দিতে পারি নাই, তাহার হেতু আমার শরীরের এই অবস্থা।" আমি তাঁহাকে তাঁহার লক্ষণাদি, কষ্ট ও যাতনা কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন "আমার মাথা সর্ব্বদাই ঘুরিতে থাকে। চলিবার সময় প্রায়ই পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সাবধানে চল্যাফেরা করি, এজন্য পড়ি না। মাথার ভিতর কি যে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ করি, তাহা বলিতে পারি না। কখনও কখনও মনে হয়, যেন মাথার ভিতর একটী পিপীলিকার আড্ডা হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে ২।৪টী পিপীলিকা যেন জোর করিয়া কামড় দিতে থাকে। নিদ্রার পরেই এই ভাবটী অনেকক্ষণ ধরিয়া হইয়া থাকে, তাহার পর অন্য সময় ক্বচিৎ হয়। কেহ কিছু কহিলে বিষম রাগ হয়, মনে হয় তাহাকে ধরিয়া মারি, কেননা সে আমার মতের প্রতিবাদ কেন করিবে? লোককে অনেক সময় ছোট বড় কথা বলিয়া ফেলি, স্ত্রীকে ও চাকরদিগকে অনেক সময় গালাগালি দিয়া ফেলি, শেষে আবার অনুতাপ করি ও কাঁদি, ভয়ও হয় যে সকলে মিলিয়া আমাকে বোধ হয় অভিশাপ দিবে। কোমরে সর্ব্বদাই ব্যথা আছে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে যখন শয্যায় থাকি, দিনের বেলায় শুইলে ততটা বোধ করি না। ঘন ঘন প্রস্রাব যাইবার প্রবৃত্তি, সামান্য মাত্র প্রস্রাব হইয়া প্রস্রাব দ্বারটী জ্বালা করে। রাত্রিতে নিদ্রা আদৌ হয় না। নিজের দুষ্কর্ম্মফল একে একে মনে আসে ও অনুতাপানলে একেবারে দগ্ধ হই। প্রাণের ভিতরটী ছটফট করিতে থাকে। ভোরের সময় হইতে পেটটী গড়্ গড়্ করিয়া ডাকিতে থাকে ও ঘন ঘন ৮।১০ বার মলত্যাগ করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে বাহ্য অতিশয় পাতলা হইতে থাকে,

শেষের মল একেবারে জলের মত। পেটে কিছু যেন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, এত শব্দ হয় যে মনে ভয় হয়। অতিশয় ঘাম হয়, অতি সামান্য পরিশ্রমেই ঘাম হয়, তাহাতে দুর্গন্ধ, পেঁয়াজ, রসুনের মত দুর্গন্ধ, মলেও সেই প্রকার দুর্গন্ধ। আহারের ইচ্ছা বেশ আছে, তবে হজম করিবার শক্তি নাই, কেননা প্রায়ই মলের সঙ্গে ভুক্তদ্রব্যের গোটাগোটা অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। হাত, পা, মাথার তালুতে সর্ব্বদাই জ্বালা অনুভব করি। ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারি না, যদিও খোলা বাতাস ভাল লাগে, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার উপায় নাই, তাহা হইলেই মাথা ধরিবে ও জ্বরবোধ হইবে। ফলতঃ বেলা ৯।১০ টার পর আর পেটের কোনও গোল থাকে না, অনেকটা সহজ মানুষের মত ক্ষুধা হয়, আহারও করি, স্নান সব দিন করি না, করিতে ইচ্ছাও হয় না। বর্ষাকালেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদ। আষাঢ় মাসের শেষ হইতে বুকে ও নাকে অতিশয় শ্লেষ্মা জমিবে ও সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপিয়া হাঁপাইতে হইবে, প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া হাঁপাই ও কাশি। চক্ষের দৃষ্টি ভাল নাই, এরই মধ্যে সময়ে সময়ে ঝাপসা দেখি, নানাপ্রকারের বর্ণ যেন আকাশের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাই। অর্শের দোষও ঐ সময় এবং শীতকালে দেখা দেয়, গুহ্যদ্বারে দারুণ যন্ত্রণার সহিত রক্তস্রাব হইতে থাকে, যেন তীক্ষ্ণধার ছুরি দিয়া কেহ কাটিতেছে মনে হয়, গ্রীষ্মকালে ততটা জানায় না। এখন, উপস্থিত আমার প্রস্রাবের দোষ ও পেটের পীড়া না সারাইলে আমার জীবন সংশয় হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে পেটে ও গুহ্যপ্রদেশে একপ্রকার দদ্রুমত চর্ম্মরোগ হয়, উহা হইতে অতি দুর্গন্ধ (চর্ম্ম পচিয়া গেলে যেরূপ দুর্গন্ধ সেইরূপ) আঠা আঠা রস নির্গত হয়, চুলকাইতে আরাম হয়, কিন্তু তাহার পর অতিরিক্ত বেদনা হয়।”

আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলাম—“আপনার নানাপ্রকার পীড়া যাহা যাহা আছে, সেগুলি প্রতীকার করিতে হইলে আপনার

গণোরিয়া ও সিফিলিস্ পুনরায় বাহির করিতে হইবে, ফলতঃ আপনার তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। সে প্রকার স্থায়ীমূলে চিকিৎসা এক্ষণে চলিবে না, উপস্থিত আপনার পেটের পীড়ার প্রতীকার করিয়া ২।৪ মাস সাবধানে পথ্যাপথ্যের বিচার করিয়া থাকিলে উহা সম্ভব হইবে। ফলতঃ সেটী আপনার ইচ্ছা। আপনি তাহা না করাইলে কখনই স্থায়ী আরোগ্য হইবে না। ২।৪ দিন পর্য্যন্ত একত্রে ভাল থাকাও আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এক্ষণে উদরাময়ের আর কোনও কথা বলিবার আছে কিনা, যদি থাকে, বলুন।" তাহাতে তিনি কহিলেন, "যে পীড়া আরোগ্য হইয়াছে তাহা যদি পুনরায় আনা সম্ভব হয় এবং সেই পথেই যদি আমার স্থায়ী আরোগ্য হয়, আপত্তি নাই, ফলতঃ সর্ব্বাগ্রে আমার পেটের দোষের চিকিৎসা করুন, তাহাতে যদি প্রাণরক্ষা হয়, তবে অন্য কথা।"

তাঁহার উদরাময় আরোগ্য করিতে ১৫।১৬ দিন আবশ্যক হইয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রথম **থুজা**—৩০,২০০, তাহার পর **সাল্‌ফার**—৩০, এবং ২০০ প্রয়োজন হইয়াছিল! ৩ মাস নির্ম্মল সুপথে থাকার পর, তাঁহার স্থায়ী চিকিৎসার বিষয় তাঁহাকে আমূলাগ্র বুঝাইয়া, জুন মাসের ১৪ই তারিখে চিকিৎসা আরম্ভ করি। এবং নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল লিপিবদ্ধ করি।

দ্বিতীয়বারের লিপি,—কেবল উদরাময় ও মানসিক অতিশয় অবসাদ ব্যতীত অন্যান্য উপরোক্ত সকল লক্ষণই আছে। তবে "আরও আমার যে সকল পীড়া আছে, সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ একটি ব্যাকুলতা ও তৎসঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ধরফড়ানি হইতে থাকে। বাতও কখনও কখনও আশ্রয় করে, সর্ব্বদাই নয়, কখনও কখনও বেশী ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে বা বর্ষার দিনে সর্ব্বাঙ্গেই বেদনা হয়। স্মরণশক্তি আদৌ নাই। গত ২।১ মাসের মধ্যকার ঘটনাও

মনে থাকে না। আগামী বর্ষাতে যাহাতে হাঁপানির জন্য আমাকে ততটা কষ্ট না পাইতে হয়, দয়া করিয়া তাহাই করিবেন।"

১৮।৬।১৬—**মেডোরিনাম**—১০০০ শক্তি—একমাত্রা, প্রাতঃকালে দেওয়া হয়। প্লাসিবো যথেষ্ট দেওয়া রহিল, ১৫ দিন পরে সংবাদ দিতে বলিলাম।

৩।৭।১৬—স্রাব দেখা দেয় নাই, অধিকন্তু নাকে বুকে অত্যন্ত সর্দ্দি হইয়াছে। **মেডোরিনাম**—১০০০ আরও একমাত্রা, সাত দিনের জন্য স্যাক্ ল্যাক্।

১১।৭।১৬—গনোরিয়ার স্রাব দেখা দিয়াছে, রোগী কহিলেন—"আশ্চর্য্য কথা, মহাশয়, যেমনটি হইয়াছিল ঠিক তেমনই দেখা দিয়াছে, কিন্তু ইহাতেও আরোগ্য হইব বলিয়া আমার মনে বেশ আনন্দ আছে।" প্রত্যহ দুইবার স্যাক্ ল্যাক্।

২৭।৭।১৬—স্রাব প্রায় বন্ধ হইয়া যাইতেছে, **মেডোরিনাম**—১০০০ আর একমাত্রা।

৩।৮।১৬—স্রাব পুনরায় দেখা দিয়াছে, তবে তত বেশী নয়। স্যাক্ ল্যাক্।

১৪।৮।১৬—স্রাব লুপ্তপ্রায়। **মেডোরিনাম**—১০এম ও স্যাক্ ল্যাক্।

২৭।৯।১৬—রোগীর আর গনোরিয়া স্রাব দেখা দিল না, কিন্তু অতি ভীষণ মাত্রায় হাঁপানি দেখা দিল। রাত্রি ৯।১০টা হইতে ভোরের সময় পর্য্যন্ত অধিক। **নেট্রাম সাল্ফ্**—২০০ শক্তি, নিত্যই প্রাতে, যতদিন না হাঁপের বেগ সামান্য বা অধিক, কম বোধ হয়। ৫।৬ দিনের পরে কম বোধ হইয়াছে।

১৬।১০।১৬—পূর্ব্বের মত হাঁপের বেগ দেখা দিয়াছে। **নেট্রাম সাল্ফ্**—৫০০, এক মাত্রা। ১৮।১৯শে এই দুই দিন হাঁপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া বেগটী কমিতে কমিতে হাঁপ প্রায় সারিয়া গেল এদিকে সর্ব্বাঙ্গ,

কেবল মুখ ও বুক বাদে, ঝকি সর্ব্বস্থানেই ভয়ানক একজিমা বাহির হইল। সে অতি অদ্ভুদ দৃশ্য, না দেখিলে অনুমান করা কঠিন। অতি দুর্গন্ধ অজস্র রস নিস্থত হইতেছে এবং রোগী ৪।৫ খানি ঘুঁটে লইয়া বসিয়া তদ্বারা সর্ব্বদাই নানাস্থানের চুলকানি নিবারণ করিতেছেন।

১৮।১২।১৬—**সোরিনাম**—সি, এম, নিত্য প্রাতে ১ মাত্রা—৩ দিন তিনবার। একটি বড শিশিতে ১০নং গ্লবিউল, প্রাতে ২টী ও সন্ধ্যায় ২টী খাইবার ব্যবস্থা রহিল।

৭।৪।১৭—একজিমা, কমিতে কমিতে আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, **সোরিনাম**—এম, এম, একমাত্রা।

১১।৭।১৭—এক্‌জিমা আর নাই, রোগীর মনেও অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। রোগীকে স্যাক্ ল্যাক্ দিয়া বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম, কেননা যদিও অতি ভয়ানক শত্রু সিফিলিস্ এখনও ভিতরেই রহিয়াছে কিন্তু কোনও লক্ষণ নাই। কাজেই কি প্রকারে ঔষধ দেওয়া যায়? রোগীও তাঁহার ভিতর কোনও কষ্ট অনুভব করিতেছেন না, কেবল সামান্য পরিশ্রমে অধিক ঘর্ম্ম, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, মাথাঘোরা ইত্যাদি ২।৪টী লক্ষণ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার উপর ঔষধ দেওয়া ততটা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। তবে ইহার উপর সিফিলিস্ দোষটী শীঘ্রই মাথা তুলিয়া বিকাশ পাইবে, এরূপ আশা করিয়া আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া থাকাই স্থির করা হইল।

২৪।৯।১৭—রোগীর নাকের মধ্যে ক্ষতলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, সংবাদ পাইলাম. অন্যান্য লক্ষণগুলি ত আছেই, তাহার উপর নাকের ডানদিকে অত্যন্ত দরজ, টিস্‌টিসানি বেদনা, ও কখনও রক্ত, কখনও পূঁয নির্গত হইতে থাকিলে, ক্রমে বাম নাকেও ক্ষত হইয়া রোগীর সমস্ত কপালটিতেই বেদনা সুরু হইল। আরও ১০।১৫ দিন পরে ঔষধ দেওয়া সাব্যস্ত করিয়া ১৫ দিনের মত স্যাক্ ল্যাক্ দিয়া বিদায় দিলাম।

৯।১০।১৭—নাকের ক্ষতজন্য বিশেষ কষ্ট হইতে থাকায়—**কেলি বাইক্রোম**—২০০ শক্তি, নিত্য নাড়া দিয়া একবার করিয়া প্রাতে খাইতে দিলাম, একটু উপশম হইলে ঔষধ বন্ধ হইবে, এবং সংবাদ পাঠাইতে হইবে। ৭ দিনের পরে উপশম হয়।

২২।১০।১৭—নাকের ক্ষত প্রায় আরোগ্য হওয়ার মত, কপালের বেদনাও কম, ১৫ দিনের প্লাসিবো দিয়া বিদায় করিলাম।

৮।১১।১৭—নাকের বেদনা সামান্যই আছে—**কেলি বাই**—১০০০, এক মাত্রা, ১ মাসের জন্য স্যাক্ল্যাক্।

৫।১২।১৭—নাকের ক্ষতলক্ষণ নাই, কিন্তু নাকে সর্ব্বদাই সর্দ্দি ঝরিতেছে, ও মধ্যে মধ্যে সর্দ্দি যেন নূতন করিয়া হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইহার পর **মার্কুরিয়াস্ সল্**—১০ এম, একমাত্রা দেওয়া হয়। কিন্তু ৩ মাস অপেক্ষা করার পরও সিফিলিসের ক্ষত বাহির হইল না। চিকিৎসাও আর যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা রোগী যেন বেশ উপলব্ধি করিলেন না, কাজেই মনোযোগেরও অভাব ঘটিতে থাকিল। ফলতঃ প্রায়ই সর্দ্দি লাগার ভাবটার জন্য **টিউবারকুলিনাম্**—১০০০ একমাত্রা ব্যতীত আর, ঔষধ দিবার সুযোগ পাই নাই। এখানেই চিকিৎসা বন্ধ হইয়া যায়।

মন্তব্য।—(১) প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিবার সময় যদি কোনও তরুণ পীড়ালক্ষণ থাকে, যথা,—উদরাময় বা ম্যালেরিয়া জ্বর বা নিউমোনিয়া অথবা অর্শ হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদি কোনও একটী পীড়া-লক্ষণ জন্য রোগীর দারুণ কষ্ট হইতে থাকে, তবে সে অবস্থায় ঐ তরুণ পীড়ালক্ষণের সাদৃশ্যে কোনও স্বল্পকালস্থায়ী ও (শীঘ্রই তাহাকে দমন করিবার জন্য) দ্রুত কার্য্যকরী ঔষধ দিয়া সর্ব্বাদৌ চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হয়, নতুবা সেই অবস্থায় প্রাচীন পীড়া আরোগ্য করিবার মানসে

গভীর কার্য্যকরী ও উচ্চশক্তিতে ঔষধ দিলে, সে রোগী লইয়া চিকিৎসককে বড়ই বিপন্ন হইতে হয়।

(২) যেখানে **একটীর অধিক দোষ** শরীরে বর্ত্তমান থাকে, সেখানে **বর্ত্তমান** পীড়াজনক ও কষ্টকর লক্ষণসমষ্টি অনুসারেই উচ্চ শক্তির ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য; কেন? উদ্দেশ্য—যাহাতে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ঐ দোষটীর গতি হইয়া লুপ্তস্রাব পুনরায় দেখা দিতে পারে। নিম্নতব শক্তির ঔষধে সে শক্তি দেখা যায় না, কিন্তু অতিরিক্ত দুর্ব্বল রোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানে মধ্যশক্তি হইতে আরম্ভ করাই ভাল, এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অধিক থাকিলে, অনেক সময়, এমন কি, ২০০ শক্তিতেও লুপ্ত স্রাবটী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। যেখানে রোগীর শরীরে **অর্জ্জিত** দোষ থাকে, সেখানে লুপ্ত স্রাবটী পুনরায় দেখা না দিলে স্থায়ী আরোগ্য আশা করা চলে না। যেখানে পূর্ব্বপুরুষ হইতে **প্রাপ্তদোষ** থাকে, সেখানে স্রাবটী ফিরে না, যদিও প্রত্যেক দোষের আরোগ্য নিদর্শন অন্য প্রকার হইয়া থাকে।

(৩) একের অধিক দোষ শরীরে বর্ত্তমান থাকিলে, **বর্ত্তমানে প্রাধান্য যুক্ত** লক্ষণগুলির দ্বারা যে দোষঘ্ন ঔষধ প্রয়োজন হইবে, সেই দোষঘ্ন ঔষধই দিতে হয়, তাহার পর, ক্রমে অন্য দোষ আবার বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; তখন আবার সেই দোষঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। অনেক সময় চক্রাকার গতিতে দোষ সকল প্রকাশ পায়, সেই মত চক্রগতিতে ঔষধও নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

(৪) এই রোগীর সকল দোষগুলি নিরাকরণ হইল না, এক্ষেত্রে চিকিৎসকের কোনও ত্রুটী ছিল না, রোগীর ধৈর্য্যের অভাব, যাহা প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। লোকে নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্মের বাধা না থাকিবার মত শরীর হইলেই আর চিকিৎসা চালাইতে রাজী থাকে না। চিকিৎসকেরও উপায় থাকে না।

১৭নং রোগী,—মৃগীরোগ, কবিরাজীতে যাহাকে "অপস্মার" বলে।

১৯১১।১২ই জানুয়ারী।—

শ্রীমতী..............মজুমদার, জাতি কায়স্থ, গৌরাঙ্গী, বয়স ২০।২১, সন্তানসন্ততিহীনা, ১১ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতুমতী হন। এদিকে শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল বলিয়া, তাঁহার দেহে কোনও পীড়া আছে, একথা কেহই বিশ্বাস করিত না। যাহা হউক, তাঁহার ১৩ বৎসর বয়স হইতে প্রতিমাসে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে ও সময়ে, অত্যন্ত পেটবেদনা হইতে আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথম দেশীয় টোট্‌কা ও জড়ীবড়ী খাওয়ান, প্রলেপ ও মাদুলীধারণ ইত্যাদির ব্যবস্থা হইল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও উপকার হইল না। তাঁহার স্বামী কলিকাতার একটী বিখ্যাত চটের কলে কার্য্য করিতেন, তিনি রোগিণীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া সেখানে এলোপ্যাথিক ডাক্তারী চিকিৎসা করাইয়াছিলেন এবং অশোকারিষ্ট ও অশোকঘৃত ও কবিরাজী আরও অনেক প্রকার ঔষধ ও ঘৃত ব্যবহার করান। ফলতঃ ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই বা ঠিক প্রারম্ভে তাঁহার মাসিক ঋতু বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি ও তাঁহার বাড়ীর সকলেই মনে করেন যে, রোগিণীর গর্ভ হইয়াছে। গর্ভলক্ষণ সকলই প্রকাশ পাইতে থাকে, এমন কি ৯ম মাসে স্তনে দুধ পর্য্যন্ত আসে। ফলতঃ পূর্ণগর্ভা হইয়াও প্রসব না হওয়ায় তাঁহাদের মনে সন্দেহ জাগে যে, বোধ হয় গুল্ম-পীড়া হইয়াছে; এদিকে মধ্যে মধ্যে রোগিণীর মূর্চ্ছালক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ হস্তপদের কম্পন ও অক্ষিতারকাগুলি উর্দ্ধদিকে কোটরস্থ হইয়া ২।১টী খিচুনী এবং তৎসহ মূর্চ্ছা দেখা দিত। এরূপ, মাসে ৮।১০ দিন হইতে হইতে ক্রমে ১০।১৫ দিন হইতে থাকিল। ১৯০৯ সালে অর্থাৎ রোগিণীর ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনেকদিন ধরিয়া কবিরাজী চিকিৎসা হইয়া কোনও ফল না হওয়ায়

এলোপ্যাথীর একটী পেটেণ্ট ঔষধ "এল্‌ট্রিস্‌ করডিয়েল্‌" ব্যবহার করিতে থাকেন, ইহাতে পেটটী একটু কমিয়া গেল, ফলতঃ ঋতুও হইল না, অথবা কিছু প্রসবও হইল না। ইতিমধ্যে তলপেটে অতিশয় যাতনা, বুকে দুর্ দুর্ শব্দ, আহারে অরুচি ইত্যাদির সঙ্গে অতি ঘন ঘন মূর্চ্ছা দেখা দিল, ক্রমে এমন হইল যে, মূর্চ্ছা হইলে তাহার পর রোগিণী আর জানিতেই পারিতেন না। ইহাকেই অপস্মার কহে, স্মৃতিশক্তির লোপ হইয়া যায় বলিয়া ইহার নাম বৈদ্যশাস্ত্রে—"অপস্মার"। যাহা হউক, এই অবস্থায় নানাপ্রকার প্রতীকারের ফলে রোগিণীর অবস্থা কখনও ভাল কখনও মন্দ হইতে হইতে ১৯১১।১২ই জানুয়ারী আমার নিকই চিকিৎসা করান ব্যবস্থা হয়। আমি তখন রাজগ্রাম উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার। সেদিন স্কুলের ছুটি ছিল। রোগিণীর বাড়ীও অতি নিকটে, এজন্য আমাকে চিকিৎসক নিযুক্ত করিলে বিশেষ সুবিধা হইবে, ও তাহা ছাড়া ঐ স্কুলের স্বর্গীয় সম্পাদক ও মালিক ৺পূর্ণেন্দু পাঁজা মহাশয় তাঁহাদিগকে হোমিওপ্যাথিতে আমার নিকট নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে বলিয়া উপদেশ ও আশা দেওয়ায় আমি ঐ দিন রোগীণীর লক্ষণাবলি সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করি।

লক্ষণাবলী—রোগিণীর স্নানে প্রবৃত্তি অধিক এবং মূর্চ্ছাপীড়ার সময় হইতে নিত্য ২।৩ বার করিয়া বরাবরই স্নান করিতেন। খোলা বাতাসে থাকার অতিশয় স্পৃহা, তাহা ছাড়া সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগানই তাঁহার প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, কেবল যখন তলপেটে অতিশয় যাতনা হইয়া থাকে, তখন গরম জলের স্বেদাদিতে উপশম হইত ও এখনও হইয়া থাকে। আজকাল প্রায়ই উন্মাদিনীর ন্যায়, যা তা বকেন, সময়ে সময়ে বিনা-কারণেই কাঁদেন, বলেন,—না কাঁদিয়া থাকিতে পারেন না। রাত্রিতে নিদ্রা ভাল হয় না। শয়ন করিয়া আছেন, তাহারই মধ্যে হু হু হু করিয়া বাহিরে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়েন ও সর্ব্বাঙ্গ ভিজা গামছায় মুছিতে

থাকেন। আহারে ইচ্ছা নাই, দুগ্ধ, মাংসাদি কোন কালেই খান না। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ। দক্ষিণ পার্শ্বেই শয়নের প্রবৃত্তি, মাথার চুলগুলি প্রায় সকলই উঠিয়া গিয়াছে। রোগিণীর সহিত কথা কহিয়া জানিতে পারিলাম, তাঁহার মন অতিশয় বিষণ্ণ ও উদাসভাবযুক্ত। মুখের স্বাদ সর্ব্বদাই তিক্ত থাকে।

১৯।১১।১৪ই জানুয়ারী—**পালস্**—১০০০, নিত্য একমাত্রা, প্রাতে ৭ দিন দিয়া বন্ধ হয় ও প্লাসিবো যথেষ্ট। ১ মাস পরে সংবাদ।

১২।২।১৪ কোষ্ঠবদ্ধের সামান্য-উপশম ব্যতীত অন্য কোন উপকার হয় নাই, স্যাক্ল্যাক্ এক মাসের মত।

১৪।৩।১৪—রোগিণীর বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন নাই। **পালস্**—১০ এম—এক মাত্রা ও স্যাক্ল্যাক্ এক মাসের মত।

৫।৪।১৪—শরীরে জ্বালাভাবটা অনেক কম, মনের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কোষ্ঠবদ্ধ অনেক কম। স্যাকল্যাক এক মাসের মত।

৭।৫।১৪—গত ২।৫।১৪ তারিখে রোগিণীর প্রচুর পরিমাণে ঋতুস্রাব হইয়াছে, যাতনা প্রথম দিনে সামান্য ছিল, ফলতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম, তাহা ছাড়া, এতখানি স্রাব পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। জ্বালা প্রায়ই নাই, মানসিক উন্নতিও হইয়াছে। মূর্চ্ছা ৪।৫ বার করিয়া প্রতি মাসে এখনও হইতেছে। স্যাক্ল্যাক্ ১৫ দিনের মত।

২১।৫।১৪—রোগিণী আর বিশেষ উন্নতি বোধ করিতেছেন না, মূর্চ্ছা—২।৩ দিন অন্তর হওয়ায় একটু চিন্তার কারণ আসিতেছে। **সালফার**—১০০০, ১ মাত্রা এবং ১ মাসের মত প্লাসিবো।

১৮।৬।১৬—রোগিণী তদ্বৎ। **পালস্**—১০ এম, আর এক মাত্রা দেওয়া হয়, তাহাতেও ১ মাস ১০ দিন অপেক্ষা করিয়াও কোনও ফল না হওয়ায়,—

২৯।৬।১৪—**কেলি সালফ**—১০০০ এক মাত্রা দেওয়া হয়। ইহার

৮।১০ দিন পর হইতে পূর্ব্ব উন্নতির সূত্রটী যেন ধরা হইল এবং রোগিণীর মধ্যে মধ্যে তলপেটে বেদনা ব্যতীত আর অন্য কোনও রোগলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। ২ মাসের অধিক অপেক্ষা করিয়া রোগিণীকে ৪।১০।১৪ **কেলি সালফ**—আরও ১ মাত্রা দেওয়া হইয়াছিল। আর ঔষধ দিবার সুযোগ হয় নাই, কেননা রোগিণী ভালই ছিলেন।

উপসংহার।

"প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা" লিখিতে গিয়া হোমিও-প্যাথির মূল সূত্রগুলির বিশ্লেষণ ও বিস্তার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এবং যতদূর সাধ্য, সকল শ্রেণীর পাঠক ও পাঠিকাদিগের পক্ষে সুবোধ করিবার অভিপ্রায়ে, সরল ভাষাতেই লিখিয়াছি,—এমন কি, স্থানে স্থানে ২।৪টী চলিত" কথাও প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা জানিয়াও পরিবর্ত্তন করি নাই, কেননা সরল কথায় লেখাই আমার উদ্দেশ্য, ভাষার পারিপাট্য আমার উদ্দেশ্য নয়। হোমিওপ্যাথি অমৃতের উৎস, কিন্তু সেই অমৃতের সন্ধান পাইতে হইলে বিশেষ উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের আবশ্যক,—এজন্য আমি প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করি যে, যেন হোমিওপ্যাথি তাহাদের বিশেষ মনোযোগের সামগ্রী হয়, এমন কি, **হোমিওপ্যাথির সহিত নিজেকে একীভূত করিলে,** তবেই ইহার ভিতর প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায়। হ্যানিম্যানের লিখিত অর্গানন, প্রাচীন পীড়ার পুস্তকে, কেণ্টের লিখিত হোমিওপ্যাথিক দর্শন-তত্ত্বে যে যে তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও মনোমধ্যে চিত্রাঙ্কণ ব্যতীত কেহই প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে পারে না। কেবল তাহাই নয়,—সেই তত্ত্বগুলিকে কার্য্যতঃ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার না করিলে, সেগুলি চিকিৎসকের অঙ্গীভূত হয় না, কেননা ব্যবহার ব্যতীত কোনও সূত্র কখনও মনে থাকে না। ইংরাজী পুস্তক সকলের মূল্যও অধিক, তাহা ছাড়া ইংরাজীতে যাঁহারা একেবারে সুপণ্ডিত, তাঁহারা ব্যতীত, সেগুলি পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে কেহই আশা করিতে পারেন না। আমরা সেই অসুবিধা খণ্ডনার্থ বাঙ্গালা ভাষায় সরল

আলোচনা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বার বার,—অনেকবার, ও বিশেষ মনোযোগের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিলে সারতত্ত্বগুলি মনে গ্রথিত হইবে এবং কার্য্যক্ষেত্রে তদনুসারে সেগুলিকে ব্যবহারে আনিলেই নিজ নিজ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। "অভ্যাসঃ যোগ উচ্যতে"—গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন।

প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ প্রয়োজন হয়, সেগুলি—এন্টিসোরিক, এন্টিসাইকোটিক এবং এন্টিসিফিলিটিক, অর্থাৎ সোরা-বিরোধী, সাইকোসিস্-বিরোধী ও সিফিলিস্-বিরোধী। এ সকল ঔষধের প্রত্যেকটীই অল্পবিস্তর গভীর কার্য্যকরী। তবে প্রাচীন পীড়ার চিকিৎসা কালে যদি কোনও রোগীর তরুণ রোগলক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে একোনাইট, বেলেডোনা, নাক্সভমিকা, রাস্টক্স প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির ঔষধ ব্যবহার হইতে পারে, পরে তরুণ লক্ষণের অবসান হইলে, পূর্ব্বসূত্র ধরিয়া চলিতে হয়। যাহা হউক, উপরোক্ত গভীর কার্য্যকরী ঔষধ গুলির চিত্র সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিতে হয়। ইহাতে একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সকল ঔষধ **গভীরতা হিসাবে** সমান নয়, **কার্য্যের দ্রুততা** হিসাবে সমান নয়, **ক্রিয়াস্থান হিসাবেও** সমান নয়;—এজন্য একটী ঔষধের কার্য্য অপর কোনও ঔষধই করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়,—**এলো** একটী এন্টিসোরিক, এবং **অরাম মেটাও** এন্টিসোরিক, কিন্তু **এলোর** কার্য্য অতি অল্পদিন স্থায়ী, **অরাম** অনেক দিন ধরিয়া ক্রিয়া করিতে পারে; কাজেই **গভীরতা হিসাবে অরাম্** অন্যটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং **ক্রিয়ার দিন-সংখ্যা হিসাবেও** উহাদের মধ্যে তারতম্য রহিয়াছে; **লাইকোপোডিয়াম্** ও **কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস** উভয়েই প্রত্যেক হিসাবেই প্রায় সমান, কেবল মাত্র **লক্ষণের** তারতম্য ব্যতীত উহাদের মধ্যে বড় একটা **অন্য হিসাবে** তারতম্য নাই, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোনও একটী ও

আইওডিন ;—ইহাদের মধ্যে গভীরত্বারও প্রভেদ এবং ক্রিয়া-কালেরও প্রভেদ যথেষ্ট। এমন কি, আইওডিনের একটী রোগীর ক্ষেত্রে ১০ এম ১ মাত্রার ক্রিয়া ৪ মাসের অধিক সময় ধরিয়া হইতেও দেখিয়াছি। ক্রিয়া একই প্রকারের হইলেও, দুইটী ঔষধের ক্রিয়া এক স্তরের না হইতে পারে, যেমন বেলেডনা ও ক্যাল্‌কেরিয়া; নেট্রাম মিউ ও সিপিয়া, কল্‌চিকাম্‌ ও আর্সেনিক্‌ ইত্যাদি; কোনও কোনও ঔষধ অতি গভীর কার্য্য করে, কিন্তু শীঘ্রই ক্রিয়া শেষ হইয়া যায়, যেমন,—এমন কার্ব্ব, ম্যাগ্‌নেসিয়া ফস্‌, কোলোসিন্থ ইত্যাদি; কেহবা তত গভীর না হইয়াও অনেকদিন ধরিয়া কার্য্য করিতে পারে, যেমন,—ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ক্রিয়োজোট্‌; আবার কোনও কোনও ঔষধের এক মাত্রার অপব্যবহারের জন্য যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয়, যেমন, ল্যাকেসিস্‌, ক্রোটেলাস্‌। এই প্রকারে প্রত্যেক ঔষধের প্রকৃতি, গতি প্রভৃতি বেশ লক্ষ্য করিয়া,—বাহিরে—সমাজের মধ্যে,—মনে মনে উহার অনুরূপ চিত্র মিলাইতে হয়, এই প্রকারের অধ্যয়ন যে কত মধুর, আনন্দজনক ও মনোজ্ঞ, তাহা যিনি করেন তিনি ব্যতীত অন্যে অনুভব করিতে পারিবেন না। ক্রমে, চক্ষে কেবল, সালফার, থুজা, সিপিয়া, নেট্রাম্‌ সালফ্‌, পালসেটিলা, মার্কুরিয়াস, লাইকো-পোডিয়াম্‌ ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়,—তখনই মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ সন্তোষজনক হইয়া থাকে। যখন এই প্রকার গভীর অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তখনই বুঝা যায়—দুইটী ব্যক্তির পরস্পর মিল হয় না কেন? তাহার কারণ একজনের প্রকৃতি হয়ত এপিসের ও আর একজনের রাসের; অন্য দুইটী ব্যক্তির এত প্রণয় কেন? দেখা যায়,—একজন হয়ত নেট্রাম্‌ মিউ, আর একজন সিপিয়া—এজন্য পরস্পর মিল থাকে। বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ একই,—একটী অন্যটীর প্রতিরূপমাত্র,-

তবে দেখিবার চক্ষু প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হওয়া চাই, এই পর্য্যন্ত। হোমিওপ্যাথী যখন এইভাবে **অন্তরস্থ** হয়, তখনই হোমিওপ্যাথিক চক্ষু ফোটে,—কেণ্টের ফুটিয়াছিল। এ অবস্থায় চিকিৎসায় ভুল হওয়া সম্ভব হয় না,—তিনি যাহা নির্ব্বাচন করেন, তাহা অভ্রান্ত হইতে বাধ্য।

এক্ষণে কথাটী এই যে, মেটিরিয়া মেডিকার প্রত্যেক ঔষধটী এক **একটী জীবন্ত মানুষ আকারে** আমাদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া চাই,—তাহা যে প্রকারেই হউক, করিতে হইবে, ইহাই **আদর্শ**। ইহা একদিনে হয় না, হইবে বলিয়া আশাও করিতে নাই, —দীর্ঘকালের সাধনা ও ঔষধপ্রয়োগ এবং ফল পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন। আদর্শে পৌছিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম ও সুদৃঢ় অধ্যবসায় আবশ্যক। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে চিকিৎসাকার্য্য বড়ই আনন্দজনক হয় এবং চিকিৎসক যে স্থানে থাকেন সে স্থানটি পবিত্র হইয়া যায়—কেননা তাঁহার দ্বারাই জগতের প্রকৃত কল্যাণ হয়। প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক,—বিনয়ী, জনকল্যাণকামী এবং সর্ব্বদাই ভগবৎ-কৃপা-ভিখারী হইয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহার দম্ভ, বিলাস বা আত্মপ্রশংসাকাঙ্ক্ষার লেশ থাকে না,—কেন না, তিনি বহু উচ্চস্তরে সর্ব্বদাই বিচরণ করেন,— তাঁহার পথ,—সত্য, উদ্দেশ্য,—জন-কল্যাণ, আশা,—ভগবৎ কৃপা এবং লভ্য,—আত্মপ্রসাদ। তিনি আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া থাকেন, এবং যাঁহারা তাঁহাকে মন্দ বলেন, তিনি তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না, করিলেও মনে মনে কহেন—"Father, forgive them, they know not what they do", (প্রভু. উহাদিগকে ক্ষমা করুণ,— কেননা উহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না)।

পরিশিষ্ট।

আমার "প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা" খানি প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের সুধীসমাজের প্রতি একটী সবিনয় নিবেদন মাত্র। যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে চিকিৎসা বিষয়ে কোন্ পথটী একমাত্র সত্য, তাহাই উদ্বুদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থখানির নাম যাহাই হউক, ইহার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নীতি এবং অন্যান্য তথা কথিত চিকিৎসাপথের ত্রুটী ও ভ্রান্তি প্রদর্শনান্তে হোমিওপ্যাথির অভ্রান্ততা পূর্ণমাত্রায় প্রতিপাদন ও চিকিৎসা-বিষয়ক সাধারণ ধারণার আমূল সংস্কার ও সংশোধন করিবার প্রার্থনাই ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থখানির এত সমাদর হইবার অন্য কারণ কিছুই নাই,—ইহার কারণ কেবলমাত্র ইহা ভগবৎ প্রেরণার বশে লিখিত ও অভ্রান্ত তথ্য এবং চিরন্তন সত্য পদার্থের অবতারণা এবং সন্নিবেশ। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব কিছুই নাই,—কেননা আমি অনুভব করিয়াছি যে, ইহা যেন অন্য কোনও শক্তির দ্বারা লিখিত, যেন অবশভাবে আমি ইহা লিখিয়া গিয়াছি বলিয়া মনে হয়। অবশ্য অনেকেই হয়ত আমার একথা শুনিয়া, কি মনে করিবেন, জানি না, ফলতঃ আমি সরলভাবে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম।

বিগত ১৯২৫ সালে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান শীতলচন্দ্র যাবজ্জীবন বৃদ্ধ পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া পরমপিতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,—তখন আমি ধানবাদে ওকালতী ও ডাক্তারী করিতাম, যেহেতু ইহার বহুদিন পূর্ব্বে মহামান্য হাইকোর্ট হইতে ওকালতীর সঙ্গেই চিকিৎসাকার্য্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা জন্য পিতামাতার মন স্বতই

উদ্বেলিত ও শোকার্ত্ত হইয়া উঠে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। আমি এ সময় নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় ও পরমারাধ্য জগৎপিতার নিকট হইতে আমার কর্ত্তব্য বিষয়ে কাতর প্রাণে প্রেরণা ভিক্ষা করি, এবং সেই প্রেরণাবশে ওকালতী কার্য্য চিরতরে ত্যাগ করিয়া পবিত্র হোমিওপথে চিকিৎসাকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় আসি এবং তৎপূর্ব্বে ঐ পথ অবলম্বন করিবার যেন পাথেয় স্বরূপই গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য হৃদয়ে একটী ব্যাকুলতা অনুভব করি। গ্রন্থখানি লিখিবার সময় আমার লেখনী যেন আপনিই চলিত, ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি,—লিখিবার সময় চিন্তাস্রোত এতই দ্রুতভাবে মনোমধ্যে প্রবাহিত হইয়া লিখিবার উপকরণ সমূহ যোগাইয়া দিত যে, আমি যেন লিখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না। আমি ইহা দৃঢ়তার সহিত কহিতে পারি যে, আমার নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সাহায্যে এরূপ মধুর ভাবের গ্রন্থখানি সমাপ্ত করা অসম্ভব এবং সুধীসমাজের ইহার প্রতি এতদূর সমাদর লাভও অসম্ভব হইত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শীতলচন্দ্র ১৯২৪ সালের প্রারম্ভে অর্থাৎ তাহার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে একখানি হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা লিখিবার জন্য অনুরোধ করে ও তদনুসারে আমি উহা লিখিতে আরম্ভও করিয়াছিলাম, পরন্তু তাহার প্রতি মনোযোগ না দিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য কোনও প্রবলতর শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলাম বলিয়া আমি মনে প্রাণে অনুভব করি। এতদিনে মেটিরিয়া মেডিকা খানির মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিয়াছি।

হোমিওপ্যাথি একমাত্র চিকিৎসা পথ, যেহেতু ইহা প্রাকৃতিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রকৃতির সন্তান, সুতরাং ইহা আমাদের জীবনপথে মনুষ্যত্ব বিকাশ করিয়া ক্রমে আমাদের চরম লক্ষ্যে লইয়া দিবার পক্ষে অনুকূল পথও সহায়। গুরূপদেশ ও সদভ্যাস

অনুসরণ করিবার সময়, জন্মজন্মান্তরে সংস্কাররাশীর ফলে, অর্জ্জিত ও প্রাপ্তদোষসমূহের প্রভাবে যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, সে একমাত্র হোমিওপ্যাথিগুলি নষ্ট করিয়া, মানব জীবনের লক্ষ্য ও পরাশান্তি প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। এ সকল তত্ব এবং হোমিও-প্যাথিক দর্শনতত্বসকল "হোমিও-দর্শন" নামে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিত হইয়াছে,—অতি শীঘ্রই তাহা গ্রন্থাকারে বাহির হইবে। ইংরাজীতে আরও একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ ছাপা চলিতেছে, তাহাতে দোষ সমূহের প্রকৃতি, তাহাদের, প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার পথ এবং তদনুকুল ঔষধ সমূহের বর্ণনা, বিচার, তুলনাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুধীসমাজের মধ্যে যে সকল পবিত্রাত্মা পুরুষের হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যৎ কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষাও যদি আমি ভগবৎ প্রসাদে মিটাইতে এবং তাঁহাদের হৃদয়ের সামান্য একটু অংশও যদি জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবে আমি সকলের নিকট আশীর্ব্বাদ ভাজন হইব, সন্দেহ নাই। নিবেদনমিতি।

সমাপ্ত

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তকাবলী

১। **হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা**—মূল্য ১ম খণ্ড—৬৲, ২য় খণ্ড—৪৲—১ম খণ্ডে, সাধারণ পীড়া-সমূহের এবং ২য় খণ্ডে স্ত্রীলোক, গর্ভিণী, প্রসূতি এবং শিশুদিগের পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত যাবতীয় পীড়ার সাধারণ লক্ষণাবলী এবং চিকিৎসা সৌকার্য্যার্থ নির্ব্বাচন যোগ্য প্রত্যেক ঔষধটীর লক্ষণ-সমষ্টি প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল যে, গৃহলক্ষ্মীগণও অনায়াসে এই চিকিৎসা-গ্রন্থের সাহায্যে পারিবারিক চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

২। **ম্যালেরিয়া জ্বর চিকিৎসা**—মূল্য ৩৷৷০—কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়া সারে না, যাঁহারা একথা বলিয়া থাকেন, এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের ঐ সন্দেহ দূর হইবে। বহুসংখ্যক ঔষধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়, উপযোগিতা বিচার, পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রমণটী বন্ধ করিবার উপায়; ম্যালেরিয়ায় প্রকৃত নিদানতত্ত্ব ইত্যাদি সহ অনেকগুলি দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া-রোগীর চিকিৎসা-বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকখানি মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে।

৩। **হোমিও দর্শন**—মূল্য—৩৷৷০—ইংরাজী ভাষায় যদিও দুই একটী হোমিওপ্যাথিক ফিলজফি আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় ইহার একান্ত অভাব। ডাঃ ঘটক সে অভাব আজ দূর করিয়াছেন। এই পুস্তকে, হোমিওপ্যাথিক দর্শন শাস্ত্রের, বিশেষতঃ সোরা, সাইকোসিসাদি

দোষের প্রকৃতি, নিদর্শন, প্রতিকার, এক কথায় প্রায় ১০০টা গভীর দার্শনিক প্রবন্ধের ভিতর দিয়া হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রকৃত হোমিওপ্যাথের অতি অবশ্য পাঠ্য।

৪। হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা—১ম খণ্ড ৪॥০, ২ খণ্ড ৪৲—দেশের ইংরাজী-অনভিজ্ঞ চিকিৎসক ভ্রাতাদের জন্য এই গ্রন্থখানি বহু পরিশ্রমে আদর্শভাবে লিখিত। ইহার প্রণালী সম্পূর্ণ অভিনব—কথাচ্ছলে, অতি সহজ ভাষায় এবং মনোজ্ঞভাবে লিখিত হওয়ায় পুস্তকখানি অতিশয় সু-পাঠ্য হইয়াছে, এমন কি, একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সহজে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয় না। প্রত্যেক ঔষধের নির্ম্মল চিত্র-সংগঠন, লক্ষণাবলীর বিশদ বিশ্লেষণ, সমজাতীয় ঔষধ সমূহের সহিত তুলনা ও প্রত্যেকের সহিত মর্ম্মান্তিক বিভিন্নতা নিরুপণ, উপযোগিতা, সোরাদি দোষ সমূহের মধ্যে কোন কোন দোষের কতদূর প্রভাব ঔষধটীর মধ্যে অবস্থিত তাহার বর্ণনা ও লক্ষণাদির দ্বারা প্রমাণ, প্রত্যেক ঔষধের প্রকৃতি, গতি, গভীরতা ইত্যাদির বিশিষ্ট পরিচয়াদি প্রদানের পর বহু সংখ্যক রোগীতত্ত্ব সন্নিবেশিত হওয়ায়, গ্রন্থখানি অমূল্য হইয়াছে। স্বল্প কথায় পুস্তখানির পরিচয় প্রদান অসম্ভব। বাঙ্গলাতে এরূপ মেটিরিয়া মেডিকা প্রকৃতই আর দ্বিতীয় নাই। আজই একখানি ক্রয় করুণ।

৫। **Lectures on Tuberculosis (English)**—মূল্য—৪৲—টিউবারকুলসিস্ বা রাজ-যক্ষ্মা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এই পুস্তকখানি একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা গ্রন্থকারের ৪০ বৎসর ব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল। ইহাতে রাজ যক্ষ্মার নিদান, রাজ যক্ষ্মা এবং ক্ষয় কাশের মধ্যে পার্থক্য, কি করিলে এই পীড়ার কারণ হইতে রক্ষা

পাওয়া যায়—ইত্যাদি এবং চিকিৎসা এই পুস্তকখানিতে সুন্দর এবং অতি সরল ইংরাজী ভাষায় লিখিত আছে। সর্ব্বশেষে বহুসংখ্যক রোগি তত্ত্বের দ্বারা পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইয়াছে।

৬। Lectures on Materia Madica— art—1 মূল্য—৮৲—ইহা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক ভ্রাতাদিগের উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রত্যেক ঔষধের চিত্রটী ইহাতে সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে।

৭। ডাঃ আর, সি, ঘটক প্রণীত প্রাথমিক চিকিৎসা—মূল্য ।৷০—প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৮। Back vol. of Homœopathic Advance for 1934—1939—মূল্য প্রতি বৎসর ২৲।

ঐ—1940—মূল্য ১৷০